নবীন ও প্রাচীন

নির্মলকুমার বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স
কলিকাতা
১৩৫৬

প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৬

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—বলদেব রায়

দি নিউ কমলা প্রেস

৫৭।২ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

ভূমিকা

প্রায় আঠার উনিশ বৎসর পূর্বে 'নবীন ও প্রাচীন' নামে একখানি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বই লিখিয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে উহা প্রচার করা সম্ভব হইয়া উঠে নাই। পরবর্তী কালে শিক্ষা, সমাজ এবং সংস্কৃতির বিষয়ে যে সকল প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল সেগুলিকে একত্র সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং হিন্দু সমাজ ও সংস্কৃতি বুঝিবার যেমন চেষ্টা করিয়াছি, বর্তমান কালের সমাজ ও সংস্কৃতিরও তেমনই আংশিকভাবে বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। উভয়ের মধ্যে মিলও যেমন আছে, পার্থক্যও তেমনই আছে। উহাদের রূপ আমার নিকট যেভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই 'নবীন ও প্রাচীন' নামে পুনরায় পাঠকজনের নিকট সহানুভূতির ভরসা লইয়া উপস্থিত করিতেছি।

৩৭ বোসপাড়া লেন,
কলিকাতা—৩।
অক্ষয় তৃতীয়া, ১৩৫৬

নির্মলকুমার বসু

সূচীপত্র

সাধনা

শিক্ষা

সমাজ

বাঙালীর সমাজ

সংস্কৃতি

সাধনা

আদর্শ ও অনুভূতি

শৈশবে ও যৌবনের প্রারম্ভে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হইতে কতকগুলি ভাব ও ধারণা আমাদের মনে লাগিয়া যায়। ক্রমে যখন তাহাদের অস্তিত্বের সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই তখন যেগুলি পছন্দ হয় সেগুলিকে আদর্শ বলি এবং যেগুলি সেরূপ নহে সেগুলিকে অপরের মধ্যে দেখিলে নিন্দা করিয়া থাকি। মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের অধিকার, দেশের স্বাধীনতা, নারীর সতীত্ব অথবা পুরাতনের মোহে অভিভূত না হওয়ার ইচ্ছা প্রভৃতি ভাব অনেকের মনে আশপাশের আবহাওয়া হইতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

অন্তরের আদর্শের সঙ্গে মনের অবস্থা ও জীবনের কার্যাবলীর সঙ্গতি স্থাপনার চেষ্টাকে সাধনা বলে। এই দুই-এর মধ্যে প্রায়ই অসঙ্গতি ঘটে এবং যখনই তাহার বিষয়ে আমরা সচেতন হই তখনই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্বীয় আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করিবার আহ্বান আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

আদর্শস্থাপনার চেষ্টা করিলে পার্শ্ববর্তী অবস্থা হইতে নিজেকে ভিন্নরূপ করিতে হয় এবং তাহার ফলে সংসারের দেওয়া দুঃখকষ্টকে সত্যসেবার উপহার স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়।

কেহ কেহ জীবনের পথে এইভাবে একাকী বিচরণ করিতে ভয় পান। অন্তরের মধ্যেও তাঁহারা সংসারের কোলাহল শুনিতে চান নয়ত জীবন তাঁহাদের পক্ষে বড় নিঃসঙ্গ এবং দুর্বহ হইয়া ওঠে। কেহ বা অল্পদূর অগ্রসর হওয়ার পর যখন সংসারের আলস্য, জড়তা, সঙ্কীর্ণতা বা ভয়ের সম্যক্ পরিচয় পান তখন নিরাশায় ভগবানের মূর্তিকে পথের ধারে নামাইয়া মনের মধ্যে দুঃসহ বিতৃষ্ণা লইয়া কালযাপন করেন। অর্থাৎ

সংগ্রাম যখন বাহির হইতে ক্রমে অন্তরের ক্ষেত্রে পর্যবসিত হয় তখন পরাজয় স্বীকার করেন ; অন্তরের মধ্যে ঝড় বহিবার শক্তি সকলের থাকে না। পরাজয়ের অন্তে আসিয়া তাঁহারা এই বলিয়া আশ্বাস লাভ করেন যে ইহার অতিরিক্ত করা মানুষের সাধ্যের অতীত।

সংসারের ক্ষেত্রে আমরা অহরহ যে সকল আদর্শকে শুখাইয়া যাইতে দেখি সেগুলির অধিকাংশ সামাজিক পরিবেশ হইতে আলগাভাবে সংগৃহীত, স্বীয় জীবনের অনুভব হইতে লব্ধ নয়। সেইজন্য সারহীন ক্ষেত্রে যেমন উত্তম বীজ রোপণ করিলেও অঙ্কুর শীঘ্র শুখাইয়া যায়, তেমনই এই সকল আপাত-আদর্শও সংসারের অভিজ্ঞতার প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ হইয়া শুষ্ক তৃণে পরিণত হয়।

স্বীয় অনুভূতির গভীরতম প্রদেশ হইতে যেদিন আমরা বিচারের অতীত একটি বস্তু লাভ করি, সেইদিন প্রকৃত আদর্শ এবং সত্য জীবনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কাহারও কাছে ইহা সত্যের রূপে আসে, কাহারও কাছে সুন্দরের রূপে আসে, কাহারও কাছে প্রেমের রূপে আসে, কাহারও কাছে অহিংসার রূপে, কাহারও কাছে বা সাম্যের রূপে আসে। যে রূপ ধারয়াই আসুক না কেন, তাহাই জীবনের মূল সত্য। তাহা অনুভূতি হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া সংসারকে ভয় পায় না, বরং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার উপচারের যোগে পরিপুষ্ট ও সংবর্ধিত হয়।

অন্তরের সেই সত্য কতকগুলি ব্যবহারিক আদর্শের আকারে বাহিরে প্রকাশিত হয়। আমাদের আচরণ তাহার অনুগামী হইলে অনুভবও উত্তরোত্তর গভীর ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া ওঠে। সত্য অন্তরের মধ্যে অনুভূত হইলে তাহাকে বহন করিবার মত শক্তিও স্বতঃ উৎপন্ন হয়। সত্য এবং শক্তির দ্বারা পুষ্ট জীবন ক্রমে ফলপুষ্পে শোভিত হইয়া সংসারে সৌরভ ও সম্পদ বিতরণ করে।

সত্যাগ্রহ

দেশের সহিত আমাদের পরিচয় যত ঘনিষ্ঠ হইতেছে ততই অনুভব করিতেছি যে দেশের সর্বপ্রধান রোগ হইল ভয়। এ ভয় দারিদ্র্যজনিত হইতে পারে অথবা অজ্ঞানতা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে। উহা দূর করিবার জন্য উহার উৎপত্তি কোথায় সে সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এক বন্ধু আলোচনা প্রসঙ্গে বলিলেন যে দেশের অজ্ঞান দূর করাই সর্বপ্রথম প্রয়োজন এবং সেজন্য বিস্তৃতভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা আবশ্যক। কিন্তু মন এ কথায় সায় দিল না। কারণ, শিক্ষা যাঁহারা পাইয়াছেন তাঁহারাও ত ভয় হইতে মুক্ত হন নাই। এরূপ অবস্থায় দেশের অবশিষ্ট লোককে লেখাপড়া শিখাইয়া বা নিজের দুঃখ দুর্দশার কারণ সম্বন্ধে সচেতন করিতে পারিলেই যে তাহারা ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারিবে এমন ত মনে হয় না।

মহাত্মা গান্ধী দেশের সম্মুখে আলস্য দূর করা এবং ভয়হীনতা অভ্যাস করিবার জন্য একটি কর্মধারা প্রদান করিয়াছেন। যদি আমরা সেইরূপ কোনও পথে অগ্রসর না হই অথবা সাক্ষাৎভাবে মনের মধ্যে আশ্রিত জড়তা ও ভয়কে বিদূরিত করিবার চেষ্টা না করি, তবে রোগের মূল থাকিয়াই যাইবে। নিজেকে ফাঁকি দিবার জন্য হয়ত আপাতসত্য ব্যবস্থার কল্পনা করিয়া বা নানাবিধ কল্পনার চাঞ্চল্যে নিজের মনকে ব্যস্ত রাখিয়া ভাবিতে পারি যে দেশের জন্য কাজ করিতেছি অথবা সত্যকে অনুসরণ করিতেছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের সকল চেষ্টা শুধু ব্যর্থ মিথ্যাগ্রহে পরিণত হইবে; উপরন্তু দেশের দুঃখ যেমন ছিল তেমনই থাকিয়া যাইবে।

সত্যাগ্রহের মধ্যে আত্মপ্রবঞ্চনার কোনও স্থান নাই। যদি কেহ সত্যানুসন্ধানের পথে দাঁড়াইয়া বলেন, 'এই পথ, কিন্তু আমি সাহস পাইতেছি না', তবে তিনিও ভাল। কেননা সত্যের প্রতি নিষ্ঠা আছে বলিয়া তিনি সত্যকে হারাইবেন না। কিন্তু যিনি নিজের দুর্বলতাকে গোপন করিবার জন্য ভাল করিয়া সত্যের দিকে চাহিয়া দেখেন না, দেখিতে ভয় পান, তিনি হাজার পণ্ডিত হইলেও ভাল নন, কারণ মনের কাছে সত্য গোপন করিবার চেষ্টা তিনি করিয়া থাকেন। তাঁহার সকল কাজ ব্যর্থ ত হয়ই, উপরন্তু সত্যের দৃষ্টিও বেশি দিন জাগ্রত থাকে না, মিথ্যার মোহ ক্রমশ তাঁহাকে আচ্ছন্ন করে।

মানুষ ও প্রতিষ্ঠান

সকলের কাজ করিবার শক্তি সমান নয়। আমাদের মধ্যে একাকী কাজ করিবার সাহসের বা সামর্থ্যের অভাব হয় বলিয়া আমরা সঙ্গী খুঁজি। দশজনে এক কাজের উদ্দেশ্যে মিলিত হইলে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া ওঠে।

প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল সদস্যগণের কাজ করিবার ইচ্ছা। তাঁহাদের জীবন আগে যেমন চলিতেছিল, মনের ভাব এবং অবস্থা যেরূপ ছিল, তাহাতে কোন কাজ হয় নাই; এখন কাজ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠান করিলেন। অতএব প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি দৈনন্দিন এবং প্রচলিত কর্মপদ্ধতি হইতে বিভিন্ন হইবে। প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া মনের অবস্থার ও জীবনের অভ্যাসের পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। ইহাই মূল কথা।

মূল তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে প্রতিষ্ঠান অল্পদিনের মধ্যে যশোলিপ্সা, কর্তৃত্বাভিমান, ঈর্ষা বা দ্বেষের লীলাভূমি হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে প্রতিষ্ঠানের কাজের প্রভূত ক্ষতি হয়। কেন এমন হয় তাহা নিরূপণ করা প্রয়োজন, নয়ত আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি এখন যেমন আছে তেমনই থাকিয়া যাইবে। প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসের প্রকৃত কারণ বুঝিয়া ব্যবস্থা না করিলে আমাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত হইয়া থাকিবে।

ধীরভাবে নিরীক্ষণ করিয়া মনে হয় যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আসেন তাঁহারা স্বীয় জীবনে যথোপযুক্ত পরিবর্তনসাধনের সঙ্কল্প লইয়া আসেন না। মনের দিকেও যে অনেক সংস্কারের প্রয়োজন তাহা কেহ বা বুঝিয়াও আলস্যের বশে বা অহঙ্কারের প্রভাবে কার্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত হন না।

অনেকে কাজ অপেক্ষা কাজের সম্বন্ধে স্বীয় মতামতকে অধিক দামী মনে করেন ও অপর সকলকে স্বীয় মতে আনিবার চেষ্টা করেন। কেহ বা ভিন্ন মত সহিতে না পারিয়া তদ্রূপ মতবিশিষ্ট ব্যক্তিকে দূরীভূত করিবার চেষ্টা করেন অথবা স্বয়ং প্রতিষ্ঠানকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। এরূপ আচরণ পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে দোষের হয় না, কিন্তু বহুর ক্ষেত্রে ঘাতপ্রতিঘাতে এইরূপ সঙ্কীর্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে দেশের মধ্যে পঙ্কিলতার একটি উৎসকেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রতিষ্ঠান যাদুবিদ্যার যন্ত্র নহে যে যেমন মন লইয়াই আমরা যাই তাহা আমাদের শোধন করিয়া কাজ করাইয়া লইবে। যেমন মন ও সঙ্কল্প লইয়া আমরা প্রতিষ্ঠানে থাকিব, প্রতিষ্ঠানের রূপও সেইমত হইবে। প্রতিষ্ঠানকে শ্রদ্ধা করিয়া, কাজকে সকলের উপরে রাখিয়া, যদি আমরা তাহার অন্তর্ভুক্ত হই এবং কর্মকার যেমনভাবে নিজের অস্ত্রকে ভালবাসে ও পূজা করে সেইরূপ মনোভাব লইয়া প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করি তবেই তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয় করিয়া আমাদের ব্যক্তিগত জীবনকে, অভ্যাসকে ও মনকে ভাল করিতে হইবে। কর্মের ইচ্ছা ও সাধনায় নিষ্ঠা থাকিলে তবে প্রতিষ্ঠান সেবাধর্মের পথে সহায় হইবে নহিলে যে তম দেশের মধ্যে বিরাজ করিতেছে তাহাকে নিবিড়তর করিয়া শুধু আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করিয়া রাখিবে।

সংগ্রাম১

দেশের মধ্যে দুঃখ ও তমোভাবের অস্তিত্ব একটি মহাসত্য। কিন্তু তাহার পরিবর্তে দেশকে নির্দোষ ও সুন্দর করিবার যে বাসনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে তাহাও তেমনই সত্য।

দেশের কাজে নামিয়া আমরা যাহাদের সাহচর্য লাভ করি হয়ত অনেক সময়ে তাহাদেরই আলস্য, অসত্য প্রভৃতি দোষ দেখিয়া ক্রুদ্ধ অথবা নিরাশ হইয়া পড়ি। কিন্তু এরূপ বিরক্তি বা নিরাশার কারণ কি? আমরা কি আশা করিয়াছিলাম যে দেশে যে সকল দোষ বর্তমান আছে সেগুলি হইতে বিমুক্ত একটি গোষ্ঠীর মধ্যে থাকিয়া সেই সকল দোষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব? আমাদের নিজেদের গোষ্ঠী সর্ববিধ ভয়, আলস্য, অসত্য হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত থাকিবে? হয়ত মনের দুর্বলতার বশে ঐরূপ কোনও বিশ্বাস অন্তরে থাকে বলিয়া আমরা সহকর্মীদের দোষ দেখিলে বিরক্ত হই।

কিন্তু দেশের তম কি এতই দুর্বল যে তাহা আমাদের রচিত সংসঙ্গের দুর্গকে ভেদ করিতে পারিবে না? অথবা আমরা কি অন্তরে লুক্কায়িত আলস্যের বশে আশা করিয়া আছি যে আমাদের অধিকাংশ সময় উগ্রতেজা বীরবৃন্দের মধ্যে অতিবাহিত হইবে এবং দিবসের মধ্যে এক একবার দেশের তমের সঙ্গে যুদ্ধে রত হইব?

কিন্তু তাহা হইবার নহে। এ অভিযানে অস্ত্র ত্যাগ করিয়া রাখার সময় নাই; কর্মের অন্ত না হইলে অবসর মিলিবার কোনও আশা নাই। যে দুর্ভেদ্য অন্ধকার সমস্ত দেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহা আমাদের সংসঙ্গের দুর্গকেও আক্রমণ করিয়া অহরহ সকলকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে। দিবসের মধ্যে শুধু কয়েকটি কর্মের মুহূর্তে নহে,

জীবনের প্রতি মুহূর্তেই সেই তমোরাজি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

যদি চারিদিকে জয়ের কোনও চিহ্ন না দেখিয়া আমরা মনকে আলস্যে, নিরাশায় অথবা তিক্ততায় ভরিয়া যাইতে দিই, অথবা তাহাকে ভুলিবার চেষ্টায় অনুভূতির তীক্ষ্ণতাকে হ্রাস করিয়া দিই, তবে ত সংসারের অসুন্দর আমাদের মনের মধ্যে আর এক অসুন্দরের সৃষ্টি করিল। দেশের তম আমাদের দুর্গকে ভেদ করিয়া সেই শেষে আমাদের মনকে পরাজিত করিল।

সাহসে বুক বাঁধিয়া, নিরাশার কাছে হার না মানিয়া, যে সৌন্দর্যের পূজা আমাদের নিয়োজিত করিয়াছে তাহাকে বাচাইয়া রাখিতে হইবে। সকল মলিনতাকে চূর্ণ করিয়া জীবনের মধ্যে তাহাকেই রূপ দিতে হইবে। যদি চারিদিকে প্রতিষ্ঠানের দুর্গপ্রাচীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া ধ্বংস হইয়াও যায়, তবু যেন আমাদের মনের দুর্গ চিরকালের জন্য অচল অটল হইয়া থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর সত্যসাধনা

মহাত্মা গান্ধীর মতে মানবজীবনকে রাষ্ট্র, সংসার, সমাজ, ধর্ম নামে কতকগুলি অসম্পর্কিত অথবা বিরুদ্ধ বিভাগে বিভক্ত করা যায় না। সঙ্গবশে হয়ত আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবহার একরকম হইতে পারে, অবস্থা-বিপর্যয়ে সাংসারিক ব্যবহার বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইতে পারে কিন্তু এইরূপ হয় বলিয়াই তাহা বাঞ্ছনীয় অথবা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বস্তুত তাহাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য ও বিরোধের নিরাকরণ করা আমাদের কর্তব্য। হয়ত চেষ্টার ত্রুটি না করিয়াও সম্পূর্ণ সঙ্গতস্থাপন করা গেল না; কিন্তু তথাপি আমাদের চেষ্টার যেন অবসান না ঘটে, কেননা জীবনে সেই সামঞ্জস্য স্থাপনাই গান্ধীজীর মতে সত্যসাধনার স্বরূপ এবং তাহাই মানুষের কর্তব্য।

স্বীয় দৃষ্টি দ্বারা গান্ধীজী বিশ্বচরাচরের মূলে অহিংসার নীতিকে দেখিতে পাইয়াছেন; তাঁহার মতে সংসারের সকল গতি সেই অহিংসার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অতএব মানুষ অহঙ্কার বর্জন করিয়া নিজের জীবনকে সেই নিয়মের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিচালিত হইতে দিলে তাহার কর্তব্য-সমাপন হইবে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনে অহিংসা বিশ্বের মূলসূত্ররূপে দেখা দিলেও কাহারও জীবনে তাহা প্রেমের রূপে আসে, কাহারও বা সুন্দরের রূপে আসে, কাহারও বা অপর কোনও রূপে আসে। যে রূপেই আসুক, তাহাকে পরিপূর্ণভাবে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনায়, চিন্তায় ও ধারণার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা, সেই রূপের পরিচর্যা করা, আমাদের পক্ষে সত্যের সেবা হয় এবং তাহাই আমাদের ধর্ম।

যখন একবার আমরা অন্তরের সত্যপথে অগ্রসর হই তখন চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হইয়া ওঠে এবং কত যে অসামঞ্জস্য দৃষ্টিপথে উদয় হয়

তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। হয়ত অন্তর হইতে অনুভব করিলাম, এই দরিদ্র দেশে আমার শরীরধারণের অতিরিক্ত দ্রব্য ভোগ করা সুন্দর নহে, তখন দেখা যায়, পূর্বাভ্যাসবশে শরীর অথবা মন কিছুতেই সেই ভোগের বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারিতেছে না। অথচ অন্তরে সত্যের যে পুরোহিত দণ্ডায়মান আছেন তিনি নির্দেশ দিতেছেন যে 'তোমার অন্তরতম সত্যকে অনুসরণ কর, মনের বা শরীরের দাস হওয়া সুন্দর নহে'। এরূপ ক্ষেত্রে মন কত ছলনাই না করে। মনের মধ্যে চিত্রের পর চিত্র ভাসিয়া যায়, কখনও দেখি বস্তি ত্যাগ করিতে চাই কিন্তু অপরে আসিয়া আমাকে বলিতেছে, 'তুমি শরীরের জন্য ইহা ভোগ কর'। অথচ বিজ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা জানি ইহা শরীরের পক্ষে অনাবশ্যক। হয়ত বা দেখিলাম, আমি ত্যাগ করিয়াছি, দশজন লোকের সমক্ষে তাহা ফেলিয়া দিলাম, তাহারা আমার ত্যাগের প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেল। এইরূপে ত্যাগের দুঃখনিবারণের জন্য আত্মপ্রশংসাকে উদ্বুদ্ধ করিলাম; তাহাও সুন্দর নহে। হয়ত বা দেখিলাম গোপনে ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার পর সংসারের ক্ষেত্রে আসিয়া যাহারা ভোগ করিতেছে, অথচ ত্যাগের নাম করে, তাহাদের মোহের আবরণ ভেদ করিয়া তাহাদের কটু বাক্যবাণে জর্জরিত করিতেছি। তখন ত্যাগ গুরুগিরির অহঙ্কার পিছনে রাখিয়া গেল, যাহাতে সেই ভোগটুকু অন্তত আমার হয়। এইভাবে সামান্য একটি বস্তু বর্জন করিতে গিয়া সুন্দরতম পথকে নির্বাচন করিতে ভোগ ও কামের সহস্রশীর্ষ অরণ্যানীর মধ্য দিয়া সত্য পথটি নির্বাচন করিতে হয়। কত উপায়ে যে অসুন্দর নূতন ভোগের পথ খুলিয়া দিয়া আমাদিগকে সত্যভ্রষ্ট করে তাহা বলা যায় না। মহাত্মাজী বারংবার সত্যের পথকে তরবারির সীমারেখার মত সূক্ষ্ম বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সত্যকে অনুসরণ করিলে জীবনের প্রতি ঘটনাকে সত্যের যজ্ঞক্ষেত্রে পরিণত করিতে হয়। পরস্পরের প্রতি ব্যবহারকে, খাওয়া-পরা, জীবিকা-

উপার্জন সকল ব্যাপারকেই বিচারের দ্বারা সত্যের অভিমুখী করিতে পারা যায়। গান্ধীজীর সাধনার মধ্যে বিশেষত্ব হইল, তিনি কোনও বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্যে ভগবানের সেবা করিতে বলিতেছেন না, প্রতিদিনের প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনাকে অনলসভাবে বিচারের দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠাভূমিতে রূপান্তরিত করিতে বলিতেছেন। তাহাতে আমাদের দিনগত জীবন তাহার ক্ষুদ্রতা পরিহার করিয়া মহান হইয়া উঠে এবং শুধু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেও একটি সার্থকতা লাভের আশা পাওয়া যায়।

মহাত্মাজীর বিশ্বাস যে, জাতি আলস্যবশে অন্তরের সত্যকে সন্ধান অথবা অনুসরণ করিতেছে না বলিয়াই তাহার জীবনে এত পঙ্কিলতা, এত দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহারা সত্যকে পাইয়াছে এবং তাহার পূজায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের সম্বন্ধে গান্ধীজীর বলিবার কিছু নাই। কিন্তু ভারতের কোটি কোটি লোক, যাহারা সত্যকে পায় নাই, তাহাদের জন্য তিনি একটি বিশেষ সাধনোপায় প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার মতে তামসিকতা আজ আলস্য ও ভয়ের রূপে আমাদের মনকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এই দুইটির নিরাকরণের জন্য তিনি আমাদের যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতেছেন এবং বলিতেছেন, 'বীরের মত শত্রুর একেবারে সম্মুখে উপস্থিত হও, তাহাকে ভাঙ, ভাঙ। দেখিও যেন কোন ছলনা করিয়াই ভয়কে আবরিত করিও না, আলস্যকে আবরিত করিও না। আত্মপ্রবঞ্চনাবশে তাহাদের দিকে সোজা হইয়া যদি না চাও, তবে তাহারা তোমার অন্তরে সাবধানতার আকারে বাসা বাঁধিবে। এ সাবধানতা যুদ্ধের সাবধানতা নহে, ভয়ের নামান্তর মাত্র, তাহাও অসত্য। অসত্যকে পরিহার কর'।

তাই তিনি দেশকে সত্যাগ্রহের যুদ্ধে নামিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন; যেখানে কোনও গোপন স্থান নাই, কোনও ছলনার উপায় নাই। সেখানে হয়ত মৃত্যুর মুখেই সত্যাগ্রহীকে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু গান্ধীজীর মতে সেই মৃত্যু আমাদের পূজার উপায়স্বরূপ। মৃত্যু যখন

আমরা অনুভব করি নাই, তখন তাহাকে অমঙ্গল রূপে কল্পনা করিয়া লাভ কি? সত্য যখন আমাদের মৃত্যুর সম্মুখীন করিতেছে তখন শরীরকে মৃত্যুর দ্বারা আবিষ্ট হইতে দেওয়া ভিন্ন উপায় কোথায়?

মহাত্মাজী আমাদের এই সাধনপথের নির্দেশ দিয়াছেন। তাঁহার ধারণা যে নিষ্ঠার সহিত সত্যাগ্রহের পন্থায় অগ্রসর হইলে আমাদের জাতির নিবিড় তামসিকতা সূর্যকিরণের সম্মুখে কুয়াশার মত অপসারিত হইবে, কারণ সে তামসিকতা যতই নিবিড় ও দুর্ভেদ্য মনে হউক না কেন তাহা শুধু আবরণের মত আমাদের জীবনকে ও চিত্তকে আবৃত রাখিয়াছে। এবং এই তামসিকতা বিদূরিত হইলে মধ্যপথে আমরা জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিব। কিন্তু তাহা আমাদের সাধনার শেষ ফল নহে, মধ্যপথে পান্থশালার মত পথের শ্রান্তি দূর করিয়া আমাদের অধিকতর শক্তিশালী করিবার জন্যই তাহা বর্তমান রহিয়াছে। জাতি স্বাধীনতা লাভ করিলেও আমাদের সত্যসাধনা নিরবচ্ছিন্নভাবে চলিবে, যতদিন না আমাদের সকল অহঙ্কার বিদূরিত হইয়া আমরা যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রের মত হই। শরীরের, মনের সকল বাধা নির্মুক্ত হইলে, আমাদের সকল অহঙ্কারের ভাব বিদূরিত হইলে, যে সুর বহু জড়তার মধ্য দিয়াও আজ ক্ষণে ক্ষণে আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিতেছে, তাহা আমাদের জীবনের প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তায় ধ্বনিত হইয়া পূর্ণ হইবে। তখন শরীরকে, মনকে, সেই পূর্ণ সঙ্গীতের সুরে ধ্বনিত হইতে দেখা ভিন্ন আমাদের অন্তরের দ্রষ্টার আর কোনও ব্যবসায় থাকিবে না।

শিক্ষক

বিদ্যার ব্যবহার

কয়েক বৎসর পূর্বের ঘটনা। ওড়িশায় জুয়াঙ নামে একটি জাতি বাস করে, তাহাদের ভাষা ও ধর্মের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য এক জায়গায় গিয়াছিলাম। জায়গাটি পাহাড়ের নীচে, পাশে একটি ক্ষীণস্রোতা পার্বত্য নদী, নিকটে জুয়াঙদের একখানি গ্রাম। স্থানটি বেশ ভাল বলিয়া মনে হইল, তাই সেখানে তাঁবু গাড়িয়া বসবাসের আয়োজন করিলাম। আমার সঙ্গে চাল ডাল আলু ঘি ছিল, একজন চাকরও ছিল, অতএব খাইবার কোনও অসুবিধা হয় নাই। সারাদিনই জুয়াঙদের মধ্যে থাকিতাম এবং তাহাদের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করিতাম। সকালে উঠিয়া গ্রামের স্ত্রীলোকেরা বনে ফলমূল আহরণ করিতে যায় এবং পুরুষেরা জঙ্গল হইতে বাঁশ কাটিয়া আনে। তাহার পর সারাদিন গ্রামে বসিয়া বাঁশের ঝুড়ি ডালা প্রভৃতি বস্তু নির্মাণ করে। সন্ধ্যায় স্ত্রীপুরুষে নাচগান করে, তদ্ভিন্ন সারাদিনই খেজুরের রস হইতে উৎপন্ন তাড়ী খায়, ইহাতেই তাহাদের জীবনের আনন্দ। পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অনুভব করিলাম যে, জুয়াঙেরা অধিকাংশ দিনই তাড়ী খাইয়া কাটাইয়া দিতেছে। ঘরে কাহারও কাহারও কিছু বাজরার দানা আছে, তাহা সিদ্ধ করিয়া খায়, বনের ফলমূল কিছু আহার করে, অবশিষ্ট পেট তাড়ীর দ্বারা ভর্তি করিয়া লয়; ভাত জোটে না বলিলেই চলে। উৎসবের দিনে হয়ত খায়, অন্যান্য দিবস যেমন তেমন করিয়া পেট ভরায়।

ব্যাপারটি উপলব্ধি করিবার পর মনে খট্‌কা লাগিয়া গেল। অল্প জিজ্ঞাসাবাদের ফলেই জানিতে পারিলাম যে, ইহারা আগে বনে জঙ্গলে শিকার করিত ও জঙ্গলের গাছে আগুন লাগাইয়া, শুধু খন্তার সাহায্যে

পোড়া মাটিতে কিছু বীজ বপন করিত। আজ বনের গাছপালা রক্ষা করিবার জন্য দেশের রাজা সেখানে জুয়াঙদের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছেন, শিকারও বন্ধ হইয়াছে। এইরূপে অবস্থান্তর ঘটায় কোন কোন জুয়াঙ লাঙলের সাহায্যে চাষবাস করিতেছে, কিন্তু এই গ্রামের সকলে প্রধানত বাঁশের ঝুড়ি চাঙ্গারী বুনিবার বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা চাষের বিদ্যা ভাল করিয়া আয়ত্ত করিতে পারে নাই, তাই ইহাদের দুঃখেরও সীমা নাই। জমিদার জুয়াঙদের জমি বিলি করিতে চায় না; কেননা, তাহারা সময়মত খাজনা দেয় না। একে ত চাষ ভাল জানে না, তাহার উপর আবার ধান বেচিয়া দু পয়সা হইলেই হাটে মহুয়া হইতে চোলাই করা মদ কিনিয়া খাইয়া ফেলে।

অথচ পাহাড়ে জঙ্গলে ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া এমন অন্তত একটি জায়গা আমার নজরে পড়িয়াছিল, যেখানে বাঁধ বাঁধিয়া জলাশয় রচনা করিলে চাষের উত্তম ব্যবস্থা হইতে পারে, লোকে খাইয়া বাঁচে; হয়ত অনুসন্ধান করিলে এরূপ আরও স্থানের সংবাদ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, জুয়াঙদের মধ্যে সে জ্ঞান কোথায়, তাহাদের সমাজে এমন সমবেত শক্তিই বা কই, যাহার ফলে তাহারা একজোটে জমি লইবে, বাঁধ বাঁধিবে, চাষ করিবে?

শুধু কি তাই? ম্যালেরিয়ায় তাহারা সর্বদাই রুগ্ন। ছেলেদের পেটে পিলে, পুরুষেরা ক্ষীণ এবং খর্বকায়। কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায়, অজ্ঞানের বশে গায়ে জ্বর লইয়া সারাদিন বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ায়, কাজ করে, মদ খায়, মোটের উপর শরীর অচল না হওয়া পর্যন্ত সেটাকে উপেক্ষা করিয়া চলে।

এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আমার মনে একটি প্রশ্ন জাগিতে লাগিল। আমি জুয়াঙদের মধ্যে গিয়াছি নৃতত্ত্বের সন্ধানে। কোল,

সাঁওতাল প্রভৃতি জাতির সহিত ইহারা সমপর্যায়ে পড়ে। অতএব ভারতের আদিমতম অনার্য সংস্কৃতির রূপ কি ছিল, তাহার কিছু নমুনা জুয়াঙদের মধ্যে পাওয়া যাইবে, এই আশায় গিয়াছি। পেট ভরিয়া দু বেলা খাই, মন অবসাদগ্রস্ত হইলে সপ্তাহে এক আধ দিন সাইক্ল চড়িয়া চার মাইল দূরবর্তী শিক্ষিত ওড়িয়া-পল্লীতে গল্প করিয়া আসি, তা' ছাড়া সঙ্গে বইপত্র ত আছেই। তবু মনে প্রশ্ন উঠিল, এখানে থাকিয়া আমার জ্ঞানের দ্বারা জুয়াঙদের জীবনকে কি আরও সমৃদ্ধ করা যায় না? উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা যেমনভাবে গাছের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনা করেন, তাহাকে কাটেন, কোটেন, অণুবীক্ষণের তলায় পাতিয়া পরীক্ষা করেন, আমিও ত মানুষকে তেমনিভাবেই দেখিতেছি, পর্যবেক্ষণ করিতেছি, আমারই মত মানুষ বলিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারি নাই। আমার আত্মীয়স্বজন যদি এইরূপ দারিদ্র্যে পড়িতেন, এইরূপ জ্ঞানহীনতার বশবর্তী হইয়া ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইতেন, অথবা ভাল চাষ-আবাদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেখানে কিছু না করিতেন, তবে আমি তাঁহাদের মাথার মাপ লইয়া ক্ষান্ত হইতাম না, তাঁহাদের লৌকিক ধর্ম, স্ত্রী-আচারের বিষয়ে বা শবদাহের ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতাম না, আমার সকল বিদ্যা মিলাইয়া কোনও রকমে তাঁহাদের উপকারে আসিবার চেষ্টা করিতাম। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য কি—এই প্রশ্ন ধীরে ধীরে আমার মনকে আলোড়িত করিতে লাগিল।

দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সে সময়ে এই প্রশ্নের উপযুক্ত মীমাংসা করিতে পারি নাই। তবু পরবর্তী কয়েক বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, নিতান্ত ব্যক্তিগত কাহিনী হইবে জানিয়াও, আপনাদের কাছে নিবেদন করিয়া আমার মূল বক্তব্যে পুনরায় ফিরিয়া যাইব। যে সময়ের

কথা বলিতেছি, তাহার কিছুকাল পরে ভারতব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল। আমিও অনুভব করিলাম যে, রাষ্ট্রে ও সমাজে আমূল বিপ্লব সাধিত না হইলে, মানুষের চিন্তায় এবং অভ্যাসে মূলগত পরিবর্তন না ঘটিলে, খণ্ড খণ্ড ভাবে ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। সেই কল্যাণের সন্ধানে ঘুরিয়াছি, আমার মত অসংখ্য মানুষ ঘুরিতেছে, কিন্তু যথার্থ মঙ্গলের দিন এখনও আসে নাই, কবে আসিবে তাহাও জানি না।

যাহাই হউক, জাতির কল্যাণের পথে বিচরণ করিতে করিতে মাঝে মাঝে তত্ত্বজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা আবার মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে এবং ইদানীম্ মনে হইতেছে যে, দেশে যখন সাক্ষাৎ রাষ্ট্রীয় আন্দোলন নাই, অথবা স্তিমিত অবস্থায় রহিয়াছে, অন্তত সে সময়ে আমাদের দেশের অশিক্ষিত অবজ্ঞাত বহু মানুষের কল্যাণের জন্য নৃতত্ত্বের বিদ্যার প্রয়োগ করা যাইতে পারে। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক আইনকানুন গঠনের জন্য হয়ত নৃতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের প্রয়োজন হইবে, জাতির শারীরিক উন্নতিসাধনের জন্য সেরূপ পণ্ডিত হয়ত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রচনা করিবেন। কিন্তু আজ আমরা যদিও দেশের সর্বময় কল্যাণের নিমিত্ত আইন গড়িতে পারি না, তবু আমাদের করণীয় যে কিছুই নাই, ইহাও ত ঠিক নহে।

কয়েক দিবস আগেকার কথা বলিতেছি। খাদিপ্রতিষ্ঠানে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি বেলেঘাটার নিকটে একটি মেথরপল্লীর সম্বন্ধে সংবাদ দিলেন। তাঁহার মতে বাঙালী মেথরজাতি ক্রমশ লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার অত্যধিক, বৃদ্ধের সংখ্যা অল্প, মধ্যবয়স পার হইতে না হইতেই ইহারা ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া

অথবা অন্য কোনও রোগে হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া মারা যায়; অথচ ইহা যে একমাত্র দারিদ্র্যের বশে, তাহাও নহে। মেথর ও মেথরানী উভয়ে রোজগার করে, প্রতি পরিবারের আয় আনুমানিক ত্রিশ টাকা পর্যন্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহারা দারুণ মদ খায় এবং অত্যন্ত শিথিলচরিত্র হওয়ার ফলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বিবাহের বন্ধন ক্ষণস্থায়ী, ৪০।৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইহাদের মধ্যে স্ত্রীর পরিবর্তন, স্বামীর পরিবর্তন অনবরত ঘটিয়া থাকে। সতীশবাবুর কথা শুনিয়া আমার মনে হইল, বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা এই ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে কি ভাবে বাঁচানো যায়, তাহার কোন নির্দেশ কি পণ্ডিতেরা দিতে পারেন না? কেন ইহারা এত শীঘ্র মারা যায়? কেন ইহাদের সামাজিক বন্ধন এত শিথিল হয়, এগুলি কি নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণার বিষয় নয়?

বস্তুত ইহাই ত বিদ্যার প্রয়োগের ক্ষেত্র। আমাদের বিদ্যা যদি মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত না হয়, তবে বিদ্যার প্রয়োজন কি? অনেকদিন পূর্বে আমার জনৈক বন্ধু সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য-ভরে কথা বলিতেছিলেন। তাঁহার অভিযোগ ছিল যে, সন্ন্যাসীগণ সমাজের সেবা না করিয়া হিমালয়ে বৃথাই তপস্যায় নিযুক্ত থাকেন। গিরিগুহায় বাস করিয়া তাঁহারা যে ঈশ্বর বা তত্ত্বজ্ঞানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকেন, তাহা মানসিক বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে, নিজের অন্তরের তৃপ্তির জন্য তাঁহারা সামাজিক কর্তব্যে অবহেলা করেন। সেই তপস্যানিরত সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তখন কি বলিয়াছিলাম মনে নাই, তবে আজ হইলে বলিতাম যে, তাঁহারা অন্তত নিজের আত্মার বা আত্মসুখের জন্য সমাজের কাছে মাহিনা দাবি করেন না। দুই বেলা দু মুঠা বা এক মুঠা অন্নের বেশি তাঁহারা সমাজের কাছে সচরাচর চান না, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন চাকরি করি, তখন কি সে কথা বলিতে পারি?

অপরের বিষয়ে জানি না, নিজের সম্বন্ধে আমি এ কথা বলিতে পারি যে, আজ আমাকে যে পরিমাণ কাজ করিতে হয় এবং তাহার পরিবর্তে যত বেতন পাই, তাহার হিসাব করিলে ঘণ্টায় আমার মজুরি ৫৷৷০ টাকা দাঁড়ায়। আবার বৎসরে পাঁচ মাস ছুটি বাদ দিলে প্রতি ঘণ্টা বক্তৃতার মূল্য ১০ টাকা হয়। আবার একই বক্তৃতা বছরের পর বছর দেওয়া সত্ত্বেও দেখিতেছি, সেকেণ্ড-হাণ্ড বলিয়া তাহার দাম কিছুমাত্র কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। অথচ আমি নিশ্চিত জানি, প্রাচীনকালে মানবের ব্যবহৃত পাথরের বা হাড়ের তৈয়ারি যে সকল অস্ত্রশস্ত্রের সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা দিয়া থাকি, তাহা ছাপাইয়া বিক্রয় করিলে বাজারে চার আনা পয়সাও পাওয়া যাইবে না। সন্ন্যাসীগণের মত শুদ্ধ জ্ঞানের নিমিত্ত তপস্যা করিতেছি, এরূপ আবদার আমরা মাহিনা লইয়া করিতে পারি না। যদি আমরা বনচারী হইতাম, বল্কল পরিধান করিতাম, কুঁড়ে ঘরে থাকিতাম, সমাজের কাছে প্রাণধারণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থের অতিরিক্ত না লইতাম, তাহা হইলে কথা ছিল। কিন্তু যতক্ষণ আমরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী দাম লই, যতক্ষণ দেশের অসংখ্য পরিশ্রমী লোক প্রাণপাত করিয়াও ভালভাবে খাইতে পরিতে পায় না, যতক্ষণ পগণ্ডু জুয়াঙ শবর প্রভৃতির মত জাতি জ্ঞানের অভাবে, সঙ্ঘশক্তির অভাবে, শোষিত হইতেছে এবং ক্রমশ বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে, ততক্ষণ সমাজের খরচে যে বিদ্যা আমরা আহরণ করিয়া থাকি, তাহার প্রতিদানও আমাদিগকে করিতে হইবে। আমাদের লব্ধ জ্ঞান যদি সমাজের হিতে নিয়োজিত হয়, তবে আমাদের ঋণ কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হইতে পারে।

সমাজে সমস্যার কি কোনও অন্ত আছে? হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ ঈর্ষা, দ্বেষ ও অবিশ্বাস ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। গবেষণার দ্বারা যদি আমরা ইহার মূলগত কারণ ও তাহা অপনোদনের

পথ আবিষ্কার করিতে পারি ও নির্ভয়ে তদনুরূপ চেষ্টা করি, তবে আমাদের কর্তব্য কতকাংশে সমাপন হয়। জাতিভেদ-প্রথার ফলে হিন্দুসমাজ পঙ্গু হইয়া আছে। কেহ কেহ বলেন, অসবর্ণ বিবাহের বহুল প্রসারের দ্বারা সকল হিন্দুকে মিশাইয়া এক মহাজাতিতে পরিণত করিতে হইবে। কেহ বা বলেন, অসবর্ণ বিবাহের সন্তানসন্ততি শরীরে ও মনে অবনত হইয়া যায়। নৃতত্ত্ববিদ্ হিসাবে আমাদের উভয় পক্ষের মতামত নির্বিচারে মানিয়া লইলে চলিবে না। যে সকল ক্ষেত্রে অসবর্ণ বিবাহ ঘটিয়াছে, সেখানে গবেষণার দ্বারা সন্তানসন্ততির উপর তাহার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে। এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যদি মনে হয় যে, এরূপ বিবাহ হইতে মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, তবে সমাজের সম্মুখে তাহাই বলিতে হইবে। যদি মনে হয়, সামাজিক কতকগুলি নিয়মের পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহার পর এইরূপ বিবাহ প্রচলিত করা উচিত, তবে সেই পরিবর্তনের জন্য আমাদিগকে আশু জনমত গঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সমাজে এই জাতীয় সমস্যার কোনও অভাব নাই, আমাদের কর্তব্যেরও অভাব কোনও দিন ঘটিবে না। যে বিষয়ের অভাব অনুক্ষণ অনুভব করিতেছি, তাহা হইল—দুঃখের বোধের অভাব। আমাদের চারিদিকে বিশাল সংসারে যে দুঃখ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সম্বন্ধেই আমরা সব সময়ে সচেতন নহি। ১৯৩০-৩১ সালে বাংলা দেশের জনৈক কংগ্রেসকর্মী গান্ধীজীকে এই মর্মে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, "কংগ্রেসের কাজ করিতে গিয়া সময়ে সময়ে আমার মধ্যে অভিমান জাগিয়া ওঠে, তখন কংগ্রেসের আপিস দখল করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠি, প্রতিপক্ষকে দাবাইবার চেষ্টা করি ; মনে হয়, তাহারা দেশের মিত্র নয়, আমিই শুধু ঠিক পথে চলিয়াছি। আমার প্রদর্শিত

পথে সকলে চলুক, সকলে আমাকে মান্য করুক। এইরূপ অভিমান হইতে মুক্তির উপায় কি, সেবার ভার কেমন করিয়া সর্বদা মনের সামনে উজ্জ্বল রাখিব?" উত্তরে মহাত্মা গান্ধী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "I will give you a talisman. Whenever you are in doubt, or when the self becomes too much with you, recall the face of the poorest and the weakest man whom you may have seen, and ask yourself, if the step you contemplate is going to be of any use to him? Will it restore him to a control over his own life and destiny?

Then you will find your doubts and your self melting away."

ঠিক ভাষাটি মনে নাই; কেননা, চিঠিখানি পরবর্তীকালে রাজপুরুষদের তাড়নায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তিনি যে রক্ষাকবচের কথা চিঠিতে লিখিয়াছিলেন, তাহারা সঠিক উল্লেখ করিলাম। জ্ঞানের সাধনার মধ্যে আমাদের জীবনে বহু মুহূর্ত এমন আসিয়া থাকে, যখন জ্ঞানের লক্ষ্য আমাদের সম্মুখে আর উপস্থিত থাকে না। নিজের চাকরি, নিজের উন্নতি, অপরের বিদ্যাহীনতা, অপরের সঙ্কীর্ণতা আমাদের চোখের সামনে আসিয়া জ্ঞান এবং সেবা—উভয়কেই ঢাকিয়া ফেলে। তাই শুধু কামনা করি যে, জীবনের এইরূপ দুর্বল মুহূর্তে মানবের দুঃখের রূঢ় চিত্র আমাদের চোখের সম্মুখে জাগিয়া যেন আমাদের জ্ঞানের প্রবৃত্তি ও মানবসেবার বুদ্ধিকে পুনরায় প্রদীপ্ত করিয়া দেয়। ভগবান বুদ্ধ চারিটি আর্য মহাসত্যের মধ্যে বলিয়াছিলেন, জগতে যে দুঃখ আছে ইহাই প্রথম এবং প্রধান সত্য। এই সত্যের বোধ যেন সদাসর্বদা আমাদিগকে অহমিকার নাগপাশ হইতে বাঁচাইবার পক্ষে রক্ষাকবচের মত কাজ করে।

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যানথ্রপলজিক্যাল ইন্সটিটিউটে প্রদত্ত বক্তৃতা]

বিজ্ঞান শিক্ষকের অভিজ্ঞতা

কিছুদিন হইতে বিজ্ঞানশিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, নৃতত্ত্ববিজ্ঞানের এমন একটি শাখার সম্বন্ধে আমাকে পড়াইতে হয় যাহার প্রতি শুধু তত্ত্বান্বেষী ভিন্ন অপর কাহারও প্রবৃত্তি থাকিবার কথা নয়। অতি প্রাচীনকালে মানুষ কেমনভাবে জীবনযাপন করিত, কেমন করিয়া প্রথমে পাথরের ও কাঠের অস্ত্রাদি নির্মাণ করিত, ক্রমশ তামা, লোহা প্রভৃতি ধাতু আবিষ্কৃত হইল, মানুষ মৃন্ময় পাত্র রচনা করিতে শিখিল, পশুপালন এবং কৃষিকার্যের উদ্ভব হইল, ইহাই ছাত্রগণ আমার নিকটে শিক্ষা করিয়া থাকে। পুরাতন কাহিনীর প্রতি আকর্ষণ সকলের পক্ষে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা অধ্যয়ন করে তাহারা বিজ্ঞানের ছাত্র, অতএব নিছক গল্প শুনাইলে আমার চলে না। সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতি শিখাইতে হয়, বিলুপ্ত মানবের সম্বন্ধে আমরা কেমন করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহাও বলিতে হয়। উপরন্তু ছাত্রগণের অনুসন্ধিৎসা জাগরূক থাকে সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখিতে হয়। তদ্ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মূলমন্ত্র Advancement of Learning অর্থাৎ বিদ্যার প্রসারের সম্বন্ধেও কর্মচারী হিসাবে আমাকে অবহিত থাকিতে হয়। পঠন এবং পাঠনের কাজ সমাপন করিয়া আমাকে যথাসাধ্য গবেষণাকার্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়। মোটামুটি, এইরূপ কয়েকটি কাজের ভার লইয়া শিক্ষকতা করিতেছি। সামান্য দুই বৎসরের মধ্যে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি, তাহা সব সময়ে পরিষ্কার করিয়া তলাইয়া ভাবি নাই। অথচ তাহার প্রয়োজনও

আছে। বনের হরিণ যখন আক্রমণকারী ব্যাধের নিকট তাড়া খাইয়া ছুটিয়া চলে, তখন সে মাঝে মাঝে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়ায়, কান পাতিয়া শুনিবার চেষ্টা করে, ঠিক পথে চলিয়াছে কিনা। আমিও শিক্ষকতা কাযে সেইরূপ স্থির হইয়া দুই দণ্ড দাড়াইয়া ভাবিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতেছি। চাকরির বাঁধাপথে কতকগুলি কাজ আমার জন্য নির্দিষ্ট আছে। সে সম্বন্ধে অবহেলা না করিলে চাকরি যে বজায় থাকিবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ঠিক পথে চলিয়াছি কিনা, তাহাও ত ভাবিবার বিষয়। যেখানে একার ভাবনায় কাজ হয় না, সেখানে পাঁচজন সমধর্মী ব্যক্তির সহিত আলাপ আলোচনা দ্বারা মানুষ পথের দিশা আরও সহজে লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই আশায় সর্বজনসমক্ষে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

বক্তৃতার ভাষা

যে সকল যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ববিদ্যা আহরণ করিবার জন্য আসে তাহারা মোটামুটি পরিণতবয়স্ক। তাহারা বিজ্ঞান এবং সাহিত্যের প্রথম পাঠ সমাপন করিয়া তবে এখানে আসে। বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির ফলে তাহারা বাংলাভাষা অপেক্ষা ইংরেজীতে বেশী বই পাঠ করিয়া থাকে, অতএব ইংরেজী ভাষায় তাহাদের কিছু দখল থাকিবার কথা।

যে ছাত্রগণকে লইয়া আমাকে কারবার করিতে হয় তাহার মধ্যে বেশ ধারাল ছেলে দেখিয়াছি, আবার ধারাল নয় এমন ছেলেও দেখিয়াছি। কেহ বা একবার পড়িয়াই বিষয়টির সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করিতে পারে, কাহারও বা উহা বুঝিতে সময় লাগে। যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ

বইএর ভাষা পড়িয়া বুঝিতে পারে না, সেখানে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু ক্লাসে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, বুঝিতে দেরি হইলে দোষ শিক্ষকের, ছাত্রের নহে। ইংরেজী আমাদের ভাষা নহে। ইংরেজীতে পড়াইতে গিয়া অনেক সময় আমাদের ভাষার চক্রযান এমনই বিকল হইয়া পড়ে যে শুধু শকট-চালকেরই প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ হয় না, উপরন্তু যাত্রীর দলও ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া ওঠে। এরূপ অবস্থায় ইংরেজী এবং বাংলা মিশাইয়া "কলেজ স্কোয়ারের ভাষায়" আপদুদ্ধারের একটি রীতি প্রচলিত আছে, কিন্তু আমি সে ভাষাটি এখনও আয়ত্ত করিতে পারি নাই। পারিব কিনা তাহাও সন্দেহ; কেননা ব্যক্তিগতভাবে আমার বাংলাভাষার প্রতি শ্রদ্ধা আছে, ইংরেজীর প্রতিও আছে, কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণজাত বস্তুর প্রতি তেমন শ্রদ্ধা এখনও অর্জন করিতে পারি নাই।

ভাষার অচল অবস্থায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছি, বিষয়টিকে যদি আবার গোড়া হইতে বিবেচনা করা যায় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুফল ফলিয়া থাকে। যে বাক্য পূর্বে ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছি তাহারই টীকা বা ভাষ্যের অপচেষ্টা না করিয়া নূতনভাবে বিষয়টি আলোচনা করাই ভাল। কঠিন অথবা নীরস বিষয় হইলে ছাত্রগণ বহুক্ষণ একাগ্রভাবে কান খাড়া করিয়া রাখিতে পারে না। মনোযোগের অভাব ঘটিলে যুক্তি এবং তর্ক তাহাদের নিকট অচল হইয়া যায়, তাহারা হাই তোলে, বাহিরে কোথাও সামান্য শব্দ হইলেই সেদিকে ফিরিয়া তাকায়। এরূপ অবস্থায় যদি বক্তৃতার সাহায্যে তাহাদের চোখের সম্মুখে কতকগুলি ছবির সৃষ্টি করা যায়, অমনই তাহাদের মনোযোগ পুনরায় আকৃষ্ট হয়।

বাক্যের দ্বারা এইরূপ ছবি আঁকিবার কালে দেখিয়াছি বক্তৃতার ভাষা যত সরল, যত স্পষ্ট হয় ততই ছবি স্পষ্টতররূপে ফুটিয়া ওঠে।

একেবারে ঈশপ্‌স ফেব্‌ল্‌সের ভাষা হইলেই ভাল হয়, কিন্তু ভাষাকে অত সরল করিবার মত ইংরেজী বিদ্যা ত আমার নাই, সেইজন্য উহাকে যতদূর সাধ্য সরল করিবার চেষ্টাই করিয়া থাকি। সর্বদা কেবল লক্ষ্য রাখি, ভাষার তরণী যেন অলঙ্কারের ভারে ডুবিয়া না যায়।

বক্তৃতার সময়ে অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, যখনই আমার বাক্য দীর্ঘ হইতেছে, ভাষা জটিল অথবা অলঙ্কারবহুল হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ব্যাখ্যানবস্তুও উত্তরোত্তর অস্পষ্ট হইয়া পড়িতেছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যায় যে বক্তব্যের সম্বন্ধে আমার নিজের মনেই খানিক অস্পষ্টতা রহিয়া গিয়াছে। বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে আমার নিজের ধারণা যত স্পষ্ট, যত দ্বিধাশূন্য হইবে, ভাষাও তত সহজ তত সরল হইতে দেখা যায়। বাড়ীর গৃহিণীরা বাসি মাছ চালাইবার সময়ে বেশ করিয়া তাহাতে পেঁয়াজ ও লঙ্কাবাটা দিয়া রাঁধেন, বক্তৃতার মধ্যে তেমনই ভাবের রাজ্যে গোলযোগ থাকিলে ভাষাও খুব সাজগোজ করিয়া বাহির হয়।

শুধু নিজের অভিজ্ঞতাই নয়। ক্লাসে ছাত্রগণকে আমি যে সকল প্রশ্ন করি তাহার উত্তরে প্রত্যেককে ছোটখাট বক্তৃতা করিতে হয়। আমার ক্লাসে ছাত্রগণ স্বীয় আসনের সামনে দাঁড়াইয়া উত্তর দিতে পায় না, সামনে আসিয়া অপর ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া উত্তর শোনাইয়া যায়। উপবিষ্ট ছাত্রগণ বুঝিতে না পারিলে প্রতিপ্রশ্ন করে, তখন বক্তাকে সেই প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হয়। ছাত্রগণ যাহাতে প্রশ্ন করিতে শেখে, মনের সন্দেহ প্রশ্নের আকারে জ্ঞাপন করিতে শেখে, এবং তাহার যথাযথ উত্তর বক্তৃতাচ্ছলে জ্ঞাপন করিতে পারে, সে বিষয়ে আমি লক্ষ্য রাখি।

কিন্তু প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, উত্তর ঠিকমত জানা না থাকিলে

ছাত্রগণ হয় নির্বাক হইয়া যায়, নয়ত আবোলতাবোল বকিতে আরম্ভ করে। অসমসাহসিক ছাত্রগণ সেরূপ বক্তাকে কঠিন প্রশ্নের বাণে জর্জরিত করিবার চেষ্টা করে, অথবা অতিশয় সত্যপ্রিয় হইলে স্পষ্ট মন্তব্য করে যে 'বক্তৃতা ভাল হইয়াছে, কিন্তু অর্থ কিছুই বুঝা গেল না। অতএব বক্তা আর একবার প্রশ্নটির উত্তর নূতন করিয়া দিন।'

আমাদের নিজের ক্ষেত্রেও যেমন, ছাত্রগণের ক্ষেত্রেও তেমনই উপলব্ধি করিয়াছি যে বিষয়বস্তুর সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না জন্মাইলে বক্তৃতার ভাষা কখনও সরল ও স্পষ্ট হয় না। স্পষ্ট এবং সহজবোধ্য বক্তৃতা করিবার প্রধান সাধন হইল বক্তব্যের সম্বন্ধে পরিপূর্ণ এবং নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান উপাজন করা ; সেটি হইলেই বাকি আপনিই ঠিক হইয়া যায়। তাহার জন্য হয়ত অনেকখানি পরিশ্রম করিতে হয়, হয়ত মনে মনে অথবা নিভৃতে বক্তৃতাটি মোটামুটি গড়িয়া লইতে হয়, কিন্তু শিক্ষকের পক্ষ হইতে ইহার দ্বারা যথেষ্ট সুফল লাভ করা যায়।

বক্তৃতার বিষয়

ক্লাসের সময় যদিও এক ঘণ্টা নির্দিষ্ট থাকে তবু ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া তাহার প্রতি মুহূর্তই যে কথার দ্বারা ভরাট করিতে হইবে এমন চেষ্টা আমাদের মধ্যে থাকা উচিত নয়। এক দিনের, অর্থাৎ এক ঘণ্টার বক্তৃতার জন্য একটি ছোট নিটোল শিক্ষণীয় বিষয় বাছিয়া লওয়া দরকার। তাহার সম্বন্ধে বলিতে বলিতে কোন দিন বা মাত্র আধঘণ্টা সময় লাগে, কোন দিন এক ঘণ্টার অতিরিক্ত দুই চারি মিনিটও হইয়া যায়। কিন্তু এক দিনে বেশী বস্তু কিছুতেই পরিবেশন করা উচিত নয়। মাসিক পত্রিকায় ক্রমশ প্রকাশিত গল্পের মত একটি বক্তৃতা যদি শেষের দিকে বেশ গুছাইয়া সমাপ্ত করিতে না পারি, একটু ক্রমশ থাকিয়া

যায়, তাহা হইলে ছাত্রগণের মনে সেদিনকার বক্তৃতার বিন্দুমাত্র দাগ থাকে না। বক্তৃতাটি ছোট হউক তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু বক্তৃতার আদি, মধ্য এবং অন্ত থাকা প্রয়োজন। ইংরেজীতে যাহাকে ইউনিট বলে, প্রত্যেক বক্তৃতা এইরূপ নিটোল একটি ইউনিট হইবে, ইহা সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষের জীবনযাত্রার পদ্ধতি সম্বন্ধে পড়াইতে গিয়া সে-সময়ের আবহাওয়া লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিতে হয়। আবহাওয়ার সম্পর্কে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে। যেমন, কোন্ কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনের কথা জানিতে পারি, অথবা জগতের সকল দেশে পরিবর্তনের প্রমাণ বর্তমান কিনা, কিম্বা উল্লিখিত পরিবর্তনের মুখ্য এবং গৌণ নৈসর্গিক কারণ কি বলিয়া বৈজ্ঞানিকগণ বিবেচনা করেন। হয়ত জলবায়ু সম্পর্কিত আলোচনাটি এইরূপ তিন খণ্ডে ভাঙিয়া তিনটি পৃথক এবং অভগ্ন বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলাম। ইহার দ্বারা দুইটি উত্তম ফল লাভ হয়। প্রথম, ছাত্রেরা প্রতিদিন যে সত্যসত্যই নূতন কিছু শিখিতেছে, এ বিশ্বাস তাহাদের মনে জন্মায়। দ্বিতীয়ত, পরদিবসের বক্তৃতা শুনিবার সময়ে তাহারা যে বিদ্যাভ্যাসে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, এ ধারণা তাহাদের মনে থাকে। কিন্তু এই অগ্রগমনের মধ্যে একটি অক্ষুণ্ণ যোগসূত্র বজায় রাখিবার জন্য আমাদের সকল সময়েই চেষ্টা করা কর্তব্য।

পূর্বের উদাহরণ পুনরায় বিবেচনা করা যাক। জলবায়ু-পরিবর্তনের সম্পর্কে বক্তৃতার স্থানে স্থানে কৌশলে এবং পরোক্ষভাবে আমি মানুষের জীবনের প্রতি সামান্য ইঙ্গিত করিয়া থাকি। এক সময়ে ইউরোপে নিদারুণ শীত ছিল, ইহা বুঝাইবার জন্য তখনকার টেম্পারেচর কত ডিগ্রী পর্যন্ত নামিত তাহা না বলিয়া বরং বলিয়া থাকি

যে এস্কিমোদের দেশে আজ যেমন শীত জার্মানির উত্তরাংশে তখন তেমনই শীত ছিল। চারিদিকে বরফ দেখা যাইত এবং তাহার উপরে উত্তরমেরুর মত বল্‌গা হরিণ ঘুরিয়া বেড়াইত, সেই হরিণ পায়ের খুরের দ্বারা বরফ খুঁড়িয়া ঠাণ্ডা জমাট মাটিতে সংলগ্ন শ্যাওলা বাহির করিয়া খাইত। অর্থাৎ তখনকার ঠাণ্ডার পরিমাণ টেম্পারেচারের মত কোন abstract তথ্যের সাহায্যে না বুঝাইয়া, তখনকার জীবজন্তু ও বিভিন্ন জাতের শ্যাওলা বা গাছপালার এক লম্বা ফর্দ না দিয়া মানুষের অনুভূতির ছলে ধারণা জন্মাইতে চেষ্টা করি। ইহাতে যে ছাত্রগণের ধারণাই শুধু স্পষ্টতর হয় তাহা নহে, পরবর্তী বক্তৃতার জন্যও প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া যায়। পরের বক্তৃতায় যখন প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনযাত্রার সম্বন্ধে, তাহার পোষাকপরিচ্ছদ, ঘরবাড়ী, অস্ত্রশস্ত্রের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করিতে হয় তখন উহা আর ছাত্রগণের নিকটে অপ্রত্যাশিত বস্তুর মত মনে হয় না। উপরন্তু পুরাতন পাঠের সম্পর্কেও ছাত্রগণের নূতন একটি কৌতূহল জন্মায়, আবহাওয়ার সহিত জীবজন্তু, গাছপালা এবং মানুষের জীবন কত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত তাহা চিন্তা করিয়া আবহাওয়ার সম্বন্ধে ছাত্রগণের রুচি ও অনুসন্ধানের ইচ্ছা যেন বাড়িয়া যায়। এরূপে বিভিন্ন বক্তৃতা অঙ্গাঙ্গীসম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া ছাত্রদের শিক্ষিতবস্তু মনে রাখিবার পক্ষেও যথেষ্ট সহায়তা করে।

বক্তৃতার লক্ষ্য

কোন বিষয়ে ব্যাখ্যানেরও দুইটি রীতি আছে। পূর্বকালে জলবাতাস কি রকম ছিল সে সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আজও সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ নহে। যে সকল প্রমাণ বা তথ্য আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে আহরিত হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করিয়া

মনীষীগণ কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আমাদের বক্তৃতার মধ্যে সেই সিদ্ধান্তগুলি মূল বিষয়রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অথবা তাহার পরিবর্তে বিভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় লব্ধ নির্ভুল তথ্যগুলি সেই স্থান অধিকার করিতে পারে। সিদ্ধান্তের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিলে ছাত্রগণের নিকট নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান না হইয়া ঐতিহাসিক তত্ত্বকথার আকার ধারণ করে, উহা ব্যক্তিগত সাধনার বিষয় না হইয়া স্মৃতির দ্বারা অধিকার করিবার মত বস্তুতে পরিণত হয়। নির্ভুলভাবে পর্যবেক্ষণের দ্বারা বহু তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক মানুষই যে সংযত কল্পনার সাহায্যে নূতন বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত সৃষ্টি করিতে পারে, ইহা ছাত্রেরা অনুভব করিতে শেখে না। তৎপরিবর্তে তাহারা ইউরোপের কয়েকজন অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিকে তারিফ করিতে শেখে, তাহাদের ভক্তি করিতে শেখে, স্বতন্ত্র জগতের জীব বলিয়া ভাবে এবং এরূপ শিক্ষার দ্বারা তাহাদের ব্যক্তিগত সাধনেচ্ছা জাগ্রত হয় না, আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হয় না। নির্ভুল তথ্য অপেক্ষা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ তাহাদের নিকট অধিক আদরের সামগ্রী হইয়া দাঁড়ায়, আত্মবিশ্বাসের পরিবর্তে নূতন ধরণের গুরুবাদ তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করে।

অপর পক্ষে যদি বক্তৃতার মধ্যে আমরা তথ্যকে এবং সত্যানুসন্ধানের চেষ্টাকে প্রধান স্থান দিই এবং তথ্যসমষ্টিকে বিচার করিয়া বিভিন্ন মনীষীগণ যে সকল বিভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহার তুলনা করি এবং বিচার করিয়া দেখি কোন্‌টিতে কল্পনা সুশাসনের অধীন রহিয়াছে, কোন্‌টি ভবিষ্যতের জন্য নূতন গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে, তবে ছাত্রগণের মধ্যে নবতর গুরুবাদের পরিবর্তে একটি সুস্থ আত্মবিশ্বাস এবং কর্মচেষ্টার উদয় হয়। তাহারা অনুভব করিতে শেখে যে বৈজ্ঞানিক পথপ্রদর্শকগণও

তাঁহাদেরই সমধর্মী, তাঁহারাও মনীষীগণের সতীর্থ ও সহকর্মী। বিজ্ঞান-শিক্ষায় এই ভাবকে জাগ্রত করাই আমাদের বক্তৃতার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তবে একটি কথা আছে। শুধু শিক্ষকের বক্তৃতার দ্বারা ছাত্রগণের মনে আত্মনির্ভরশীল মনোবৃত্তি সৃষ্টি হওয়া কখনও সম্ভব নয়। যতক্ষণ তাহারা নিজে হাতে কাজ না করে ততক্ষণ স্থায়ীভাবে সে ভাব তাহাদের জাগিতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত সাধনার দ্বারা যে ভাব ভবিষ্যতে জাগিবে, শিক্ষকের বক্তৃতায় তাহারই বিকাশ এবং বৃদ্ধির আয়োজন করিয়া রাখিতে হইবে, ইহাই আমার বক্তব্য। ছাত্রদের সাধনায় যাহা বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে এমন কোনও ভাব অথবা চিন্তা বা অভ্যাসের বীজ যেন শিক্ষকের বক্তৃতা দ্বারা কোন দিন রোপিত না হয়। বিজ্ঞানে গুরুবাদ ভাল নয়, আত্মবিশ্বাস ভাল। কল্পনার প্রয়োজন আছে, কিন্তু কল্পনা যেন তথ্যসমষ্টিকে একটুও অতিক্রম করিয়া না চলে। সিদ্ধান্তগুলি কোনদিনই অপরিহার্য নয়, তাহার প্রতি মমতার উদ্রেক যেন না হয়। বৈজ্ঞানিক ডান হাত দিয়া যে সিদ্ধান্ত গড়িবেন, বাঁ হাত দিয়া তাহা ভাঙিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকেন, এই মূল শিক্ষাটি যেন বক্তৃতার তলে তলে ছাত্রের মনে সংক্রামিত হইয়া যায়।

কাহাকেও একটি প্রস্ফুটিত পুষ্প উপহার দিলে যেমন পুষ্পের সৌরভ তাহার মনকে আমোদিত করে, বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় বক্তৃতার মধ্যেও যেন শিক্ষণীয় বিষয়কে অতিক্রম করিয়া বৈজ্ঞানিক সাধনপদ্ধতির অন্তর্নিহিত আনন্দ ও সত্যের দুর্গম আকর্ষণ পুষ্পের সৌরভের মত ছাত্রগণের মনকে আমোদিত করিতে পারে।

ছাত্রজগতের কথা

প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যখন শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করি, তখন কয়েকজন বন্ধুর নিকট বর্তমান কালের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ শুনিয়াছিলাম। তাহারা নাকি আমাদের ছাত্রবয়সের তুলনায় অনেক তরলমতি হইয়াছে, লেখাপড়ায় আজকাল পূর্বের মত অনুরাগ দেখা যায় না। কথাটি শুনিয়াছিলাম, কিন্তু নিজে সাক্ষাৎভাবে ছাত্রজগতের সংস্পর্শে আসি নাই বলিয়া ইহার সত্যাসত্য যাচাই করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই।

নিজের ছাত্রজীবনের সম্বন্ধে আমার মনে কোনও স্বপ্নমাখা স্মৃতি নাই। তখনকার কথা বেশ স্পষ্টভাবেই মনে আছে, বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারে বসিয়া চিত্তের মধ্যে অনেক সময়ে কতই না অস্থিরতা অনুভব করিয়াছি! আপন কাজ করিতে না করিতে একখানি প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিবার বাসনা হইত; বড় কথা ছাড়া ছোট কথা বলিতে মন কিছুতেই সরিত না। প্রথম প্রবন্ধ লিখিতে বসিয়া একেবারে ডারউইন অথবা গীকীর মত বৈজ্ঞানিকের ভুল ধরিয়া বসিতাম। মহাপুরুষদের খুঁত ধরিতে পারিলেই যে আমি নিজে তাঁহাদের সমকক্ষ বৈজ্ঞানিক হইতে পারিব, এই ধরণের একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা মনের মধ্যে হয়ত ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইত।

সেই অবস্থা হইতে ধীরে ধীরে কেমন করিয়া নিজের চঞ্চল বৃত্তি-গুলিকে হাত পা বাঁধিয়া সংযত করিয়াছিলাম, তাহার দীর্ঘ ইতিহাস বলিয়া আজিকার বক্তব্যের রসভঙ্গ করিতে চাই না। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, তথ্যানুসন্ধানের জন্য ক্রোশের পর ক্রোশ রোদে হাঁটিয়া মন্দিরের গায়ে কতগুলি ঘোড়া, কতগুলি হাতী, কয়জন মানুষের ছবি আঁকা আছে তাহার নীরস তালিকা রচনা করিয়া মন্দিরের বিভিন্ন

অংশের দৈর্ঘ্য প্রস্থ কত, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা মাপিবার চেষ্টা করিয়া বহু বৎসর পরে আমি মনকে কিয়ৎপরিমাণে সংযমের পথে আনিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। এইরূপ শাসনের আঘাতে মন বন্য পশুর মত ছটফট করিত, মূর্তিগণনার মধ্যেও ফাঁকে ফাঁকে অন্যমনস্ক হইয়া রসপূর্ণ বিষয়ের স্বপ্নে বিশ্রাম লাভের চেষ্টা করিত। কিন্তু অতিশয় মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও তাহাকে বার বার অতিশয় নীরস অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় গণনার, অর্থাৎ তথ্যসংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করিয়া আমি ধীরে ধীরে তাহাকে বিজ্ঞানসেবীর যোগ্য অবস্থায় আনয়ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ নির্ভুল তথ্যানুসন্ধানের জন্য যতটুকু অনুরাগ মনের মধ্যে গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহার জন্য কত দীর্ঘ দিনের চেষ্টা যে অতিবাহিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সেই চেষ্টার মধ্যে নিজের অন্তর্নিহিত কত যে দুর্বলতার সন্ধান পাইয়াছি, তাহার জন্য আজও অন্তরে অনেকখানি গ্লানি অনুভব করিয়া থাকি, কেননা, সে সকল দুর্বলতা আজও সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় নাই।

কিন্তু সে প্রসঙ্গ বাদ দিয়া এবার বর্তমান বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক। ছাত্রজীবনের যে অবস্থার কথা বলিতেছি, তখন বাহির হইতে দেখিলে আমাকে নিশ্চয়ই অতিশয় অস্থিরচিত্ত ছাত্র বলিয়া সকলের ধারণা হইত। কেননা পূর্বেই বলিয়াছি যে আমার মনকে সুশাসনে আনিতে বহু বৎসর সময় লাগিয়াছিল, এবং ততদিনে আমার ছাত্রজীবনও অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছিল। অতএব পূর্ববর্তী অবস্থায় যে আমি একজন পাকা বৈজ্ঞানিক ছিলাম না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তখন অপরাপর ছাত্রের মতই খেলাধুলা করিতাম, সুযোগ পাইলে গবেষণাগারের জানালা টপকাইয়া এক

দান ক্রিকেট খেলিয়া আসিতাম, এমন ঘটনাও বিরল ছিল না। অতএব শিক্ষকগণ যে আমাদিগকে যথেষ্ট তরলমতি এবং অস্থিরচিত্ত ভাবিবেন ইহা আর বিচিত্র কি ?

নিজের বিষয়ে উপরোক্ত জ্ঞান আমার ছিল বলিয়া প্রথম যখন শিক্ষকরূপে ছাত্রজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হইলাম, তখন তাহাদিগকে আমাদের অপেক্ষা অধিক তরলমতি বলিয়া মনে করিতে পারি নাই। ঐ বয়সে আমিও যেমন ছিলাম, ইহারাও তেমনই রহিয়াছে। আমিও যেমন লেখাপড়ার মধ্যে কখনও কখনও রাজনীতি লইয়া মাথা- ঘামাইতাম, কখনও বা দুর্ভিক্ষের দেশে স্বেচ্ছাসেবকরূপে যাইতাম, ইহারাও তেমনই করিয়া থাকে। তৎসত্ত্বেও বৈজ্ঞানিক সাধনায় যদি আমার পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে, বর্তমান কালের ছাত্রগণের মধ্যেও অনুরূপ পরিবর্তন অসম্ভব হইবে না, এইরূপ ধারণা লইয়া আমি ছাত্রগণের সঙ্গে কারবার আরম্ভ করি।

নিজের ছাত্রজীবনের আরও একটি গভীর স্মৃতি আমার শিক্ষকতা-বৃত্তির প্রথম অবস্থায় মনের মধ্যে উদয় হইত। যে সকল শিক্ষকের নিকট আমি বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে একজনের স্মৃতি আমার অন্তরে চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। শিক্ষক হিসাবে অধ্যাপক ৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত হয়ত যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিতে পারেন নাই, কিন্তু মনে প্রাণে অমন একনিষ্ঠ বিজ্ঞানের সাধক আমি জীবনে খুব কমই দেখিয়াছি। প্রতি দিন নিয়মিত ভাবে দশ ঘণ্টা বার ঘণ্টা পঠন পাঠন এবং গবেষণা কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন বলিয়া তাঁহার ছাত্রগণের মধ্যেও কেহ আলস্যের বিন্দুমাত্র সুযোগ পাইত না। গবেষণাগারে অবিরত পরিশ্রমের পর যখনই আমাদের দেহে শ্রান্তি আসিত, অথবা পর্বতে অরণ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন ক্লান্তির

বশে আমরা বসিবার একটু আয়োজন করিতাম, তখনই মনে পড়িত, রোগভোগের পর শরীরের দুর্বল অবস্থাতেও হেমবাবু মাঠে ঘুরিয়া তথ্যানুসন্ধানের মধ্যে ঠিক বেলা একটা হইতে একটা পাঁচ মিনিট পর্যন্ত বিশ্রাম লইতেন, তাহার আগে অথবা পরে, অসময়ে, তিনি নিজেকে কোনদিনই বিশ্রাম দিতেন না, কেননা তখন তাঁহার হাঁটিবার এবং পর্যবেক্ষণ করিবার সময়। সেই আদর্শের স্মৃতি মনে উদিত হইলে আমরা পুনরায় নিজের আলস্যকে বর্জন করিবার চেষ্টা করিতাম, কাজকে তপস্যা জ্ঞান করিয়া স্বীয় অনুসন্ধানে আরও অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতাম।

আমার শিক্ষাগুরুর কথা ভাবিয়া অনেক সময়ে মনে হইয়াছে যে তাঁহার আদর্শের প্রভাবেই হয়ত আমরা আংশিকভাবে নিরলস হইতে পারিয়াছি, নিজের অন্তরে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ ভাবসকলকে নষ্ট করিবার সাহস এবং উদ্যম অনেকাংশে লাভ করিয়াছি। সেই জন্য বর্তমান কালের ছাত্রগণের মধ্যে তারল্যের ভাব অথবা একনিষ্ঠ চেষ্টার অভাব দেখিলে শুধু যে নিজের ছাত্রাবস্থায় নানাবিধ দুর্বলতার কথাই ভাবিয়াছি, তাহা নহে। ইহাও মনে হইয়াছে যে যদি হেমবাবুর মত সাধনা এবং সত্যনিষ্ঠার একান্ত আদর্শ ইহাদের সম্মুখে ধরা যায়, তবে কি ইহাদের মতি পরিবর্তিত হইবে না?

তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা যে অতিশয় সামান্য, ইহা সর্বদাই স্বীকার করি। তবু এই স্বল্পকালের মধ্যে যতটুকু আভাস পাইয়াছি, তাহাতে বর্তমান কালের ছাত্রগণকে কোনও অস্বাভাবিক দুর্বলতা-দোষে দুষ্ট বলিয়া এখন পর্যন্ত মনে হয় নাই। বরং শুভ দৃষ্টান্তের প্রভাবে তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে বর্ধিত হইতে দেখিয়া মনে হইয়াছে, উপযুক্ত উপায়ের দ্বারা ইহাদের উৎসাহ এবং কর্মচেষ্টাকে অব্যাহত রাখিতে পারিলে ইহাদের দ্বারা নিশ্চয়ই উত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণা

সম্ভব। কেমন করিয়া সেই বুদ্ধিকে জাগ্রত এবং চেষ্টাকে অনির্বাণ অবস্থায় রাখিতে পারা যায়, তাহাই হইল শিক্ষক হিসাবে আমাদের ভাবিবার বিষয়। তবে নানা উপায়ের মধ্যে শিক্ষকের একনিষ্ঠ তপস্যার আদর্শ যে একটি প্রধান উপায়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কর্মে সহযোগিতা

বিজ্ঞানের সাধনা এমন একটি ব্যাপার, যেখানে কেহ জোর গলায় বলিতে পারেন না যে তাঁহার কাজ শেষ হইয়াছে, তিনি ধ্রুব সত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিজ্ঞানসাধক অনেকগুলি পরীক্ষিত তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া একটি অনুমিতি (hypothesis) রচনা করেন, তাহাই কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট সত্যের আসন অধিকার করে। কিন্তু আদর্শ বৈজ্ঞানিক কখনও নিষ্ক্রিয় থাকেন না, তিনি নিত্য নূতন পরীক্ষা উদ্ভাবনের দ্বারা সেই অনুমিতির সত্যাসত্য যাচাই করিয়া থাকেন। ফলে সারা জীবন ধরিয়া তাঁহাকে একটির পর একটি মাটির পুতুল গড়িতে হয়, আবার নিজের হাতেই তাহাকে বিসর্জন দিতে হয়। সত্যের প্রতি অন্তরে একান্ত অনুরাগ থাকিলে তবেই মানুষ অমন মমতাশূন্য হইয়া ভাঙাগড়ার কাজ করিতে পারে।

আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিজ্ঞানবিষয়ে শিক্ষাদান করেন, তাঁহাদের সকলের চরিত্র যে উপরোক্ত আদর্শ অনুযায়ী গঠিত হইয়াছে তাহা নহে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের রচিত অনুমিতির প্রতি আমাদের একটি বাৎসল্যভাব জন্মিয়া যায়। অনেক সময়ে সেই মমতার সম্বন্ধে আমরা সচেতনও থাকি না। কিন্তু শিক্ষাদান কালে ছাত্র-

গণের সহজ সরল প্রশ্নের আঘাতে হয়ত সচকিত হইয়া অনুভব করি যে, নিজের মতামতের প্রতি অজ্ঞাতসারে আমাদের যথেষ্ট আসক্তি জন্মিয়াছে; সেইজন্য আমাদের কল্পিত অনুমিতিকে অথবা আমাদের লেখা প্রবন্ধকে কেহ অবহেলা করিলে আমরা বেদনা অনুভব করি, প্রশংসা করিলে আনন্দিত হই, প্রতিবাদ করিলে বিরক্ত হই, এমন কি, অপরকে আঘাত ফিরাইয়া দিবার জন্যও মনের মধ্যে চেষ্টা জাগিয়া ওঠে। এরূপ অবস্থায় আমরা আর সত্যানুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিক না থাকিয়া বিদ্যার পণ্যবিক্রয়ী ব্যবসায়ীর পদে নামিয়া আসি। যে কোনও ব্যবসায়ীর নিকট তাহার পণ্য দ্রব্য খারাপ বলিলে তাহার রাগ হয়। আমাদের ক্ষেত্রেও সেই রাগ হওয়া যথেষ্ট স্বাভাবিক; কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়াই যে ইহা ভাল তাহাত নয়।

এরূপ অধোগতির বিরুদ্ধে একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করা যাইতে পারে। ছাত্রগণকে যদি আমরা সহজ ও সরলভাবে প্রশ্ন করিতে উৎসাহিত করি, মনের সন্দেহ চাপিয়া রাখিতে বারণ করি, এবং সেই সকল সন্দেহকে মানিয়া লইয়া আমাদের মতামতকে, বৈজ্ঞানিক অনুমিতিগুলিকে, বারংবার পরীক্ষা করিয়া লই, আসক্তিশূন্য হইয়া সত্যের সন্ধানে রত থাকি, তবে আমাদের যথেষ্ট লাভ হইতে পারে। গান্ধীজী তাঁহার আত্মচরিতে একটি বড় মূল্যবান অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন টলষ্টয় ফার্ম স্থাপিত হয় তখন অনেকগুলি বালকের শিক্ষার দায়িত্ব তাঁহার উপর আসিয়া পড়ে। সে সময়ে গান্ধীজী স্বীয় আচরণের সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন হইয়া উঠিলেন এবং অনুভব করিলেন যে তাঁহার আচরণে মাঝে মাঝে এমন মনোভাব প্রকাশিত হয়, যাহা ছাত্রগণের পক্ষে অনুকরণের যোগ্য নয়। তখন তিনি নিজের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়া,

আচরণকে আরও শুদ্ধ ও নির্দোষ করিয়া উহাকে ছাত্রগণের নিকট আদর্শে পরিণত করিতে যত্নবান হইলেন।

শিক্ষকতা-বৃত্তির মধ্যে যদি ছাত্রগণকে আমরা নিতান্ত ছাত্র না ভাবিয়া বিজ্ঞানসাধনায় আমাদের সমধর্মী এবং সহকর্মীরূপে বিবেচনা করি তবে তাহাদের প্রয়োজনেই হয়ত আমাদিগকে নিরলস বৈজ্ঞানিক, আরও মমতাশূন্য সত্যানুরাগী সাজিতে হয়। ইহার ফল শেষ পর্যন্ত ভাল ছাড়া কখনও মন্দ হইতে পারে না। পরমহংসদেব একজনের গল্প বলিতেন, সে মাঝে মাঝে সাধু সাজিয়া থাকিত। অবশেষে একদিন সে সাধুত্বের মোহে পড়িয়া গেল, এবং সাধুই হইয়া গেল। আমাদের অন্তরের মধ্যে সত্য সত্যই ভাল বৈজ্ঞানিক হইবার বাসনা থাকিলে আমরা ছাত্রগণের সাহচর্যকে বিজ্ঞানসাধনার একটি উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারি। মূল কথা, ঐ ইচ্ছা আমাদের মধ্যে থাকা চাই। শিক্ষকের বৃত্তি আমাদের নিকট যদি ধর্ম হইয়া দাঁড়ায় তবে ইহা অনেকাংশে সম্ভব হয়।

কিন্তু শিক্ষকের পক্ষ ছাড়িয়া দিলেও উপরোক্ত সহযোগিতার দ্বারা ছাত্রগণের বিদ্যালাভ যে আরও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিছুদিন হইতে ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে প্রাপ্ত কয়েক শত পাথরের তৈয়ারী প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাকে গবেষণা করিতে হইতেছে। ইহা অতিশয় শুষ্ক এবং নীরস কাজ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। ছাত্রগণকেও পরীক্ষায় পাশ করিবার পূর্বে এরূপ অনেক অস্ত্রশস্ত্র নিরীক্ষণ করিতে হয়, অথচ তাহারা উহা খুব ভালও বাসে না। উহাদিগকে আকৃষ্ট করিবার জন্য আমি পরীক্ষাগারে কয়েকটি আলমারিতে ময়ূরভঞ্জের অস্ত্রগুলি বাছিয়া সাজাইবার ভার দিয়াছিলাম। সায়েন্স কলেজের নৃতত্ত্ববিভাগে মাঝে মাঝে বাহিরের

বৈজ্ঞানিকগণ পদধূলি দিয়া থাকেন। চল্লিশ পঞ্চাশ জন ছাত্র পড়ে, তাহারাও সর্বদা উপরোক্ত আলমারিগুলি দেখিতে আসে। অতএব কয়েকজন ছাত্রের উপর আলমারি সাজাইবার ভার দেওয়া হইল, তখন তাহারাও পরীক্ষার কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া হাতের কাজে একান্ত মনোনিবেশ করিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে কাজ করিতাম, কোনও সমস্যার উদ্ভব হইলে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতাম, অথবা প্রামাণিক গ্রন্থ বা প্রবন্ধ পাঠে সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য ছাত্রগণকে উৎসাহিত করিতাম। কাজে দায়িত্বলাভের দ্বারা একান্ত নীরস বিষয়ও ছাত্রগণের নিকট আনন্দরসে সিঞ্চিত হইয়া উঠিল। অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ছাত্রগণ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের পদে অধিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু বিপদ হয় বি. এস্-সি. অথবা এম্. এস্-সি. পরীক্ষার ব্যাপার লইয়া। ছাত্রগণ নানাবিধ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য। অথচ যদি একটি বিশেষ গবেষণায় তাহারা মাসের পর মাস অতিবাহিত করে, তবে বিজ্ঞান যতই শিখুক না কেন, পরীক্ষার ক্ষেত্রে আশানুযায়ী ভাল ফল হয় না। যাহারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা ভয়ে অথবা অন্যান্য বিষয়ে পড়ার চাপে শেষ পর্যন্ত গবেষণায় স্থির থাকিতে পারে না। উপাধি পরীক্ষার চাপে তাহারা নৃতত্ত্বের বহু তথ্য আয়ত্ত করে বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের সাধনায় তাহারা নিতান্ত কাঁচা থাকিয়া যায়। শিক্ষক ও ছাত্রের সহযোগিতায় উভয়ের মধ্যে যে বন্ধন নিবিড়তর হইতে থাকে, বৈজ্ঞানিক গবেষণার নূতন নূতন যে সকল দ্বার খুলিয়া যায়, তাহা উপাধিপরীক্ষার আঘাতে অনেকখানি নষ্ট হইয়া যায়।

সেই জন্য, প্রকৃত বিজ্ঞানের উন্নতি করিতে হইলে যেমন কর্মে সহযোগিতা প্রয়োজন, তেমনই ছাত্রগণের মনকেও নানা উপায়ের দ্বারা পরীক্ষার ভয় হইতে মুক্ত রাখা প্রয়োজন। আবার শিক্ষকের

বিষয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মনও যেন যশোলিপ্সা অথবা চাকরি বজায় রাখিবার চেষ্টার দ্বারা আক্রান্ত না হয়। ছাত্র ও শিক্ষক, উভয়ের মন যদি ভয় এবং লোভের দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়, এবং উভয়ের মধ্যে যদি সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ বর্তমান থাকে, উভয়ে যদি কর্মে এবং অন্তরে নিরলস থাকিতে পারেন, তবেই দুইজনের সাহচর্যে বিজ্ঞানের যথার্থ উন্নতি সম্ভব।

আদর্শবাদের কথা

বিজ্ঞানের ব্যাপারে আদর্শবাদের কথা তোলা একেবারে যে অস্বাভাবিক, তাহা নয়। আমাদের সকলের মনেই কোনও না কোন সংস্কার বর্তমান; সকলের সংস্কার আবার সমান নয়। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই হউক অথবা উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যেই হউক, সেই সকল সংস্কার নিয়ত আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। আমাদের কর্মচেষ্টাকে শেষ পর্যন্ত যত্নের সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে মূলগত সংস্কারগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ গবেষণা শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক গবেষণায় পরিণত হয়। কেহ হয়ত মন্দিরের গঠন-প্রণালীর সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কিছুদিন পরে দেখা গেল তিনি গঠনপ্রণালীর বিশেষত্ব কি ছিল অথবা বর্তমান কালের উপযোগী করিয়া সেই প্রণালীকে ব্যবহার করা যায় কিনা তাহার অনুসন্ধান না করিয়া মন্দিরশিল্পের বিবর্তন কোন পথে হইয়াছিল, তাহার সন্ধানে লাগিয়া গেলেন। মন্দিরের ক্রমবিকাশের সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা যে দোষের, তাহা বলিতেছি না। কিন্তু প্রশ্ন হইল, এই জাতীয় সমস্যার প্রতি আমাদের দেশে এত অনুরাগ কেন দেখিতে পাওয়া যায়।

৺শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিকত্ব প্রমাণ করিবার জন্য প্রাণপাত করিয়াছিলেন। আজও আমরা তেমনই খাটিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করি, প্রাচীন ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচলিত ছিল, অথবা সেকালে শিল্পের যে সকল আদর্শ বর্তমান ছিল, তাহা কোনও অংশে আজকার ইউরোপীয় আদর্শ অপেক্ষা হীন নয়। আমাদের এরূপ প্রচেষ্টা কি নিছক জ্ঞানানুসন্ধানের প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত হয়? ইহা কি নিষ্কাম ধর্ম?

অনেক ঐতিহাসিক গবেষণার পিছনেই দেখিয়াছি লেখকের একটি বিশেষ মনোভাব, একটি বিশিষ্ট সংস্কার স্পষ্ট ফুটিয়া ওঠে। ভারতবর্ষ আজ পরের পদতলে অবনত হইয়া আছে। আমরা তাহার জন্য লজ্জিত। লজ্জা দূর করিবার সহজ উপায়, স্বাধীন হওয়া। উপায়টি সোজা হইলেও কাজটি সহজ নয়। বিশেষত যাঁহারা অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করেন, তাঁহাদের নিকট আরও দুরূহ। অথচ অতিরিক্ত মননশক্তিসম্পন্ন হওয়ার ফলে গবেষকেরা পরাধীনতার গ্লানি হয়ত প্রাকৃত জন অপেক্ষা অধিক মাত্রায় অনুভব করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ মনের গ্লানি মোচনের জন্য একটি সহজ উপায়ের আশ্রয় লন। যে ভারতকে আজ সকলে হীন মনে করিতেছে, তাঁহারা বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে, তাহা চিরকাল হীন ছিল না; এবং ইহার দ্বারা তাঁহারা নিজে অবশেষে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। 'তাঁহারা নিজে করেন' বলিতেছি, তাহার কারণ বহু বৎসরের কর্মচেষ্টার ফলে ঐতিহাসিকগণ যে তথ্য সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ জনগণের নিকট প্রায় কোন দিনই পৌছায় না। শক্ত ইংরেজী ভাষায়, হয়ত অপ্রচলিত কিন্তু নিতান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মূল্যবান বিদেশী পত্রিকার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ থাকিয়া তাহা গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করে। অতএব জাতীয় গৌরবের বৃদ্ধিতে যে লাভ হওয়া উচিত তাহা পণ্ডিতদের নিজের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ

থাকে, দেশের সাধারণ জনগণের হৃদয় মুহূর্তের জন্যও গর্বে বা আনন্দে ভরিয়া ওঠে না।

সেইজন্যই যে ঐতিহাসিক গবেষণা দোষের, ইহাও বলিতেছি না। আমার বক্তব্য হইল, বৈজ্ঞানিক অথবা অন্যবিধ গবেষণাকার্যের মধ্যেও যে আমাদের মনের সংস্কার প্রচ্ছন্নভাবে ফুটিয়া উঠে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অথচ আমরা সব সময়ে সে সম্বন্ধে সচেতনও নই। আমরা বিচার করিয়া দেখি না, আমাদের মূলগত সংস্কার ভাল না মন্দ, অথবা উহার পরিবর্তে আর কোনও মূলসূত্র ধরিয়া গবেষণা করা আমাদের উচিত কিনা। জ্ঞানের সন্ধানে আমরা নিতান্ত অজ্ঞানীর মত কার্জ করিয়া বসি।

অপরাপর দেশের বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার সহিত আমাদের দেশের কর্মচেষ্টার তুলনা করিলে উপরিলিখিত সংস্কারের দ্বারা যে আমাদের কি পরিমাণ ক্ষতি হইতেছে তাহা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকায় নিগ্রোজাতি হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের মত ব্যবহার পাইয়া থাকে। অনেকের বিশ্বাস যে নিগ্রোগণ বুদ্ধিবৃত্তিতে, চরিত্রে, মানসিক শ্রমশীলতায় শ্বেতাঙ্গজাতি অপেক্ষা নিকৃষ্ট। সেরূপ মতের সমর্থনে ছাপা বইয়ের অভাব নাই; কিন্তু যাঁহারা সমাজবিজ্ঞান লইয়া জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, নৃতত্ত্বের গবেষণায় যাঁহারা তাপসের মত বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অনুক্ষণ স্বীয় বুদ্ধিকে বিচারের তীব্র বহ্নিতে পরিশুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা বর্তমান কালের এই সমস্যার সম্বন্ধে নানা গবেষণার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আমেরিকার অধিবাসী নিগ্রোজাতি কোনও অংশে শ্বেতাঙ্গগণ অপেক্ষা হীন নয়, এবং যে দোষ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা জন্মগত না হইয়া, দারিদ্র্য এবং অশিক্ষার বশে জন্মিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্ত জোর গলায় সর্বজনসমক্ষে বলিতে তাঁহারা ভয় পান না, বরং বলিবার চেষ্টাই করিয়া থাকেন।

আফ্রিকার যে সকল জাতি ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাতে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে, তাহাদের মনুষ্যত্বকে কি করিয়া বাঁচান যায়, তাহাদিগকে আত্ম-নির্ভরশীল, শিক্ষিত, উন্নত ও সুখী, চরিত্রবান জাতিতে পরিণত করা যায়, সে বিষয়ে অনুসন্ধানকারী নৃতত্ত্ববিদের অভাব নাই। অথচ আমাদের দুর্ভাগা দেশে যেখানে লক্ষ লক্ষ লোককে আমরা অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছি, যেখানে হিন্দু এবং মুসলমান দিনের পর দিন পরস্পরের সাহচর্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবদমান সম্প্রদায়ে পরিণত হইতেছে, সেখানে কি এমন নৃতত্ত্ববিদ কেহ নাই যিনি মৌলিক গবেষণার দ্বারা সামাজিক ব্যাধি হইতে দেশকে মুক্তির পথ দেখাইতে পারেন? এমন অর্থনীতিবিদ কি কেহ নাই যিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙলায় কি ঘটিয়াছিল তাহার খোঁজ না করিয়া বর্তমান সমস্যার প্রতি মনোযোগ দান করেন? আমরা জাতির বর্তমান দুর্দিনে কি ইহাই আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব যে, প্রাচীন ভারতে আর্য এবং অনার্য মিলিয়া কেমন করিয়া বিরাট এক সংস্কৃতি রচনা করিয়াছিলেন, অথবা একের নাচ, গান এবং শিল্প কি ভাবে অন্যের সংস্পর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিল? শুধু এইটুকু জানিয়া এবং বুঝিয়া কি আমরা সুখী থাকিতে পারিব? আমাদের সত্যানুসন্ধানের দায়িত্ব কি এরূপ চেষ্টার দ্বারাই পরিতৃপ্ত হইবে?

ব্যক্তিগতভাবে আমার তাহা মনে হয় না। অবশ্য আমি নিজেও হয়ত জীবনের অধিকাংশ দিন একান্ত শুষ্ক তত্ত্বের সন্ধানে অতিবাহিত করিয়াছি। কিন্তু সর্বদা ইহা মনে হইয়াছে যে অপৌরুষেয় সত্যের সম্পর্কে আমাদের যেমন একটি কর্তব্য আছে—তাহাকে নিরলস ভাবে খুঁজিতে হয়, খুঁজিবার সময়ে নিজের মনের এবং শরীরের সকল আলস্য, সমস্ত সংস্কারের নাগপাশকে নির্মমভাবে ছিন্ন করিতে হয়, তেমনই আবার ইহাও অনুভব করিয়াছি যে, অপৌরুষেয় সত্যের মত রক্তমাংসে

গড়া মানুষের প্রতিও আমাদের অপর একটি দায়িত্ব রহিয়াছে। যাহারা আমাদের চারিদিকে বাঁচিয়া আছে, যে শিশুগুলি আজ সকালের আলোয় বিছানায় শুইয়া হাত-পা নাড়িয়া খেলিতেছে, তাহারা একদিন বড় হইয়া দেখিবে তাহাদের আত্মবিকাশের পথে দেশের পরাধীন অবস্থা, সমাজের পুঞ্জীভূত নানা দুর্নীতি ও প্রথা, তাহাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনকে পঙ্গু করিতে বসিয়াছে ; তাহাদের প্রতিও ত আমার একটি মহান্ কর্তব্য রহিয়াছে।

আমার চারিদিকের মানুষ আমার সাথী। আমরা পরস্পরের সহযোগিতায় জীবন ধারণ করি, পরস্পরের সাহচর্যে আনন্দ ভোগ করিয়া থাকি। তাহাদের সেবায় কি আমার শ্রেষ্ঠতম তপস্যাদ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে নিয়োগ করা যায় না? যদি না পারি, যদি মনের কোনও নিকৃষ্ট সংস্কারের বশে সহজে আত্মপ্রসাদ লাভের আশায় আমার সত্যানুসন্ধানকে, আমার গবেষণার ধারাকে, নিয়ন্ত্রিত হইতে দিই, তবে আমার সমাজের নিকট অন্ন গ্রহণ করিবার অধিকার আছে কিনা সন্দেহ, যে সম্মান বৈজ্ঞানিক বলিয়া সমাজ আমাদিগকে অযাচিতভাবে দিয়া থাকে তাহা ভোগ করিবার বিন্দুমাত্র অধিকার আমাদের আছে বলিয়া মনে হয় না।

সত্যের সন্ধান ভাল জিনিস। কিন্তু সে অনুসন্ধান কোনও নিকৃষ্ট সংস্কারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে ইহা বুঝিতে পারিলে তাহাকে আরও উত্তম কোনও সংস্কারের হাতেই ত সঁপিয়া দেওয়া উচিত। বিজ্ঞানের সাধনায়, বিজ্ঞান-শিক্ষকের বৃত্তির পিছনে যদি আমাদের কোনও বৃহৎ মন এবং বৃহত্তর প্রাণ না থাকে, তবে আমাদের চেষ্টা যতই পরিমাণবহুল হউক না কেন, তাহা শেষ পর্যন্ত একান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইবে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষকের যোগাভ্যাস

কিছুদিন পূর্বে বিহারের এক বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষকের সহিত আলাপ হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল, কিন্তু তাহা ছাড়া শাস্ত্রীয় কর্মকাণ্ডেও তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অনেকে শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি কাজে পণ্ডিত মহাশয়কে নিযুক্ত করিতেন সত্য, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাঁহার নিজের মনে এরূপ কর্মের সার্থকতা সম্বন্ধে কোনও অন্ধবিশ্বাস বা সংস্কার বর্তমান ছিল না। আমার সঙ্গে কথাবার্তায় পণ্ডিতজী একদিন বলিলেন যে, যৌবনকাল হইতে জাতীয় ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন বলিয়া তিনি পূজাপার্বণে যোগ দেন, কিন্তু এ সকলের দ্বারা সত্যই কোন ফললাভ হয় না। তাঁহার সহিত এইরূপ আলোচনা মাঝে মাঝে হইত। একদিন যোগশাস্ত্রের সম্বন্ধে কথা হইতেছিল। যোগাভ্যাসের ফলে, অথবা হয়ত একান্ত মানসিক একাগ্রতার দ্বারা, সাধক নানাবিধ বিভূতি লাভ করিয়া থাকেন বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। সাধকের শরীর কর্মপটু হয়, তত্ত্বের সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত হয়, এমন কি অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি নানাবিধ শক্তিও তিনি লাভ করিতে সমর্থ হন। সত্যই কি হয় না হয় জানি না, কিন্তু আমার ধারণা বর্তমানকালে যখন আমরা ধর্মানুসন্ধান অথবা যোগসাধনার পথে অগ্রসর হই, তাহার পশ্চাতে অনেক ক্ষেত্রে অন্য কারণ থাকে।

আমাদের চারিদিকে জীবনের যে প্রবাহ চলিয়াছে তাহার মধ্যে আমরা যেন খড়কুটার মত ভাসিয়া চলিতেছি। যে সমাজে বাস করি তাহার মান্যকে (values) আমরা অনেক সময়ে মানি না। অথচ অনশনের ভয়ে সেই সমাজের অঙ্গীভূত হইয়া থাকিতে হয়। জগতের বিরাট রাষ্ট্রশক্তির কাছে, মানুষের সম্মিলিত স্বার্থস্রোতের সম্মুখে আমাদের

অন্তরের অন্যবিধ মান্য যেন তৃণের মত ভাসিয়া যায়। এই বেদনার ভার ব্যক্তির নিকট যতই পীড়াদায়ক হয়, নিজেকে সে যত বেশী অসহায় মনে করে, ততই তাহার মন কোনও স্থিরভূমির সন্ধানে ছুটিয়া বেড়ায়। নয়ত সে বাঁচিবে কেমন করিয়া? কেহ নিজের স্ত্রী-পুত্রের পরিচর্যায় একান্তভাবে নিজেকে ঢালিয়া দেয়, কেহ যোগাভ্যাস করে, কেহ বা সমাজবিপ্লবের দ্বারা জগতকে বিশুদ্ধ করিতে চায়। এগুলি যে অন্যায় কার্য তাহা বলিতেছি না, তবে ঐ সকল বিষয়ে আমাদের অনুরাগ বহু-ক্ষেত্রে বাস্তবজীবনে আচরিত দৈনন্দিন কর্মের প্রতি বিরাগ হইতেই উদ্ভূত হয়, ইহা বলাই আমার উদ্দেশ্য। ইহার দ্বারা নিত্যকার কর্ম কুশলতার সহিত সম্পন্ন হয় না। উপরন্তু দেশসেবাই হউক, রাষ্ট্রবিপ্লবই হউক, তাহার মধ্যেও আমরা একান্তভাবে নিযুক্ত হইতে পারি না। যে সকল কর্মী অপর সকল বন্ধন কাটাইয়া ঐ পথে একান্তভাবে নামিয়াছেন তাহাদের বিষয় আলোচনা করিতেছি না, পরন্তু যাঁহারা আচরণে এক বস্তু মান্য করেন, চিন্তায় অপর বস্তু মান্য করিয়া স্বীয় ব্যক্তিত্বকে একটুখানি বাঁচাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি। ম্যালিনোস্কি নামক জনৈক বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিদের একটি লেখায় পড়িয়াছিলাম, নৃতত্ত্ববিশারদগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজের সমাজের কোনও তত্ত্বানুসন্ধান না করিয়া আফ্রিকার কোনও অজ্ঞাত জাতির অথবা অষ্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীগণের সম্বন্ধে যে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা সব সময়ে বিজ্ঞানবুদ্ধির বশে নহে। নিজের সমাজকে বুঝিয়া তাহা পরিবর্তনের যথাযথ দায়িত্ব লইতে রাজি নয় বলিয়াই আমরা অপরের সমাজের সম্বন্ধে অনেক সময়ে এত মাথা ঘামাইয়া থাকি। ঐতিহাসিক গবেষণা বা সুদূরের অনুসন্ধানে, আপাতত সাক্ষাৎ দায়িত্বের হাত হইতে ত সহজ সদ্য মুক্তি পাওয়া যায়।

ইহা যে শুধু নৃতত্ত্বের সাধকগণের সম্বন্ধেই সত্য তাহা নহে, বিভিন্ন শ্রেণীর বহু মানুষের বেলাতেই ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

বিহারের পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে এই মর্মেই আলোচনা হইতেছিল। অবশেষে তিনি স্বীয় বক্তব্য যাহা প্রকাশ করিলেন তাহার সারমর্ম নিম্নে দিতেছি। তিনি বলিলেন, যোগের দ্বারা, একাগ্রতার দ্বারা সত্যই নানাবিধ শক্তি লাভ করা যায়। আমরা ইস্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতা করাই যদি আমরা একান্ত মনে সম্পাদন করি তবে তাহাতেই আমাদের যোগের ফললাভ হয়। যে কাজ আমি করিতেছি, তাহাকে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে সম্পন্ন করা কি সহজ ব্যাপার? নিজের শরীরকে সুস্থ ও কর্মঠ রাখিতে হইবে। ছাত্রের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত রাখিয়া তাহার কোথায় অসুবিধা হইতেছে বুঝিতে হইবে। কোন্ যুক্তির আশ্রয় লইলে শিক্ষণীয় বিষয়টি তাহার ধারণার আয়ত্ত হয় তাহা চিন্তা করিতে হইবে। এসব কি সহজ কাজ? ইহার জন্য নিজের বৃত্তির প্রতি কত অনুরাগ, কতখানি পরিশ্রম এবং সহিষ্ণুতার প্রয়োজন! নিজের আমিত্বকে, নানাবিধ সংস্কারকে, চেষ্টার দ্বারা ক্রমশ ক্ষীণ করিলে তবেই আমরা শিক্ষাকার্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি।

পণ্ডিতজীর কথা শুনিয়া প্রথমে একটু আশ্চর্য লাগিয়াছিল। কিন্তু স্বীয় বৃত্তির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া পরে শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। পণ্ডিতজীর দুইজন ছাত্রের নিকট শুনিয়াছি যে, অমন শিক্ষক সারা জীবনে তাহারা পায় নাই। আশ্চর্য নয়। শিক্ষকতাকে যোগসাধনের মত অভ্যাস করিলে অণিমা লঘিমা প্রভৃতি লাভ হয় কিনা জানি না, কিন্তু শিক্ষকের ধর্ম যে যথাযথভাবে প্রতিপালিত হয়, সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। তদুপরি নিষ্ঠাপূর্ণ সাধনার দ্বারা শিক্ষকের অন্তর যে উত্তরোত্তর নির্মল হয়, তাঁহার তত্ত্বদৃষ্টি উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, এবিষয়েও সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

সাহিত্যিক ও তাঁহার সামাজিক কর্তব্য

সাহিত্যসাধনার দুটি দিক আছে। যে শিল্পীর মধ্যে সৃজনীপ্রতিভার তেজ অধিক, তিনি সমাজের দাবিকে উপেক্ষা করিয়া. এমন কি প্রয়োজন হইলে স্বীয় শরীরসুখের প্রয়োজনের বিরুদ্ধতা করিয়াও আত্ম-কেন্দ্রিক হইয়া রসসৃজনের সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। রেশমের গুটিপোকা যখন নিজের চারিদিকে তন্তুরচনা করে, তখন বাহির জগৎ হইতে সে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়; বাহির জগৎ হইতে তাহার যাহা কিছু আহরণীয় সে আত্মমগ্ন হইবার পূর্বেই সংগ্রহ করিয়া লয়।

যে সকল সাহিত্যিক রসসৃষ্টির উচ্চতম ও কঠিনতম লোকে আরোহণ করিবার সাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁহাদের স্বাধীনতা এবং সামাজিক আশু-দায়িত্ব হইতে মুক্তির অধিকার, ত্যাগ এবং তপস্যার দ্বারা অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু সকল সাহিত্যিক, হয়ত বা অধিকাংশ সাহিত্যিকই, এই পর্যায়ে পড়েন না। ব্যাসদেব একাধারে বেদান্তসূত্র রচনা করিয়া-ছিলেন, আবার জনশিক্ষার জন্য মহাভারত রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু আজিকার দিনে মানুষের এমন শক্তি কম হয়। কেহ প্রধানত ঊর্ধ্বলোকের সাধনা করে, কেহ বা জনসমূহের মধ্যে সেই রস পরিবেশনের ভার গ্রহণ করে।

সাহিত্যরসের আরও একটি বিবেচনার দিক আছে। আমাদের মত সভ্য সমাজ এবং কোল জুয়াঙ শবর প্রভৃতি যে সকল জাতির মধ্যে লিখিত ভাষা নাই, তাহাদের উভয়ের রসসৃষ্টির মধ্যে একটি বৃহৎ ব্যবধান আছে। কোল প্রভৃতি অনক্ষর জাতির ভাষায় ত কিছু লিখিয়া রাখিবার উপায় নাই। কাগজের ব্যবহার নাই, অতএব

চিত্রও শুধু ঘরের দেওয়ালে, কখনও বা পাহাড়ের গায়ে আঁকিয়া বা খোদাই করিয়া রক্ষা করিতে হয়, অতএব তাহার পরিমাণ কখনও বেশি হইতে পারে না। গৃহপ্রাচীরে চিত্রাদি ঘরের মেয়েরাই আঁকে, সমাজে চলতি গান সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করে। অর্থাৎ অনক্ষর জাতির সমাজে শিল্পে বা রসসৃজনে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা কম। তাহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাই, সমাজের সর্বজনই নৃত্য গীত বা চিত্রবিদ্যায় অধিকারী হয়। এরূপ সমাজে শিল্প হয়ত উর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ করিতে পারে না, কিন্তু তাহার ব্যাপ্তিগুণ বেশি হয়। সভ্যসমাজে শিল্পী শিল্প রচনা করেন, অপরে সেই রস পরোক্ষভাবে উপভোগ করেন; অপর পক্ষে অনক্ষর সমাজে প্রত্যক্ষভাবে প্রতি জন সেই রস উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। প্রভেদ কতকটা অপরের ফুটবল খেলা দেখিয়া মনের ভিতর আনন্দ উপলব্ধি করা, এবং নিজে খেলিয়া সেই অনুভব সঞ্চয় করার মধ্যে যাহা তাহাই।

লোকশিল্পের প্রচলন যে আমাদের সমাজে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়াছে তাহা নয়। ছড়া, গান, আলপনা, গৃহের সাজসজ্জা, দেহের শোভা ও অলঙ্কার বিন্যাস প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া আমাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপ্ত রসবোধ সঞ্চারিত হয়; কিন্তু অনক্ষর জাতির তুলনায় আমাদের মধ্যে পরোক্ষ রসগ্রহণের প্রাচুর্ভাবই বেশি।

আজ ভারতবর্ষ পরাধীনতার শৃঙ্খলপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। জনসমূহ যে অভিশপ্ত জীবন যাপন করিতেছিল, তাহা অপসারিত হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। আজ সাহিত্যিক বা শিল্পীগণের মধ্যে এক নূতন কর্তব্যের উদয় হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত প্রতিভাশালী শিল্পীগণের পূজা করেন, এবং পূজার উপচারস্বরূপ

সেই শিল্পীর অক্ষম অনুকরণ করিয়া থাকেন, অর্থাৎ নিজের অনুভূতির উপরে নির্ভর কম করেন। ফলে তাঁহাদের মধ্যে মানুষের প্রতি প্রেম, মাটির মানুষের সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ সংকুচিত হইয়া যায়। তাঁহারা পররসবিলাসী হইয়া পড়েন; রসের জগৎ কদাচিৎ তাঁহাদের অনুভবের ভিত্তিতে রচিত শিল্পের দ্বারা সমৃদ্ধিবান হয়।

মহাকবি কালিদাসের উৎসবের দিনে, আষাঢ়ের প্রথম দিবসে, আমরা তাঁহাকে স্মরণ করিয়া এই প্রার্থনা করিব, 'হে কবি, তুমি আমাদিগকে সত্য পথে পরিচালিত কর, সত্যকে আশ্রয় করিবার সাহস আমরা যেন সংগ্রহ করিতে পারি। আমাদের রসবোধ যাহাতে প্রত্যক্ষের উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়, অনুভূতির রসসিঞ্চনের দ্বারা যেন তাহা পুষ্টি-লাভ করে। যাঁহারা ঊর্ধ্বলোকের উপাসক, তাঁহারা মাটির ভুবনের সঙ্গে স্বল্পতম যোগ রক্ষা করিয়া ঊর্ধ্বের অভিমুখে স্বীয় গতিকে পরি-চালিত করুন; তাঁহারা শালবৃক্ষের ন্যায়। কিন্তু আমরা যাহারা ক্ষুদ্র, যাহাদের ঊর্ধ্বগতির শক্তি কম, তাহারা যেন অন্তত নিম্নভূমিতে ছায়াবিস্তার করিয়া পথশ্রান্ত মানবকুলকে শান্তিদান করিতে পারি। আমাদের সংস্পর্শে জনসমূহের মধ্যে সৃজনীপ্রতিভা যেন বিকাশ-লাভ করে, পরোক্ষ অপেক্ষা প্রত্যক্ষ রসাস্বাদন যেন সকলের ক্ষেত্রে সমধিক সম্ভব হয়।

'হে কবি, তুমি আশীর্বাদ কর যেন এইরূপে আমরা অনুভব এবং প্রেমের ভিত্তিতে সার্থক শিল্পরচনায় সক্ষম হই।'

[বর্ধমান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে ১লা আষাঢ় ১৩৫৫ সালে দেওয়া বক্তৃতার সারাংশ]

সমাজ

মানুষের আচার ও সমাজ

ওড়িশা প্রদেশের যে অংশ পর্বতবহুল তাহার মধ্যে কন্ধমাল নামে একটি পরগণা আছে। কন্ধমাল অঞ্চলে কন্ধ, শবর প্রভৃতি অশিক্ষিত জাতির বাস। কিছুকাল পূর্বে আমার জনৈক বন্ধু কন্ধমালের জঙ্গলে কাঠের কারবার করিতে গিয়াছিলেন। তখন বড় বড় শালগাছ কাটিয়া বাহিরে চালান দেওয়া হইতেছিল। সেজন্য বহু কুলী একত্র হইয়াছিল এবং তাহারা পাতার ছোট ছোট ঘর নির্মাণ করিয়া সেইখানে বসবাস করিতেছিল। একদিন দুপুরে জঙ্গলে কাজকর্ম চলিতেছে এমন সময়ে হঠাৎ একদিক হইতে খুব সোরগোল শোনা গেল। যাহারা দূরে ছিল তাহারা হাতের কাজ ফেলিয়া সেইদিকে ছুটিয়া চলিল। ক্রমে দেখা গেল যে একটি বেশ বড় বানর গাছের মধ্যে লুকাইয়া ছিল, তাহাকে পাইয়া বন্য কাঠুরিয়ারা তীরধনুক দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে।

মরা বানরটিকে লইয়া সকলে খুব উল্লাস আরম্ভ করিল। কয়েকজন তখনই ছুটিয়া শুকনা পাতা, ডাল প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আগুন ধরাইল। অবশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রথমে মৃত বানরটির বুক চিরিয়া একটি পাতার ঠোঙায় হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করিয়া প্রায় এক বাটি তাজা রক্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিল। তাহার পর বানরের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া সকলে আগুনের চারিদিকে ঘিরিয়া বসিল। প্রত্যেকে নিজের তীরের ডগায় এক টুকরা মাংস গাঁথিয়া তাহা আগুনে খানিক ঝলসাইয়া লইল এবং তাহার পর রক্তের পাত্রে ডুবাইয়া সেই অবস্থাতেই ভক্ষণ করিতে লাগিল।

কিন্তু কন্ধমালের লোকেরা যে শুধু এইভাবে মাংসাহার করে তাহা নয়। আমাদের মধ্যে অনেকে হয়ত মাংস এইভাবে রাঁধিয়া খাইতে আপত্তি করিবেন। নুন নাই, লঙ্কা নাই, সুস্বাদু লাগিবার কথা নয়। কিন্তু যতই ক্ষুধা পা'ক না কেন, আমার বোধ হয় কেহই বানরের মাংস খাইতে রাজি হইবেন না; বিশেষ করিয়া যেভাবে কাঠুরিয়ারা খাইয়াছিল, সেভাবে ত একেবারেই নয়। শাস্ত্রে আছে, প্রাণধারণের নিমিত্ত যে কোনও খাদ্য আহার করা চলে, কিন্তু শুধু রসনার তৃপ্তির জন্য হত্যা করিলে তাহা দোষের হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত অথবা মৃগয়ালব্ধ মাংস আহার করিলেই কেবল দোষ হয় না।

এখন প্রশ্ন হইল, এক এক জাতির মধ্যে খাদ্যের সম্বন্ধে এরূপ বিশেষ বিশেষ বিধান কোথা হইতে জন্মায়? কে এগুলি সৃষ্টি করে? ওড়িশার জঙ্গলে কন্ধেরাও থাকে, শবরেরাও থাকে, হিন্দু চাষী, কলু, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি জাতিও থাকে; তবে পানাহার সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে এত ভেদাভেদ কেন?

যে স্থানে কন্ধগণ বাস করে তাহা মহানদীর নিকটে। তাহার প্রায় সত্তর আশী মাইল উত্তরে জুয়াঙ্গ নামে এক জাতির বাস আছে। জুয়াঙ্গ দেশেও হিন্দুদের বসবাস আছে এবং তাহাদের অনুকরণে জুয়াঙ্গগণ জাতীয় দেবদেবীর সহিত লক্ষ্মী ঠাকরুণের পূজা করিয়া থাকে। পূজার ব্যবস্থা কিন্তু বিচিত্র। তাহা আদৌ আমাদের মত নয়। পূজার দিনক্ষণ কিছু নাই, কেন না জুয়াঙ্গদের পাঁজিপুঁথির বালাই নাই। যেদিন পূজা করিবার ইচ্ছা হয় সেদিন সকালে স্নান করিয়া কিছু আলোচাল, ধুনা, প্রদীপ ও দুইটি কাল রঙের মোরগ সংগ্রহ করা হয়। তাহার পর পূজার সময়ে মাটিতে চারটি চাল ছড়াইয়া যে পূজা করে সে সোজাসুজি ভাষায় বলে, হে লক্ষ্মীদেবী, তুমি এই চাল নাও,

হে সূর্য, তুমি এই চাল নাও, হে আমাদের বৃদ্ধ প্রপিতামহ, তোমরাও এই অন্ন গ্রহণ কর। এই বলিয়া সে একটি টাঙ্গির উপরে আমরা যেমনভাবে বঁটিতে মাছের মুড়া কাটি সেইভাবে মোরগ দুইটার গলা কাটিয়া ফেলে।

কোন কোন জাতি ওড়িশার জুয়াঙ্গদের মত চাল ও মোরগ বলি দিয়া পূজা করে, কেহ বা শূয়ার বলি দেয়, কেহ শুধু ফলমূলের অর্ঘ্য দান করিয়া থাকে। হিন্দুরা কিন্তু লক্ষ্মীর পূজায় বলি দিবার কথা ভাবিতেই পারে না। যে সকল দেবীর পূজায় বলি দেওয়া হইয়া থাকে, সেখানেও তাহারা শূয়ার বা মোরগ বলি দিতে কখনও রাজি হইবে না।

এখন প্রশ্ন হইল, একই দেশে থাকিয়া বিভিন্ন জাতি পানাহার এবং দেবার্চনায় এত প্রভেদ মানিয়া চলে কেন? যে জঙ্গলে ইহারা বসবাস করে সেখানে প্রকৃতিদেবী মানুষের জীবনধারণের জন্য শাকসব্জি, ফলমূলও দিয়াছেন, আবার হরিণ শূয়ার মহিষ বানরও দিয়াছেন। কিন্তু একই পরিবেশের মধ্যে থাকিয়া কেহ বানরের মাংস খাইতে নারাজ হয়, কেহ বা পরমানন্দে তাহা ভোজন করে। কেহ দেবার্চনায় ফলমূলের অর্ঘ্য দেয়, কেহ বা মদ্য মাংস দিতে কুণ্ঠিত হয় না। কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, মানুষের আচার অনুষ্ঠান তাহার প্রাকৃতিক পারিবেশের বশে গড়িয়া ওঠে। হয়ত পূর্বে তাহা সত্য ছিল। কিন্তু মানুষ পূর্বের পরিবেশ ছাড়িয়া যখন নূতন দেশে ঘরসংসার পাতে তখনও ত প্রাচীন অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। ইংরেজদের দেশে আঁটসাঁট পোষাক পরা হয়ত ভাল, কেননা সেখানে শীত বেশি। কিন্তু ভারতবর্ষের মত দেশে আসিয়াও যখন তাহারা বিলাতী পোষাক পরিয়া গলদ্‌ঘর্ম হইতে থাকে তখন কি করিয়া বলা যায় যে, মানুষ শুধু প্রকৃতির

প্রয়োজন অনুসারে নিজের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করে? বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন জাতির খাওয়া পরা গৃহনির্মাণপদ্ধতি প্রভৃতি যে শুধু প্রকৃতি-প্রদত্ত সুবিধা অসুবিধার উপর নির্ভর করে তাহা নয়। মানুষ তাহার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন জিনিস বাছিয়া লয়; এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতি নিজেদের বাছাই করা বস্তু ব্যবহারের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহা হইতে মানুষের সামাজিক আচার অনুষ্ঠানের উদ্ভব হয়।

মানুষে মানুষে প্রভেদ যে শুধু খাওয়াপরা ও গৃহনির্মাণপদ্ধতিতেই আবদ্ধ আছে তাহা নহে। মানুষ এমন একটি জীব যে একা থাকিতে পারে না, সমাজ না হইলে তাহার চলে না। বহুকাল পূর্বে মানুষ অসভ্য ছিল, চাষবাস জানিত না, পশুপালন করিতে শেখে নাই। তখন সে গৃহেও বাস করিত না। পাহাড় পর্বতের মধ্যে স্বাভাবিক গুহা পাইলে সেইখানে আশ্রয় গ্রহণ করিত। বনের পশু শিকার করিয়া খাইত: তখনকার বনের অধিবাসীরা হয়ত আজকালকার মানুষ অপেক্ষা বেশি কষ্টসহিষ্ণু ছিল, শিকারের পিছনে শীতবৃষ্টির মধ্যে দিনের পর দিন ঘুরিতে তাহারা হয়ত ক্লান্তি বোধ করিত না। কিন্তু তাহার গায়ে বন্য পশুর সমান বলও ছিল না, সে তত দ্রুতবেগে দৌড়াইতেও পারিত না। নিজেদের বুদ্ধির জোরে এবং পরস্পরের সমবায়ের দ্বারা তাহারা দ্রুতগামী হরিণ, ভীষণ ব্যাঘ্র ও অতিকায় হস্তীকে হত্যা করিয়া উদরপূরণ করিত অথবা প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। খাদ্যান্বেষণে এইরূপ সমবায়ের দ্বারা ক্রমে ক্রমে মানবসমাজের উৎপত্তি হইল। যে কাজ একলা করিতে পারা যায় না, দশজনে মিলিয়া তাহা সহজেই সাধিত হয়। দশজনে বনের মধ্যে একা একা সারাদিনে শিকার করিয়া যাহা সংগ্রহ করিতে পারে, একজোটে কাজ করিলে তাহা অপেক্ষা বেশি সংগ্রহ হয়। ইহাই হইল মানবসমাজের স্থিতির মূল কারণ। প্রত্যেককে যদি নিজের মত

চাষ করিয়া অন্নসংস্থান করিতে হইত, নিজের কাপড় জামা অস্ত্রশস্ত্র সবই প্রকৃতিপ্রদত্ত মূল ধাতু হইতে নির্মাণ করিতে হইত, অপরের কোনও সাহায্য পাওয়া না যাইত, তাহা হইলে আজ সংসারে যত লোক বাস করে, পৃথিবীতে তাহার অর্ধেকও থাকিত না।

কিন্তু পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, শুধু অন্নসংস্থানের জন্যই কি সমাজ? তাহার কি আর কোনও উদ্দেশ্য নাই? সে কথা ঠিক। মানুষের জীবনধারণের জন্য অন্নের যেমন দরকার, অন্য বিষয়েরও তেমনই প্রয়োজন আছে। প্রাচীন ভারতে বাৎস্যায়ন মুনি নিজে আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন, কিন্তু তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে ধর্ম, অর্থ ও কাম, ইহার কোনোটিকেই বাদ দিয়া চলিতে পারা যায় না। মানুষ অর্থসেবায় অনেক বুদ্ধি খরচ করে, কিন্তু কামধর্মের সম্বন্ধে তাহার সম্যক্ জ্ঞান না থাকার দরুণ সে বহুবিধ মানসিক কষ্টভোগ করিয়া থাকে। সেইজন্য লোকহিতার্থে বাৎস্যায়ন মুনি জগতের শ্রেষ্ঠ কামশাস্ত্র লিখিয়া গিয়াছিলেন।

বস্তুত মানবসমাজের বিধিনিষেধের অর্ধেক যেমন ধনোৎপাদনের জন্য রচিত হইয়াছে, তেমনই অপরার্ধ কামনার ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। যদি সমাজে এ বিষয়ে কোনও নিয়ম না থাকিত, তাহা হইলে মানুষে মানুষে কলহবিবাদের অন্ত থাকিত না। দুর্বল সবলের নিকট পরাস্ত হইয়া হয়ত কখনও সুখে সংসার পাতিতে পারিত না। এখনও যে সেরূপ হয় না তাহা নয়। অথবা সকলেই যে কামনার বিষয়ে সুখে মনস্তাপবিরহিত অবস্থায় রহিয়াছে তাহাও নহে। কিন্তু সকলেই ইহা জানে যে, ধনোৎপাদনের বিষয়ে যেমন পরস্পরের সহযোগিতা প্রয়োজন, তেমনই কামনার ক্ষেত্রেও যদি সহযোগিতা না থাকে, যদি আমরা

শুধু বাসনা এবং বাহুবলের পরিমাণের উপরে নির্ভর করি, তাহা হইলে সংসারে একত্র বাস করা নিতান্ত কঠিন হইয়া উঠে।

অতএব মানুষের আহার এবং বিবাহের নিয়ম ও তজ্জন্য পরস্পরের সাহচর্যের ব্যবস্থা লইয়া সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। জুয়াঙ্গ, শবর অথবা কন্ধদের সমাজের পক্ষেও ইহা যেমন সত্য, আমাদের সমাজ অথবা ইউরোপের সভ্য ও শক্তিশালী অধিবাসিগণের সমাজের পক্ষেও ইহা তেমনই সত্য। যদি এই সহজ কথাটা আমরা বুঝিয়া চলি, তাহা হইলে আচারব্যবহারের প্রভেদের জন্য আমরা কাহাকেও ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিতে পারিব না, মানুষে মানুষে পার্থক্যের ভাব অনেকাংশে কমিয়া আসিবে।

বাংলাদেশে শীতকালে আমরা বালাপোষ গায়ে দিই, গরম জামা পরি। অথচ গ্রীষ্মকালে সেগুলি পরি না বলিয়া কখন ত আমাদের মনে হয় না যে, এরূপ পরিবর্তনশীলতা অন্যায়। আমরা এ-কথা বলি না যে, একই জাতের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরিধান করা অন্যায় কাজ। কেন না আমরা জানি অবস্থার পরিবর্তন হইলে ব্যবস্থারও পরিবর্তন করিতে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মানুষের সমাজের বেলায় আমরা এই কথাটি বারংবার ভুলিয়া যাই। অবস্থা বিপর্যয়ের সহিত সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হইলেই আমরা ঘোর রবে তাহাতে আপত্তি করি।

পূর্বে ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম প্রচলিত ছিল। তখন প্রত্যেক জাতি নিজের কৌলিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বসবাস করিত। সুখের ইতরবিশেষ হইলে প্রজাগণ রাজাকে দায়ী করিতে পারিতেন। সেইজন্য শাসকসম্প্রদায় ক্ষত্রিয় জাতিকে প্রজাগণ অতিরিক্ত সামাজিক অধিকার দিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রাচীন ভারতে রাজা আইন প্রণয়ন করিতেন না। ব্রাহ্মণগণ যে আইনের বিধান দিতেন রাজা নিজের শক্তি

নিয়োগ করিয়া তাহা প্রয়োগ করিতেন। সেইজন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা অপরাপর জাতি অপেক্ষা বেশি ছিল, সমাজের স্থিতি ও বৃদ্ধি অনেকাংশে ইঁহাদের উপর নির্ভর করিত। অথচ আজ ইউরোপীয় ধনতন্ত্রের সংঘাতে বর্ণব্যবস্থার পিছনে যে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ছিল, তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইতে চলিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আর ক্ষমতা নাই যে তাহারা দেশের প্রজাগণের সুখ-সুবিধার বিধান করে। সেইজন্য প্রজাগণ আর উচ্চবর্ণকে অত্যধিক মর্যাদা দিতে রাজি নয়। শূদ্রগণ মাথা তুলিয়া উচ্চবর্ণের সমশ্রেণী হইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই, দুঃখেরও কিছু নাই। এক অবস্থা গিয়া অন্য অবস্থা আসিয়াছে, সমাজের মধ্যে মর্যাদা বা সুযোগ বণ্টনেরও ইতরবিশেষ ঘটিতেছে। অথচ প্রাচীনপন্থীরা দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, একি অধঃপতন হইল! ব্রাহ্মণের সম্মান নাই, বর্ণাশ্রম রসাতলে গেল!

কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই যে, প্রাচীন পন্থায়ও আমাদের কম পরিবর্তন ভোগ করিতে হয় নাই। ভারতবর্ষের আর্য অধিবাসিগণের মধ্যে এক সময়ে নিয়োগধর্মের দ্বারা স্ত্রীলোকগণের সন্তানোৎপাদনে কেহ আশ্চর্য হইত না। আবার সেই দেশেই সময়কালে বিধবা স্ত্রীর বিবাহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়া গেল। এমন কি যে স্ত্রী স্বামীর সহগমন করিতেন, তাঁহার স্মৃতি সমাজে শ্রদ্ধার সহিত পূজিত হইতে লাগিল।

বস্তুত এ কথাটি আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, সমাজ সদাই পরিবর্তনশীল। গীতায় আছে, মানুষের আত্মা অজর ও অমর। তাহা স্বীয় কর্মানুসারে বারংবার ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে; কিন্তু জড় ও জীব, মানব ও দেবযোনির মধ্যে সেই এক অমর আত্মাই অবলীলাক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। কথাটি পাঞ্চভূতিক দেহের বিষয়েই সত্য নয়, সমাজের বিভিন্ন রূপের সম্বন্ধেও তেমনই সত্য।

মানুষ সুখান্বেষী। শুধু সে শরীরের ও মনের সুখ অন্বেষণ করে না, পরন্তু সে প্রেমধর্মও পালন করিয়া থাকে। প্রেমের জন্য মানুষ নিজের ব্যক্তিগত সুখ পরিহার করিয়া সংসারের বহুজনের সুখের জন্য স্বার্থের আহুতি দেয়। এই সকল ব্যক্তির সম্মিলিত কর্মফলে মানবসমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু মানুষ প্রকৃতির পরিবেশের মধ্যে বাস করে। খাদ্যের সংস্থান কমিয়া যায়, মানুষের বংশ বিস্তার হয়। সমাজে একের পর একটি করিয়া নূতন নূতন অন্নোৎপাদনের এবং ধনবণ্টনের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। এমন পরিবর্তনশীল অবস্থার মধ্যে মানুষের সমাজও অপরিবর্তনীয় থাকিতে পারে না। সেইজন্য সমাজের রূপ নদীর রূপের মত পরিবর্তনশীল। আজ গঙ্গানদী যে আকারে দেখা যাইতেছে, তাহার যে বেগ, তাহার পাড়ের যে পরিস্থিতি, কাল আর তাহা নাই। জলের বেগে হয়ত পাড় ভাঙিয়া গিয়াছে, কোথাও নূতন চড়া পড়িয়াছে, জলের স্রোত এক দিক হইতে অপর দিকে সরিয়া যাইতেছে। অথচ যে গঙ্গা সেই গঙ্গাই রহিয়াছে, বৎসরের পর বৎসর আমরা ফুলফল দিয়া তাহার পূজা করিতেছি।

মানবসমাজের রূপকেও তেমনইভাবে কল্পনা করিতে হইবে। শবর জুয়াঙ্গ কন্ধ, গণ্ড মুণ্ডা, অন্ধ্র দ্রাবিড়, আর্য অনার্য সকলের সমাজকে এক একটি স্রোতস্বিনী নদীর মত কল্পনা করিতে হইবে। তাহার মধ্যে কেহ ক্ষীণকায়, কেহ বা জলবহুল, কেহ পার্বত্য স্রোতস্বিনীর মত উচ্ছল তরঙ্গে উপত্যকা হইতে উপত্যকায়, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে ; কেহ বা মৃদুমন্দ গতিতে অতল কৃষ্ণজলরাশি লইয়া বহিয়া চলিয়াছে, তাহাদের পরিবর্তনের ধারা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। কখনও বা দুই অথবা ততোধিক স্রোত সম্মিলিত হইয়া এক ধারার সৃজন করিয়াছে ; কখনও বা তাহাদের সংঘাতে তুমুল ঘূর্ণাবর্তের সৃজন হইতেছে।

নদীর রূপ যেমনই হউক না কেন, তাহা যেমন পার্শ্ববর্তী ভূমিকে সিক্ত করিয়া ফলে ফুলে ভরিয়া দেয়, মানবসমাজের বিধানও তেমনই সর্বভাবে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। যেখানে একা মানুষ বাঁচিতে পারে না, সেখানে সমাজ তাহাকে বরাভয় দান করে। স্বীয় চেষ্টায় মানুষ জীবনে যাহা লাভ করিতে পারে, সমাজের আশ্রয়ে সে তদপেক্ষা সমধিক ঋদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

নৃতত্ত্বের পরিচয়

মানবজাতির মধ্যে যাহারা আমাদের মত নয় তাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আফ্রিকার জঙ্গলে নরখাদক কাফ্রীদের জীবনযাত্রার গল্প পড়িতাম; মেরুপ্রদেশে এস্কিমোরা কেমনভাবে বরফের বাড়ীতে বাস করে তাহার ছবি দেখিয়া পুলকিত হইতাম। অজানা বিষয় জানিবার আগ্রহ হওয়া মানুষের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক; সেই আগ্রহ চরিতার্থ করার জন্যই সংসারে অসংখ্য বই ও গল্প লেখা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষ একটি মহাদেশ। এখানকার বনে জঙ্গলে, আফ্রিকার মত অত বেশি না হইলেও অশিক্ষিত বন্য জাতির অভাব নাই। তেমনই একটি জাতির বিষয়ে গল্প বলিয়া আপনাদের নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দিব। বাংলা দেশের পশ্চিমে ছোটনাগপুর প্রদেশের অনেক অংশ জঙ্গলে ভরা। সেই সব জঙ্গলে বাঘ ভালুক হইতে আরম্ভ করিয়া বুনো হাতী, এমন কি বুনো মহিষ পর্যন্ত বাস করে। ছোটনাগপুর পার্বত্য প্রদেশ এবং তাহার ছোট বড় পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীনালারও অভাব নাই। বনের মধ্যে নদীর ধারে, যেখানে গ্রাম বসানর সুবিধা আছে, সেখানে দুই চারি ঘর চাষী বাস করে। ইহারা কোল, উরাঁও, হো প্রভৃতি জাতীয় লোক। ইহাদের ছাড়া গভীর জঙ্গলের মধ্যে এমন কতকগুলি জাতি বাস করে, যাহারা চাষের বদলে প্রধানত শিকার করিয়া খায়। ছোটনাগপুরে এমনই একটী জাতির নাম বিরহড়। বিরহড়েরা সংখ্যায় খুব বেশি নয়। তাহাদের চেহারা কোল ভীল সাঁওতালদেরই মত। বিরহড়ের

প্রধানত রাঁচি, হাজারিবাগ এবং সিংভূম জেলায় বাস করে। কিন্তু স্বভাবত যাযাবর বলিয়া তাহাদের কোনও স্থায়ী গ্রাম বা বস্তি নাই।

একদিন সিংভূম জেলায় জঙ্গলের মধ্যে একটি খনি দেখিতে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে যাইবার সময়ে সে পথে বিশেষ কিছু দেখা যায় নাই, কিন্তু সন্ধ্যার পর ফিরিবার বেলায় সেখানে পথের কাছে বনের ভিতর ডালপালায় তৈরি অনেকগুলি ঘর দেখা গেল। কাছে যাইতেই বিরহড়েদের কুকুরের দল তারস্বরে চীৎকার করিয়া আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিল। বিরহড়েরাও জাগিয়া উঠিয়া ব্যাপার কি দেখিবার জন্য কুঁড়ের ভিতর হইতে বাহির হইল। আমাদের মধ্যে একজন বন্ধু কোলভাষা বলিতে পারিতেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, উহারা আজই এইখানে বাসা বাঁধিয়াছে এবং দুপুর হইতে বিকালের মধ্যে ডালপালা দিয়া কুড়ি পঁচিশখানি কুটির নির্মাণ করিয়া ফেলিয়াছে। পূর্বে তাহারা অন্য এক বনে থাকিত, কিন্তু সেখানকার জমিদার খাজনা দাবি করায় উহারা সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া নূতন বনে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

বিরহড়েরা বনে শিকার করিয়া খায়। এক গ্রামের সমস্ত লোক সম্মিলিত হইয়া তীর ধনুক, লাঠি শোটা এবং দড়ির জাল লইয়া বনের খরগোস, সজারু, বানর প্রভৃতি নানাবিধ পশু শিকার করিয়া থাকে। অন্যদিকে মেয়েরা বন হইতে বহুবিধ ফল মূল কন্দ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া আনে। এই সকল ফল মূল সবই সুস্বাদু নয়। অনেকগুলিকে জলে বার বার সিদ্ধ করিয়া কষ ফেলিয়া দিয়া তবে চলনসই খাদ্যে পরিণত করিতে হয়। বিরহড়েরা শিকার ভিন্ন আরও একটি কাজ করে। ছোটনাগপুরের জঙ্গলে চোপ বা মহুলান নামে এক রকম লতা জন্মায়। জঙ্গলের দেশে চাষীদের মধ্যে মহুলানের দড়ির খুবই আদর। বিরহড়েরা মহুলানের দড়ি বানাইয়া কোল অথবা অন্যান্য হিন্দু চাষীর কাছে বিক্রয়

করে, এবং সেই পয়সায় নিজেদের প্রয়োজনীয় কাপড়, নুন, তামাক, লোহা প্রভৃতি দ্রব্য কাছাকাছি কোনও গ্রামের হাটে খরিদ করিয়া লয়।

বিরহড়গণ বড় দরিদ্র। সিংভূম জেলার প্রচণ্ড শীতের মধ্যে সামান্য কাপড়ে তাদের কিছু হয় না। অবশ্য বিরহড়েরা আমাদের চেয়ে শীত বেশি সহ্য করিতে পারে বটে, তবুও অত্যল্প কাপড়ে তাহাদের যথেষ্ট কষ্ট হয়। আমরা যে সময়ে প্রথম বিরহড় গ্রাম দেখি তখন শীতকাল। আমার বন্ধু একজন বৃদ্ধ বিরহড়কে শীতে কষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিল, "সেঙ্গেল দে আইঙা লিঙ্গা," অর্থাৎ আগুনই আমাদের পোষাক, ঐ ত আমাদের কাপড়।

বস্তুত ভারতবর্ষের জঙ্গলের মধ্যে বিরহড়, জুয়াঙ্গ, শবর, গণ্ড, কন্ধ প্রভৃতি যেসকল জাতি বাস করে, তাহারা সকলেই অত্যন্ত দরিদ্র এবং দুঃখকষ্টের ভারে প্রপীড়িত। জীবনধারণের জন্য আমাদের যেসকল কৌশল জানা আছে তাহার অধিকাংশ তাহাদের জানা নাই। আমাদের যে অর্থবল আছে বা লোকবল আছে, যা'র সহায়তায় আমরা বহুবিধ কঠিন কাজ সম্পন্ন করিতে পারি, কোলভীলেদের তাহাও নাই। কিন্তু তবু এই সকল বন্য জাতির জীবনযাত্রার উপায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা নানাবিধ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। অসীম দারিদ্র্যের মধ্যেও মানুষ কেমন করিয়া জীবনযাপন করে, কি ভাবে গৃহনির্ম্মাণ করে, কেমন করিয়া বন্য পশুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করে, কি খায়, কি পরে, কেমন যন্ত্র দিয়া চাষবাস করে এসব আমরা জানিতে পারি। এগুলি নৃতত্ত্বের বিষয়ীভূত। কিন্তু মানুষ ত শুধু খাওয়া-পরা লইয়াই বাঁচিয়া থাকে না। সকল দেশে মানুষের সমাজ আছে, আইনকানুন আছে, ধর্ম আছে, আনন্দরস সিঞ্চনের জন্য শিল্প, কলা, সঙ্গীত ও নৃত্যও কিছু কিছু আছে, তা সে জাতি যতই দরিদ্র এবং যতই দুর্দশাগ্রস্ত হউক না কেন।

বিরহড় বা কোল মুণ্ডাদের মধ্যেও সমাজ আছে, বিবাহের এবং বিবাহ বিচ্ছেদের নানারকম ব্যবস্থা আছে, নাচ আছে, গান আছে, সন্ধ্যায় একত্র বসিয়া পরস্পরের মধ্যে জাতির পুরাতন কাহিনী বলিবার প্রথা আছে, অথবা পরস্পরকে নানাবিধ ধাঁধা জিজ্ঞাসা করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি পরি-চালনা করার অভ্যাস আছে এই সকল জাতি যাহাদের আমরা সচরাচর অসভ্য বা বর্বর বলিয়া থাকি, যাহারা দুঃখের সহিত আমাদের জানায় যে আগুনই তাহাদের পরনের কাপড়, তাহাদের মধ্যে কি পরিমাণ কবিত্বরস থাকিতে পারে, তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হয়। দুঃখকষ্টে এবং দারিদ্র্যেও যে-মানবাত্মা পরাজয় স্বীকার করে না, বরং কাব্যরসের দ্বারা মনকে সিক্ত করিয়া সেই দারিদ্র্যকে আংশিকভাবে পরাহত করিতে পারে, তাহার প্রতি ভক্তিতে আমাদের মাথা স্বভাবত নত হইয়া যায়।

এমনি দুই একটি কবিতার নমুনা আপনাদের শুনাইতেছি। ছোটনাগপুরের অশিক্ষিত মুণ্ডাদের গান। ভারতবর্ষের বিখ্যাত নৃতত্ত্ব-বিদ ৺শরচ্চন্দ্র রায় মহাশয় এগুলি সংগ্রহ করিয়া প্রায় ২৪ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। গত বৎসর কয়েকটি গান ফাল্গুন মাসের প্রবাসীতে বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছিল।

পাঠক-পাঠিকা প্রথম গানটি মূল মুণ্ডা ভাষায় পড়িয়া তারপর অনুবাদ পাঠ করিবেন। তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন মুণ্ডা কবিতাটি যেন মাদলের শব্দের অনুকরণে সৃষ্টি হইয়াছে। নাচের সময়ে মুণ্ডারা মাদল বাজায়, এ যেন ঠিক তাহারই সঙ্গে তাল রাখিয়া গানটি চলিতে থাকে। একজন মুণ্ডা যুবক তাহার প্রণয়িনীকে বলিতেছে—

কুচা মুচা মুন্দুরু
কুচা কোটোং তাদিজা কুন্দুরুম্
কুচা কোটোং তাদিজা নাইরি।

নারিন নারিন পলাণ্ডুম নারিন
কোটোং তাদিঙ্গা নাইরি
জীবরে সুকুজনরে দো দোলাং সেনোআ
কুন্দুরু,—দো দোলাং সেনোআ নাইরি।
কুরম্বারে রেরাজীগরে
মারে দোলাং বিরিদা, পলাণ্ডু
মারে দোলাং বিরিদা, নাইরি।

কুন্দুরু লতা যেমন বৃক্ষকে জড়িয়ে রাখে, তুমিও তেমনি তোমা(প্রেম) ডোরে আমাকে বেঁধে রেখেছ; পলাণ্ডুলতা যেমন বৃক্ষকে আলিঙ্গন ক'রে ধ'রে রাখে, তুমিও তেমনি আমার হৃদয়কে জড়িয়ে রেখেছ। যখন হৃদয় (এমন) আনন্দে উথল হয়ে উঠছে, হে আমা কুন্দুরু লতিকে, চল আমরা একত্র জীবন পথে পাড়ি দিই। প্রাণ যখ প্রেমানন্দে ভ'রে গেছে চল, পলাণ্ডুলতিকে, চল আমরা একত্র জীব পথের পথিক হই।

আর একটি গান শুনুন। এটিও প্রেমের কবিতা, তবে কিছু বিশেষ আছে। একজন পুরুষ বলিতেছে—

ছিটে বেড়ার ঘর থেকে, সখি, ছিটে বেড়ার ঘর থেকে;
তুমি ফুলের মত দীপ্তিতে বেরিয়ে আসতে, সখি,
ময়ূরপুচ্ছের মত শোভাতে আসতে।
তখন (প্রস্ফুটিত) পুষ্পের মত শোভায় তুমি আসতে সখি,
কিন্তু আজ (ঝরা) ফুলের মত শুখিয়ে গেছ।
তখন তুমি ময়ূরপুচ্ছের মত দীপ্তিতে শোভা পেতে, সখি,
কিন্তু এখন শুষ্ক ময়ূরপুচ্ছের মত মলিন হ'য়ে গেছ।

তোমার ছিটে বেড়ার ঘর কি এতই উত্তপ্ত হয়েছে সখি,
যে তোমার সে সৌন্দর্য শুষ্ক পুষ্পের মত নিষ্প্রভ করে দিয়েছে ?
মলিন ময়ূরপুচ্ছের মত নিষ্প্রভ করে দিয়েছে ?

তখন নারী উত্তর দিতেছে—

মাটির উত্তাপেও এমন হয় নি, সখা, সূর্যের উত্তাপেও হয়নি
সময় চলে গেছে, সখা, তাই এমন হয়েছে।
যৌবন ফুরিয়ে গেছে, তাই এমন হয়েছে।

এই সকল গান থেকে আমরা বন্য জাতির অন্তর্জীবনের সম্বন্ধে কিছু কিছু সন্ধান পাই। কিন্তু আপনাদের কাছে নৃতত্ত্বের এই দিকটার সম্বন্ধে বিশেষভাবে শোনাইবার জন্য আজ আমি আসি নাই। নৃতত্ত্বের মধ্যে শুধু অদ্ভুতরসের সন্ধানেই আমরা যাই না। অথবা বনজঙ্গলের জাতি-বৃন্দের জীবনকে আদর্শ কাব্যময় জীবন বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, এই সকল বন্য জাতি যাহাদের প্রথমে আমাদের অদ্ভুত বলিয়া মনে হয় এবং পরে যাহাদের সরলতা দেখিয়া আমরা হয়ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠি, তারাও ঠিক আমাদেরই মত মানুষ, এবং তাহাদের নিকটে আমরা যেমন কাব্যরসের নূতন আস্বাদন পাই তাহাদের সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার ব্যবহার হইতেও হয়ত আমাদের অনেক কিছু শিখিবার থাকিতে পারে।

নৃতত্ত্বের এইখানেই সব চেয়ে বড় দান। আমরা সকলে ছেলেবেলা হইতে যে-সকল সংস্কারে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছি, বড় হইয়া সেগুলিকে সব চেয়ে স্বাভাবিক এবং সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া থাকি। নৃতত্ত্বের সব চেয়ে বড় দান হইল এইখানে যে, নানা জাতির, নানা সমাজের, নানা সভ্যতার তুলনা করিয়া উহা আমাদিগকে দেখায়—সংসারে স্বাভাবিক বলিয়া কিছু নাই, মানুষই সবের কর্তা। মানুষই

এক জায়গায় বহুবিবাহের প্রথা সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য জায়গায় ব্রহ্মচর্যকে ভাল বলিয়াছে। মানুষই এক জায়গায় বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করিয়াছে, অন্য জায়গায় গণতন্ত্র প্রবর্তন করিয়াছে। এই সকল বিভিন্ন দেশীয় সমাজের তুলনা করিলে ক্রমে ক্রমে আমাদের নিজেদের জাতীয় সংস্কার সম্বন্ধে মনের মধ্যে যে সব মোহ লুকাইয়া থাকে সেগুলি শিথিল হইয়া যায় এবং আমরা নিজেদের আইনকানুন ও সামাজিক প্রথাকেও তখন খানিকটা দূর হইতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখিতে পারি। যাহারা বিলাতে গিয়াছেন তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া বলেন যে, বিদেশে না গেলে স্বদেশকে চেনা যায় না। কথাটা ভারী সত্য। তেমনিভাবে নৃতত্ত্ববিদও বলিতে পারেন, পরকে না চিনিলে নিজেকে চেনা যায় না। পরের সম্বন্ধে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে তবে নিজের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ দৃষ্টির উদয় হয়। এই কথাটাই নৃতত্ত্ববিদ্যা আমাদিগকে সবচেয়ে বেশি করিয়া শেখায়, শুধু অদ্ভুতরস অথবা কাব্যরসের পরিবেশন করাই তাহার কার্য নয়। মানুষের মনকে সংস্কারমুক্ত করা, নিজের সমাজকে নিরপেক্ষ-ভাবে দেখিতে শেখানই তাহার সবচেয়ে বড় কাজ।

এইবার আপনাদের বিভিন্ন ধরণের সমাজের সম্বন্ধে দু'একটি গল্প বলিব। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত পুরীতে বেড়াইতে গিয়াছেন। সেখানে সমুদ্রের ধারে নুলিয়ারা মাছ ধরে তাহাও বোধ হয় দেখিয়াছেন। সর্বদা খোলা সমুদ্রের ধারে জীবনযাপন করিয়া এবং সমুদ্রের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম করিয়া নুলিয়াদের স্বাস্থ্য খুব ভাল হয় এবং দেহ খুব বলিষ্ঠ ও নিটোল হইয়া থাকে। এই নুলিয়াগণ জাতিতে ওড়িয়া নয়। তাহারা তেলুগু ভাষায় কথা বলে এবং অনেক দিন পূর্বে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ মাদ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম, গোদাবরী প্রভৃতি জেলা হইতে পুরীতে বাস করিতে আসিয়াছিল। নুলিয়ারা ধর্মে হিন্দু বটে, কিন্তু

তাহাদের কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই। নুলিয়াদের মধ্যে যাহারা ধর্মভাবাপন্ন তাহাদের উপর বিশেষ বিশেষ দেবতার ভর লাগে। যখন একজন মানুষের উপর দেবতার ভর হয়, তখন সে ব্যক্তি সেই দেবতাকে পূজা করিবার অধিকারী হয়। সে আবার গুরু হয় এবং তাহার শিষ্যও দুই একজন হইতে পারে। শিষ্যগণের মধ্যেও ভর লাগে এবং তখন তাহারাও দেবার্চনায় গুরুর মতন অধিকারী হয়। নুলিয়াগণের গ্রামের শাসনকার্য খানিকটা নির্বাচনের উপরে নির্ভর করে। পুরীর নুলিয়াপাড়ায় দুই একটি বংশ আছে যাহারা বহুদিন যাবৎ গ্রামের শাসনকার্য চালাইয়া আসিতেছে। কিন্তু শাসনের ভার যদিও একটি বংশবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তবু তাহারা যথেচ্ছাচার করিতে ভরসা পায় না। কে বাস্তবিকপক্ষে গ্রামের অগ্রণী হইবে সেটা জনসাধারণের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। নির্বাচিত ব্যক্তি যদি ঠিকমত কাজ না করে তাহা হইলে জনসাধারণ তাহাকে তাড়াইয়া ঐ বংশ হইতে আর একজনকে নির্বাচন করিতে পারে। গ্রামের প্রধানের নাম উরপেডা। তেলুগু ভাষায় উর মানে গ্রাম এবং পেডা মানে প্রধান। উরপেডা মানে গ্রামের প্রধান।

নুলিয়াগণের সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, বিবাহ উৎসবে উরপেডা এবং গ্রামদেবতার পূজারীগণের কতকগুলি নির্দিষ্ট কর্ম আছে। নুলিয়া জাতির মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা আমাদের চেয়ে বেশি। বাঙালীর মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতা একরকম নাই বলিলেই চলে, কিন্তু নুলিয়াদের মধ্যে তাহা খুব আছে। তাহার প্রধান কারণ, নুলিয়া পুরুষগণের মত মেয়েরাও যথেষ্ট রোজগার করে। নুলিয়া মেয়েরা রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করিয়া, মাটি বা বালি কাটিয়া দৈনিক চার পাঁচ আনা রোজগার করে। বস্তুত নুলিয়া পুরুষগণ মাছ ধরিয়া অথবা সমুদ্রে স্নানার্থী তীর্থযাত্রীকে সাহায্য করিয়া

যে পয়সা কামায় তাহার অধিকাংশ মদ্যপানে ব্যয়িত হয়। কিন্তু মেয়েদের রোজগারের উপর পরিবারের অন্নসংস্থান নির্ভর করে। সেই জন্য নুলিয়া সমাজে মেয়েদের স্থান মোটেই হীন নয়। তাহাদের যথেষ্ট সম্মান আছে এবং সেই জন্যই নুলিয়া বিবাহের মধ্যে ভারি একটি সুন্দর প্রথা দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

নুলিয়া সমাজে বাংলা দেশের মত পিতামাতা পুত্রকন্যার সম্বন্ধ ঠিক করেন বটে, কিন্তু বিবাহের কথা পাকাপাকি হইবার আগে পাত্রীর নিকট অনুমতি গ্রহণের একটি প্রথা আছে। এমন কি পাত্রী যদি অস্বীকৃতা হয় তাহা হইলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দেওয়ার অধিকার পিতামাতার নাই। যদি পিতামাতা জোর করিয়া বিবাহ দেনও, তাহা হইলে গ্রামের পঞ্চায়ৎ পাত্রীর পক্ষ গ্রহণ করিয়া অবশেষে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইতেও পারে। এই রকম একটি ঘটনা কয়েক বৎসর পূর্বে পুরীতে ঘটিয়াছিল, আপনাদের বলি।

পুরীর নুলিয়াপাড়ায় পলাম্মা নামে একটি মেয়ে থাকিত। পলাম্মা দেখিতে সুন্দরী এবং তা'র পিতাও ধনী। কিন্তু মেয়েটি একজন দরিদ্র ছেলেকে বিবাহের সঙ্কল্প করিল। অবশ্য শুধু ইহাতেই আপত্তি করার কিছু ছিল না, কিন্তু বিপদ হইল যে, সে ছেলেটির পূর্বেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল এবং স্ত্রীও বর্তমান ছিল। ছেলেটি কোন দিনই পলাম্মাকে উৎসাহিত করে নাই, কিন্তু পলাম্মা ধরিয়া বসিল যে, সে রামাইয়া ভিন্ন অপর কাহাকেও বিবাহ করিবে না। পলাম্মার পিতা গোলমাল নিবারণ করার জন্য জোর করিয়া এক পাত্রের সহিত মেয়ের বিবাহ দিলেন। কিন্তু বছরের পর বছর কাটিয়া গেল, নানাবিধ তন্ত্রমন্ত্র করা হইল, এমন কি শারীরিক নির্যাতনও বাদ যায় নাই, তবু তিনি কিছুতেই মেয়েকে শশুরবাড়ী সংসার করিতে পাঠাইতে পারিলেন না। অবশেষে পঞ্চায়তের

আদেশে পলাম্মার পিতাকে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে হইল এবং পাত্রের দেওয়া বিবাহের যৌতুক প্রভৃতি সবই প্রত্যর্পণ করিতে হইল। নুলিয়া সমাজে বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে যৌতুক দেন—এ বিষয়ে আমাদের প্রথা ঠিক উলটা।

পুরীতে যখন নুলিয়া সমাজে এই রকম গোলযোগ চলিতেছে তখন রামাইয়ার শ্বশুর হঠাৎ নিজের মেয়েকে স্বগ্রামে লইয়া আসা স্থির করিলেন। তিনি পুরী হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে বাস করিতেন। কয়েকদিন পরে জামাই যখন মেয়েকে লইতে আসিল, তিনি মেয়েকে পাঠাইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল পলাম্মার ব্যাপারে রামাইয়ারই দোষ বেশি ছিল। তিনি স্বীয় গ্রামের পঞ্চায়ৎ ডাকাইলেন। পঞ্চায়তের সম্মুখে স্ত্রীর আকুল ক্রন্দন সত্ত্বেও এবং নিজের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে কেবল দশজনের অনুরোধে অবশেষে রামাইয়াকে বিবাহবিচ্ছেদে মত দিতে হইল। বিবাহ ভঙ্গ হইয়া গেল এবং বিবাহের যাবতীয় যৌতুক ও উপহার রামাইয়াকে তাহার শ্বশুর ফিরাইয়া দিলেন। রামাইয়া কিন্তু সেগুলি গ্রহণ না করিয়া স্ত্রীকে সমস্ত প্রত্যর্পণ করিল। হৃদয়ই যখন ভাঙিয়া গিয়াছে সেখানে সামান্য দানসামগ্রী প্রতিগ্রহণ করিতে তাহার আর মন সরিল না।৮

এদিকে তাহার স্ত্রীও বাপের বাড়ীতে অবিশ্রাম কান্নাকাটি করিতে লাগিল, তাহাকে আর কিছুতে থামান যায় না। অবশেষে কয়েকদিন পরে মেয়েটি হঠাৎ কেমন শান্তশিষ্ট হইয়া গেল। গ্রামের অপরাপর মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করিল। কিছুদিন যায়, একদিন সে মায়ের কাছে পাশের গ্রামে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। মেয়ের মন ভাল আছে দেখিয়া মা আনন্দের সঙ্গে অনুমতি দিলেন। কিন্তু মেয়েটি সেই যে পথে বাহির হইল, তাহার পর আর বাড়ী ফিরিল না।

সে স্বামীর এক বন্ধুর সঙ্গে এক কাপড়ে পুরীতে স্বামীগৃহে পলাইয়া গেল, আর বাপের বাড়ী ফিরিয়া যায় নাই। স্বীয় স্বামীর প্রতি পলাম্মার প্রেমের কথা সে জানিত; কিন্তু সে বলিত, "স্বামী যদি ওকে বিবাহ করিতে চা'ন করুন, কিন্তু আমি নিজের বাড়ী ছাড়িয়া যাইব কেন?"

এদিকে পলাম্মা পুরীর নুলিয়া সমাজে আরও গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অবশেষে বাস্তবিকই একদিন সে রামাইয়ার বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইল যে, যদি রামাইয়ার সঙ্গে তা'র বিবাহ না দেওয়া হয় তাহা হইলে সে তাহাদের বাড়ীর দুয়ারে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে। গ্রামের লোকে বিচলিত হইয়া রামাইয়ার পিতাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। পালাম্মার পিতার খুবই আপত্তি ছিল, এমন কি তিনি একবার গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অপমান করিয়া তাড়াইয়াও দিয়াছিলেন। তিনি ধনী, উপরন্তু মানে রামাইয়াদের বংশ অপেক্ষা বড়। তা' ছাড়া মেয়ের জন্য সমাজে তাঁহার উঁচু মাথা অনেকখানি নীচু হইয়া গিয়াছিল। তবু শেষে তাঁহারও আপত্তি টিঁকিল না এবং রামাইয়ার সঙ্গে পলাম্মার বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। শুনিয়াছি রামাইয়ার দুই স্ত্রী নাকি এখন বেশ সুখেই একত্র সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছে।

আপনাদের কাছে শুধু গল্প বলার উদ্দেশ্যেই আমি গল্পটি বলি নাই। আপনাদের মধ্যে অনেকে হয়ত বলিবেন, এ আবার কি রকম সমাজ —যেখানে মেয়েদের এরকম স্বেচ্ছাচার বরদাস্ত করা হয়? কেহ হয়ত বলিবেন, এরকম সমাজে কি কোনও নীতি আছে, না ধর্ম আছে? কিন্তু আমি আপনাদের এই জায়গায় বলিতে চাই যে, নীতিই বলুন, ধর্মই বলুন, আর আচার ব্যবহারই বলুন, এক সমাজে একরকম, অন্য সমাজে অন্যরকম হইয়া থাকে। এমন কি, একই সমাজে যুগের পর যুগ

রীতিনীতি আচারব্যবহার সবেরই আমূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রত্যেক সমাজের মানুষই ভাবে যে, আমাদের নীতি ভাল, আমাদের সমাজই বড় এবং আমাদের ধর্ম ও সমাজ ভগবান স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া অনাদি কাল হইতে একই ভাবে চালাইয়া আসিতেছেন। কিন্তু যখন আমরা লুসিয়াদের সমাজের কথা ভাবি তখন দেখি যে, তাহারা সমাজের যেসকল নিয়মকানুন পালন করে সেগুলি মানুষের কিসে সুখ বাড়িবে ও দুঃখ কিসে কমিবে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তৈরি হইয়াছে। উহাদের সমাজে স্ত্রীলোকদের অর্থবিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা রহিয়াছে বলিয়া বিবাহব্যাপারেও তাহারা অনেকখানি স্বাধীনতা উপভোগ করিয়া থাকে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, খানিকটা পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া ও খানিকটা মানুষের সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লুসিয়া-সমাজ গঠিত হইয়াছে। আমরা অনুমান করিতে পারি যে, লুসিয়া সমাজে যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে তাহা হইলে সমাজের আইনকানুনের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটিতে বাধ্য।

আমাদের দেশেও তাহাই হয়। আমাদের দেশে যখন মানুষ পারি-পার্শ্বিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং সুখদুঃখের বিষয় সম্যকরূপে চিন্তা করিয়া সমাজের বিধান সৃজন করে, তখন সেইটিই চলে। কিন্তু কোন বিধানই অনন্তকাল ধরিয়া একইভাবে চলিতে পারে না।

একবার হিমালয় পর্বতে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, সেখানকার একটি ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। হিমালয় প্রদেশে নদনদী প্রচণ্ড বেগে বহিয়া থাকে। সেখানে বাংলা দেশের মত প্রশস্ত নদী নাই, থাকিতেও পারে না। নদী উচ্চ প্রদেশ হইতে তীরবেগে নীচের দিকে নামিয়া যায়, সমতল জলরাশির কল্পনা করাও কঠিন। এই সকল পার্বত্য

নদীর ধারে পাহাড়িয়ারা কাঠের একরকম চাকা বাঁধিয়া রাখে। জলের তোড়ে চাকা ঘুরিতে থাকে এবং চাকার সঙ্গে পাথরের যাঁতা বাঁধিয়া তাহারা গম, ভুট্টা প্রভৃতি শস্য পেষণ করিয়া লয়।

হিমালয় প্রদেশে চম্বা রাজ্যে একদিন সকাল বেলা এমনই একটি যাঁতা দেখিতে পাইয়া আমি যাঁতাওয়ালার সঙ্গে নানাবিধ গল্প জুড়িয়া দিলাম। যাঁতার মাপ লইতেছি এবং তাহার নানারকম ছবি তুলিতেছি দেখিয়া লোকটি প্রথমে ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, তোমাদের দেশে কি নদী আছে? আমি "আছে" বলায় সে বলিল, তাহলে আমাকে সেখানে নিয়ে চল, আমি এইরকম যাঁতা তোমাদের দেশে বসিয়ে দিয়ে আসবো। আমি বলিলাম, কিন্তু আমাদের নদী ত এরকম নয়। তাহাতে এত তোড় নাই এবং তা'র উপর দিয়ে বড় বড় নৌকা চলে, জাহাজ চলে—তাতে তোমাদের গ্রামশুদ্ধ সব্বাইকে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। তাহার পর আমাদের দেশের নদীর সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম এ বেচারী পাহাড়িয়া দেশে ছাড়া নদী দেখে নাই, নদী অন্য রকম যে কি করিয়া হইতে পারে, সে ধারণাই সে করিতে পারে না।

সামাজিক ব্যাপারে আমাদেরও অবস্থা এই রকম, আমাদের দৃষ্টি এই পাহাড়ের অধিবাসীটির মতই সঙ্কুচিত। সমাজ যে মানুষেই সৃজন করিয়াছে আমরা তাহা ভুলিয়া যাই এবং সমাজ যে নদীর মত ক্ষেত্রবিশেষে, অর্থাৎ দেশ, কাল ও পাত্র অনুযায়ী, বিভিন্ন রূপ ধারণ করে, ঐ অশিক্ষিত পাহাড়িয়ার মত, সভ্যতাভিমানী হইয়াও আমরা বার বার সে কথা ভুলিয়া যাই। সেই জন্য আমাদের দেশে অবস্থা যখন

বদলাইয়া যায় তখন যে সমাজের গঠনকেও বদলাইতে হইবে, সেকথা আমরা স্বীকার করি না; শুধু মোহের বশবর্তী হইয়া সর্ববিধ পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকি। এই সংকীর্ণতার ফলে দুঃখের বোঝা সংসারে বাড়িয়া যায় এবং পাহাড়ী নদীকে জোর করিয়া বাঁধিয়া রাখিলে সে যেমন একদিন ঘোররবে মহাপ্লাবনে সব কিছু পুরাতন ভাঙিয়া লইয়া যায়, আমাদেরও দশা সেই রকম হইয়া থাকে।

সমাজকে অপরিবর্তনীয় ভাবা একটা মহৎ ভ্রান্তি। মানুষকে সব দেশে সব অবস্থার মধ্যে দেখিলে সেই ভ্রান্তি আমাদের কাটিতে পারে। নৃতত্ত্বের সবচেয়ে বড় দান হইল এইখানে যে, সে নানা দেশের সংবাদ আনিয়া আমাদের ছেলেবেলাকার সংস্কারের মোহ হইতে মনকে মুক্ত করিয়া দেয়, আত্মপ্রসাদের দোষ কাটাইয়া সমগ্র মানবজাতিকে আমাদের পরমাত্মীয় বলিয়া ভাবিতে শেখায়।

জুয়াঙ্গ জাতি

ওড়িশা প্রদেশটিকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। সমুদ্রের কূলে যে সমতল অংশটি আছে তাহাকে স্থানীয় লোকেরা মোগলবন্দী বলিয়া থাকে এবং তাহার পশ্চিমে যে গভীর অরণ্যময় পার্বত্য প্রদেশ আছে তাহাকে গড়জাত বলে। ওড়িশা প্রদেশ মোটের উপর পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম হইতে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। ওড়িশায় নদীর সংখ্যা বহু। কলিকাতা হইতে পুরী যাইতে হইলে কত যে বড় বড় নদী পড়ে তাহার ঠিকানা নাই। সুবর্ণরেখা, ব্রাহ্মণী, বৈতরণী, মহানদী প্রভৃতি তাহাদের মধ্যে প্রধান। তাহা ছাড়া শাখা-প্রশাখা যেগুলি আছে, তাহাদের সংখ্যা দশ বারটির কম হইবে না। এই সকল নদী গড়জাতের পার্বত্য অংশ ভেদ করিয়া আসিয়াছে। পাহাড়ের মধ্যে যেখান দিয়া নদী বহিয়া যায়, সেখানকার দৃশ্য অতি রমণীয়। কোথাও বা গভীর খাদ, দুই পাশে ঘন বনে ঢাকা পাহাড়, বায়ুচলাচলের অভাবে সমস্ত স্থানটি একরকম ভিজা গরমে ভর্তি হইয়া আছে; আবার কোথাও বা নদী বেশ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে, মাঝে বালুর চরে চকা-চকী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে অথবা কুমীর শুষ্ক কৃষ্ণবর্ণ কাঠের মত পড়িয়া আছে, অথবা হাঁ করিয়া রোদ পোহাইতেছে। দুই পাশে ঘন শালের বন, ঈষদুন্নত জমির উপরে যেন সবুজের ঢেউ খেলিয়া গিয়াছে। এমন দৃশ্য ওড়িশার গড়জাতে বহু স্থানে দেখা যায়।

মোগলবন্দীতে যেসকল ওড়িয়া ভাষাভাষী চাষীরা বাস করে তাহারা বহুদিন হইতে গড়জাতের নদীর ধারে নিজেরা বসতি বিস্তার করিতেছে। পাড়ের জমি উর্বরা, অল্প চেষ্টায় সেখানে ভাল ফসল হয়

বলিয়া তাহারা নদীর কূল ছাড়িয়া দূরে যাইতে চায় না। সেখানেই গ্রাম বাঁধে, ক্রমে মন্দির নির্মাণ করে, রাজা হয়, গড় হয়, আর স্থানীয় লোকেরা নদীর কূল ছাড়িয়া ক্রমশ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিয়া যায়। বহুদিন ধরিয়া এমনি একটা সম্বন্ধ ওড়িয়াদের সহিত জঙ্গলের শবর, কোল প্রভৃতি জাতির চলিয়া আসিতেছে। তাহারা জঙ্গলে শিকার করিয়া খায়, অল্প স্বল্প চাষ করে, তাহাও তেমন ভাল নয়। চাষীদের প্লাবনে যখন নদীর তীরে টেঁকা কঠিন হয় তখন জঙ্গলীরা বনের মধ্যে সরিয়া পড়ে।

চাষীরা ইহাদের ঘৃণা করে, ছোঁয় না, অথচ যখন কাজের দরকার হয় তখন ইহাদের সাহায্য লইতেও ছাড়ে না। জুয়াঙ্গ ইহাদেরই মধ্যে একটি জাতি। আমি যখন প্রথম জুয়াঙ্গদের মধ্যে যাই তখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল, আপনার কি কুলির দরকার? আমি যে তাহাদের ভাষা শিখিতে আসিয়াছি, তাহাদের সঙ্গে মিশিতে আসিয়াছি এ-কথা তাহারা আদৌ বিশ্বাস করিল না। ক্রমে আলাপ-সালাপের পর যখন তাহাদের মধ্যে বসিয়া গান-বাজনা শুনিতেছি তখন পার্শ্ববর্তী গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ জনমজুরের খোঁজে একদিন সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে ত ভাষা-শেখার কথা শুনিয়া হাসিয়াই ফেলিল। বলিল, বাবু ওদের তো ভাষা নাই। বাঁদরেরা যেমন কুঁইকাঁই করে, ওদেরও সেই রকম ঠার আছে। ভাবিলাম, হায় রে, সুখে দুঃখে পাশাপাশি থাকিয়াও মানুষে এমন করিয়া মানুষের সহিত ব্যবধান সৃজন করিয়া রাখে, তাহাকে মানুষ বলিয়া ভাবিতে পর্যন্ত পারে না, ইহার চেয়ে দুঃখের কথা আর কিছু হইতে পারে না।

জুয়াঙ্গেরা ওড়িয়া বোঝে, বলিতে পারে। তবে সে ওড়িয়া কটক-পুরীর ওড়িয়ার মত শুদ্ধ নয়, প্রথমে উচ্চারণের পার্থক্যের

জন্য একটু বুঝিতে কষ্ট হয়, ক্রমে কানে সহিয়া যায়। নিজেদের মধ্যে কিন্তু তাহারা আপন ভাষা বলে। সেই ভাষা কতকটা কোল, কতকটা খাড়িয়া ভাষার মত। তাহা শিখিবার জন্য একবার আয়োজন করিয়া পাল-লহড়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

পাল-লহড়া রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে অর্দ্ধচন্দ্রাকার রূপ ধারণ করিয়া একটি পর্বতশ্রেণী আছে। তাহার নাম মাল্যগিরি। যেন মালার মত রাজ্যের এক প্রান্ত বেড়িয়া আছে বলিয়া তাহার এই নাম। ঘন বনে মাল্যগিরির পাদদেশ আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে ছোট নদী-নালা তাহা ভেদ করিয়া গিয়াছে। বাঘ ভালুকের ত কথাই নাই, হাতী, বন্য মহিষ প্রভৃতি জন্তুরও এখানে অভাব নাই। তাহাদের পায়ের চাপে শবরদের ধানক্ষেতগুলি মথিত হইয়া যায়, অতি কষ্টে ফসলের তিন ভাগের একভাগ বাঁচাইতে পারিলেই চাষীরা যথেষ্ট পাইয়াছি বলিয়া মনে করে। একদিন রাত্রে তাঁবুতে শুইয়া আছি, এক শত গজ দূরে নদীর ধারে হঠাৎ খুব টিন বাজিতে লাগিল। পরের দিন শুনিলাম, রাত্রে আখের ক্ষেতে হাতী আসিয়াছিল, তাহাকে তাড়ানোর চেষ্টায় চাষীরা অত চেঁচামেচি করিয়াছিল। এমন প্রায়ই হইত।

বনের মধ্যে সারাদিন কাজের পর যখন বেড়াইতে যাইতাম তখন হয়ত বা হঠাৎ কোনও ভারী খুরবিশিষ্ট জন্তুর পায়ের আওয়াজ পাইতাম। বনের অন্তরালে যেন কেহ কাহাকেও সবেগে অনুসরণ করিতেছে। তাহার পরেই হঠাৎ হরিণের গলার ডাক পাইতাম। বুঝিতাম কোনও হরিণ হয়ত তাহার সঙ্গিনীর পিছনে দৌড়াইতেছে ও নিমেষের মধ্যে সমস্ত উপত্যকাটি ঘুরিয়া আসিতেছে। হরিণীরা খানিক ছুটিয়া যায়, আবার দাঁড়ায়, আবার ছোটে, আবার দাঁড়ায়, যেন নিরীহ ভাল মানুষটি। হরিণ হঠাৎ তাহাকে সন্ধান করিয়া

তীরবেগে লতাপাতার ফাঁকে ফাঁকে ছুটিয়া চলে, দেখিতে না পাইলে ডাকে, এমনিভাবে তাহাদের মধ্যে খেলা চলে।

গ্রামের পাশে সারগাদা। সময়ে অসময়ে হঠাৎ সেদিকে নজর পড়িলে দেখিতাম, বন্য কুক্কুটেরা মহানন্দে তাহার উপর ভোজ বসাইয়াছে। গ্রামের মোরগের মতই দেখিতে, তবে মাথার ঝুটি কিছু ছোট, শরীরের গড়ন আরও ছিপছিপে ধরণের। নিঃশব্দে খায়, মাঝে মাঝে ঝটাপটি করে, তাহাও গলা না খুলিয়া, এবং হঠাৎ ভয় পাইলে নিঃশব্দে উড়িয়া গিয়া গাছের ডালে আশ্রয় লয়। তাহার পরক্ষণেই আবার কোথায় মিলাইয়া যায় ধরা যায় না।

এমনিধারা বনজঙ্গলের মধ্যে জুয়াঙ্গদের বাস। আমি একটি বিশাল তেঁতুল গাছের কাছে তাঁবু ফেলিয়াছিলাম। বনে প্রায়ই হনুমানের হুপ-হাপ শব্দ শোনা যাইত, কিন্তু তেঁতুল গাছ তেঁতুলে ভর্তি, একদিনও তাহাতে আসিয়া বসিত না। আশ্চর্য হইয়া একদিন শবরদের জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, বাবু, এ গাঁয়ে যে জুয়াঙ্গেরা বসবাস করে, তাহাদের ত্রিসীমানার মধ্যে হনুমান আসিবে না। তাহারা নাকি বানর হনুমান খুব পছন্দ করে। একবার একটিকে পাইলে গ্রামসুদ্ধ লোক মিলিয়া যতক্ষণ না তাহাকে মারিতেছে ততক্ষণ রক্ষা নাই।

বাস্তবিক জুয়াঙ্গেরা সবই খায়। সকালে উঠিয়া পুরুষেরা বনে কাঠ কাটিতে, চুপড়ি তৈয়ারি করার জন্য বাঁশ আনিতে চলিয়া যায়, আর স্ত্রীলোকেরা ফলমূল, কন্দ, লালপিঁপড়ার ডিম প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে যায়। লালপিঁপড়ার ডিম তাহাদের খুব প্রিয় খাদ্য। আগে জুয়াঙ্গেরা বনে শিকার করিয়া খাইত, আজকাল সে সব জঙ্গল রাজার খাস হইয়া যাওয়ায় শিকার বন্ধ হইয়াছে, তাহাদের দুর্দশার

অন্ত নাই। কোনও রকমে বাঁশের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া দিন গুজরান করে।

জুয়াঙ্গদের গ্রামগুলি ছোট। কোনটিতে দশ ঘর, কোনটিতে বা দুই-তিন ঘর মাত্র লোকের বাস। গ্রামের মধ্যে একটি করিয়া চার-চালা ঘর থাকে, তাহাকে বলে মজাঙ অথবা দরবার। অতিথিসজ্জন আসিলে এখানেই আশ্রয় দেয়, গল্প গুজব করে। আবার এই ঘরেতেই তাহাদের যাহা কিছু পূজাপাট তাহাও করে। গ্রামের যত অবিবাহিত পুরুষ তাহাদের মজাঙে থাকিতে হয়। কাহারও মজুরের প্রয়োজন হইলে মজাঙের যুবকেরা অগ্রণী হইয়া কাজ করিয়া আসে। মজাঙই হইল জুয়াঙ্গদের বৃহত্তর সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। প্রতি সন্ধ্যায় মজাঙের সম্মুখে খোলা জমিটুকুতে স্ত্রীলোকেরা হাত ধরাধরি করিয়া নাচে এবং পুরুষেরা সম্মুখে ছাড়াছাড়ি ভাবে তাল রাখিয়া তাহাদের সহিত চাঙ্গু বাজাইয়া থাকে। মজাঙ ঘরের যে দুইটি খুঁটি, জুয়াঙ্গদের বিশ্বাস তাহাতেই জগতের আদি কারণ বুঢ়াম বুঢ়া ও বুঢ়াম বুঢ়ীর বাস। তাহার কাছে কাল রঙের মুরগী বলি দিতে হয়। অথচ তিনি স্বয়ং তেজোময়, অগ্নিতে তাঁহার অধিষ্ঠান। মজাঙে সর্বদা কুণ্ডের মধ্যে যে আগুন জ্বলিতে থাকে তাহা তাঁহারই কৃপায় জ্বলিতেছে। চাঙ্গুর চামড়া বাজাইবার আগে যখন আগুনে সেঁকিয়া লইতে হয় তখন তিনিই আসিয়া চাঙ্গুতে অধিষ্ঠিত হ'ন, চাঙ্গুর আওয়াজ তাঁহারই গলার আওয়াজ। আগুনের তাপ না লইলে চাঙ্গু কি নিজের শক্তিতে বাজিতে পারে?

একদিন জুয়াঙ্গদের একটি পূজা দেখিতে গেলাম। পূজার উপকরণ অতি সামান্য, মন্ত্র তদপেক্ষা সরল। আমি যাহাতে তাহাদের ভাষা সহজে শিখিতে পারি এই জন্য পূজা দেওয়াইয়াছিলাম। মানি নামে আমার শিক্ষক, ও গ্রামের মোড়ল, স্নান করিয়া একটু আগুন জ্বালিল,

তাহাতে ধুনা দিল ও শালপাতার একটি প্রদীপ করিয়া তাহা সূর্যের দিকে একটু উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, “সত্যা যেমতো মাসিকে তলে বাহাসিন্দরী উপরে ধর্মদেবতা, বাবুরে আইঙ্গ দাগাতাইঙ্গে সামুইসেরে। বেগাবেগী মোরনে ঠাররে।”

অনুবাদ—“নীচে বসুন্ধরা সত্য, উপরে ধর্মদেবতা, তিনিও সত্য। তোমাদের কাছে প্রার্থনা করিতেছি, বাবুকে আমাদের ভাষা শীঘ্র আনিয়া দাও।”

তাহার পর আরম্ভ হইল পূজার পালা। ভিজান আলোচাল পিণ্ডের মত নয়টি জায়গায় মাটিতে রাখা হইল এবং তাহার পর দুইটি কাল মোরগ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মোরগ দুটি চাল খাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধরিয়া বলি দেওয়া হইল ও রক্ত মজাঙের চাঙ্গুর উপর ছড়াইয়া দেওয়া হইল। পূজাও শেষ হইল। তাহার পর সারাদিন ধরিয়া খাওয়া-দাওয়া ও নাচগান চলিতে লাগিল।

পূজার মন্ত্র যেমন সোজা, দেবতার কাছে চাওয়াও তেমনি সরল ধরণের। দেবতার মধ্যেও কোনও বাছাই নাই, সবাই ভাল, সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে হয়। চালের পিণ্ড দেওয়ার সময়ে মানি বলিতে লাগিল—

গলা বুঢ়াম বুঢ়া পায়েসেনা
তলে বাহাসিন্দরি আমডা পায়েসেনা
লক্ষ্মী দেবতা আমডে পায়েনা
যেতেকে বুঢ়ারিকি, গলা বাবুকে
ঠাররে মেডেঞ্চেনাতে, আফে
পায়েসেনায়েতে
—আচ্ছা বুঢ়াম বুড়া নাও
নীচে বসুন্ধরা তুমিও নাও

লক্ষ্মী দেবতা তুমিও নাও
যত দেবতারা! আচ্ছা বাবুকে
ভাষা আনিয়া দাও (?) তোমরা সকলে
নিয়ে নাও।

সহজ ঋজু ভাষা, কোনও গোলমাল নাই, যে কেহ পূজা করিতে পারে, কেবল বিবাহিত হইলেই হইল। এমনিধারা সহজ জীবন জুয়াঙ্গের যাপন করে। বাহিরের লোকের সঙ্গে তাহাদের খুব বেশী সম্পর্ক নাই; পাহাড়, জঙ্গল, জীবজন্তুর সহিত সাক্ষাৎ কারবার রাখে। ইহাদের জীবন যে সুখের তাহা নহে। দারিদ্র্য আছে, অনাহার আছে, রোগ আছে, অত্যাচার আছে, তবু সন্ধ্যায় নাচগান লইয়া, মদ্যপান করিয়া একরকম করিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। দুঃখের কথা তাহারা বেশি ভাবে না, দুঃখকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে; কেবল দুঃখের অরণ্যের মধ্যে ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুধা পাওয়া যায় তাহাকেই কাঙালের মত নিঃশেষে পান করিয়া লয়, অনাহার অত্যাচারের কথা ভাবিয়া সেটুকু আনন্দকে পঙ্কিল করিতে চাহে না।

রাঁচি জেলার একটি উৎসব

ইউরোপের কথা বলিতে পারি না, তবে ভারতবর্ষের মধ্যে ছোটনাগপুরের মত সুন্দর জায়গা যে কম আছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশটি ছোট-বড় পাহাড়ে উপত্যকায় ভরা, মাঝে মাঝে সুবর্ণরেখা, দামোদর, কোয়েল প্রভৃতি নদী বহিয়া গিয়াছে। সে-সকল নদীতে কখনও জল থাকে, কখনও থাকে না। বর্ষায় যখন নদীতে জল নামে তখন সারা ছোটনাগপুরে কতই যে বিচিত্র জলপ্রপাতের লীলা দেখা যায় তাহার ইয়ত্তা নাই। হুডরুঘাগের নাম অনেকে শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহা ছাড়াও দাসোমঘাগ, পেরেঁায়াঘাগ প্রভৃতি আরও কতকগুলি অতি সুন্দর জলপ্রপাত আছে, তাহাদের শোভাও কোন অংশে কম নয়।

আজকাল রেল ও মোটর হওয়ায় রাঁচি, হাজারিবাগ প্রভৃতি স্থান সকলের আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে বটে, কিন্তু চল্লিশ বৎসর পূর্বেও সেখানে পৌঁছিতে হইলে মানুষে টানা পুসপুস গাড়িতে চড়িয়া যাইতে হইত। বহুকাল ধরিয়া এই দেশে মুণ্ডা, উরাঁও, খাড়িয়া, বিরহড় প্রভৃতি জাতি বসবাস করিয়া আসিতেছে। রাঁচি জেলা একটি মালভূমির উপরে অবস্থিত। তাহার পূর্বে সুবর্ণরেখার বিস্তীর্ণ উপত্যকা এবং মানভূম জেলার হিন্দুজাতির ঘন বসতি বর্তমান। হিন্দু ও জৈনগণ বহু শতাব্দী ধরিয়া মানভূমে বসবাস করিয়া আসিতেছে। জৈনদের তৈয়ারী মন্দির ও মূর্তি মানভূমে অনেক স্থানে দেখা যায়। কিন্তু জৈনগণ এখন হিন্দুদের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া গিয়াছে, আচারে ব্যবহারে উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই।

বিগত শতাব্দী ব্যাপিয়া মানভূমের প্রান্ত হইতে পূর্ব দিক দিয়া এবং উত্তরে হাজারিবাগ, গয়া প্রভৃতি জেলা হইতে হিন্দু চাষী, জমিদার, ব্যবসায়ীগণ ক্রমে ক্রমে রাঁচির মালভূমিতে প্রসার লাভ করিয়া আদিম উরাঁও, মুণ্ডা প্রভৃতি জাতিকে প্রতিযোগিতায় হঠাইয়া দিতেছে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে দুইবার ছোটনাগপুরে বিদ্রোহ হয় এবং উভয় বিদ্রোহে ইংরেজ গভর্মেণ্টের নিকট পরাজিত হইয়া মুণ্ডারা বশ্যতা স্বীকার করিয়া আজকাল শান্তভাবে বসবাস করিতেছে। তাহারা পূর্বে যে-রীতিতে চাষ করিত সে-রীতি পরিহার করিয়াছে। পূর্বের সামাজিক প্রথা অনেকাংশে বর্জন করিয়াছে এবং সর্ব বিষয়ে হিন্দুগণের অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। দেশের মধ্যে হিন্দুই ধনী, তাহারা লেখাপড়া জানে, গভর্মেণ্টের নিকট তাহাদেরই প্রতিপত্তি বেশি, সেই জন্য মুণ্ডাদের পক্ষে হিন্দুগণের সংস্কৃতি অনুকরণ করার প্রবৃত্তি হওয়া স্বাভাবিক। পূর্বে হিন্দু চাষী এবং জমিদারের সহিত কলহ-বিবাদের সময়ে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ উরাঁও-মুণ্ডাদের খুব সাহায্য করিতেন, এখনও করেন। সেই কারণে আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে অনেকে খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে সারা ভারতে যে জাতীয় আন্দোলনের সাড়া পড়িয়াছে, তাহার প্রভাব ছোটনাগপুরের মধ্যেও প্রবেশলাভ করিয়াছে। ফলতঃ ইহাদের মধ্যে খ্রীষ্টান হইবার প্রবৃত্তি কমিয়া গিয়াছে এবং সর্বতোভাবে হিন্দু হইবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক আন্দোলন উরাঁও জাতির মধ্যে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যথেষ্ট পরিবর্তন সাধন করিয়াছে।

হিন্দুজাতির সহিত একীভূত হইবার চেষ্টায় রাঁচির উরাঁও-মুণ্ডাগণের মধ্যে একটি বিশেষ উৎসব খুব প্রসারলাভ করিয়াছে। তাহারই কথা বলা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। বাংলা দেশে চৈত্র মাসে যে গাজনের উৎসব

হয়, রাঁচি জেলায় জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে তাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তখন রাঁচি জেলার অধিবাসী বৈষ্ণবজাতীয় কয়েক ব্যক্তি ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকেন। তারিখের কোন বালাই নাই, পুরোহিতের অবসর বুঝিয়া গ্রামের পর গ্রামে মাণ্ডা-পরবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। মাণ্ডা-পরবে শুধু যে মুণ্ডা বা উরাঁওগণ যোগ দেয় তাহা নহে, গ্রামের অধিবাসী লোহার, আহির প্রভৃতি জাতিও একসঙ্গে একই ভাবে উৎসবটি পালন করিয়া থাকে। বিগত আষাঢ় মাসে রাঁচির নিকটে হাতমা গ্রামে আমরা মাণ্ডা-পরব দেখিতে গিয়াছিলাম। যে ভোক্তা অর্থাৎ গাজনের সন্ন্যাসীগণ তাহা পালন করিতেছিল তাহাদের সকলের নাম পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে ইহা কিরূপ বর্ণ-নির্বিশেষে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, হাথুয়া আহির, মহাদেও লোহার, বিরসা উরাঁও, জগন্নাথ মুণ্ডা, মাংরু লোহার, ঢুকরু উরাঁও, বুধনা মুণ্ডা, পুরজু মুণ্ডা, হিরুয়া লোহার, বোথা লোহার, পোঢ়ু মিরধার পুত্র (ডোম) ইত্যাদি। বৈষ্ণব পুরোহিত ইহাদের পৌরোহিত্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হন না, এবং আশ্চর্যের বিষয় মাণ্ডা-পরবে পুরোহিত বিনা-দ্বিধায় মহাদেবের পূজা করিয়া থাকেন। মাণ্ডা-পরবে শিব এবং পার্বতী উভয়ের পূজা হইয়া থাকে।

মাণ্ডা-পরবটি তিন দিন ধরিয়া চলে। পরবের পূর্বে যাহারা ভোক্তা হইবে তাহাদের উপর দেবতার ভর হয় এবং সচরাচর এইরূপে প্রত্যাদেশের পর লোকে ভোক্তা হইয়া থাকে। উৎসবের প্রারম্ভে রামাইত গোঁসাই ভোক্তাগণকে যজ্ঞোপবীত পরাইয়া দেন এবং তাহারা তিন দিন মাছ, মাংস, নুন, হলুদ, মশলা, প্রভৃতি খাওয়া ত্যাগ করে; শুধু ভাত, ফল, দুধ ও মিষ্টান্ন খাইয়া কয়েক দিন কাটাইয়া দেয়। ভোক্তাগণ বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া গ্রামের প্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে যায়

এবং পরে সেই পয়সা খরচ করিয়া আমোদ-আহ্লাদ করে। উৎসবের দ্বিতীয় দিনে গ্রামের মধ্যে মহাদেবের "আস্থানে" উহারা সমবেত হইয়া অনেকগুলি অনুষ্ঠান করে। তাহার মধ্যে দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটির নাম "কান্ধাইয়া", অপরটীর নাম "ফুলকুদনা"। কান্ধাইয়া অনুষ্ঠানে ভোক্তাগণ সারবন্দী হইয়া মাটিতে উপবেশন করে এবং পুরোহিত তাহাদের কাঁধের উপর পা দিয়া হাঁটেন। যাহাদের কাঁধের উপর দিয়া হাঁটা হইয়া যায় তাহারা আবার ঘুরিয়া সামনে আসিয়া বসে। এই ভাবে পুরোহিত একস্থান হইতে মহাদেবতলায় অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের কাঁধের উপর দিয়া হাঁটিয়া যা'ন। এই অনুষ্ঠানটির দ্বারা পুরোহিতের নিকট ভোক্তাগণ বিশেষভাবে আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকে।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠানটি রাত্রি প্রায় নয়টা, দশটা বা তাহার পরেও হইয়া থাকে। মহাদেওস্থানের নিকট প্রায় ১২।১৪ ফুট একটি খাল কাটা হয়। ইহা চওড়ায় প্রায় দুই ফুট এবং এক ফুট গভীর হইয়া থাকে। এই জায়গাটিকে স্তূপাকার কাঠকয়লার দ্বারা ভরিয়া দেওয়া হয়। কুলার বাতাস দিয়া কাঠকয়লাগুলিকে ভাল করিয়া ধরান হয়। আঁচ বেশ গনগনে হইলে পুরোহিত আসিয়া অগ্নিকে পূজা করেন। তাহার উপর আশীর্বাদী জল দু-চার ফোঁটা ছিটাইয়া দেন এবং তাহার পর ভোক্তাগণ পর-পর সারি বাঁধিয়া যুক্ত হস্তে খালি পায়ে আগুনের উপর দিয়া হাঁটিয়া যায়। শুধু একবার হাঁটা নয়, বার-বার তিন বার তাহারা এইরূপ অগ্নিকে অতিক্রম করিয়া যায়। ঘড়ি ধরিয়া দেখিয়াছি প্রতি বারে প্রায় ২।৩ সেকেণ্ড আগুনের উপর থাকে, তিন বারে মোট ৮ হইতে ১০ সেকেণ্ড নগ্ন অগ্নির উপরে তাহারা পদচারণ করে। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, ইহাতে বালক, বৃদ্ধ কাহারও পায়ে কিছুই হয় না, এমন কি ফোস্কা পর্যন্ত পড়ে না। প্রতি ভোক্তার সেবা করিবার জন্য তাহার

সঙ্গে তাহার মাতা, ভগ্নী বা অপর কেহ থাকে। তাহাদিগকে সোকথাইন বলে। ভোক্তাগণের পিছনে সোকথাইনেরাও অগ্নিকে অতিক্রম করিয়া থাকে। অথচ তখনও যে আগুনের দাহিকাশক্তি বর্তমান থাকে সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার জনৈক বন্ধু ভোক্তাগণের পরে অগ্নিতে পা দিয়া পা পুড়াইয়াছিলেন। অপর এক জন ভোক্তাদের সঙ্গে সারাদিন উপবাসাদি করিয়া ভোক্তা হইয়া সব নিয়ম পালন করিয়া অগ্নিতে পদচারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কিছু হয় নাই। কিন্তু তাঁহার ধারণা "ফুলকুদনা" অনুষ্ঠানের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে স্নান করিতে হয় বলিয়া ভিজা পায়ে মাটি লাগিয়া থাকে এবং সেই মাটিই অগ্নি হইতে চর্মকে রক্ষা করে।

কথাটি হয়ত আংশিকভাবে সত্য। কিন্তু আট দশ বছরের ছোট ছেলেকেও ফুলকুদনায় যোগ দিতে দেখিয়াছি, তাহাদের পা ছোট, চামড়াও নরম, অথচ কিছু হয় নাই। আবার রাঁচি হইতে দূরের গ্রামে শুনিয়াছি ফুলকুদনায় ভোক্তাগণ শুধু আগুনে হাঁটিয়া নিরস্ত হয় না, অনেকক্ষণ তাহার উপর নৃত্য করিয়া অবশেষে আগুনটিকে নিবাইয়া দেয়। আশ্চর্যের বিষয় কোথাও কিছুই অনিষ্ট হয় না। চোখের ধাঁধা ভাবিয়া ফটোগ্রাফ লইয়া দেখিয়াছি, ইহার মধ্যে কোনও জালজুয়াচুরি নাই।

যাহাই হউক, ফুলকুদনা উৎসবের পরে সারারাত ধরিয়া গ্রামে নৃত্য-গীত হইতে থাকে। তাহাতে মুখোস পরিয়া রাম, রাবণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতি সাজিয়া লোকজন নৃত্য করে। পরদিবস বাংলা দেশের মত চড়কগাছে চড়া হয় এবং মেলা বসে। সেই মেলায় গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে মুণ্ডারা আসিয়া নাচগান করে এবং পরম উৎসবের মধ্যে মাণ্ডা-পরবের অবসান হইয়া থাকে।

নুলিয়া জাতি

পুরীতে সমুদ্রের ধারে মাছ ধরিতে অথবা যাত্রীদের স্নান করাইতে যাহাদের আমরা দেখি তাহাদের যথার্থ নাম নুলিয়া নহে। তাহাদের মধ্যে দুইটি জাতি আছে। একটির নাম ওয়াডা-বালিজি, অপরের নাম জালারি। জালারিগণই যথার্থ জেলিয়া। ওয়াডা-বালিজিদের পূর্বপুরুষগণ জাহাজে খালাসীর কাজ করিত, কিন্তু স্বাধীন হিন্দুরাজ্য বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের কাজ যায়। তখন হইতে তাহারা মাছের ব্যবসায় শুরু করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে জালারিগণ প্রথমে তাহাদিগকে জাল তৈয়ারি করা কিছুতেই শিখাইতে রাজি হয় নাই। এমন কি, রাত্রে জাল পাছে চুরি যায় এইজন্য তাহারা প্রত্যহ কাজের শেষে জাল পোড়াইয়া ফেলিত, আবার ভোরের আগেই জাল বুনিয়া লইত। অবশেষে সমুদ্রের কূলে পোড়া জালের ছাই পরীক্ষা করিয়া ওয়াডা-বালিজিগণ জালের বিদ্যা শিখিয়া লয় এবং তাহার পর হইতে মাছের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া দেয়। সত্য হউক মিথ্যা হউক, গল্পটির মধ্যে জালারি ও ওয়াডা-বালিজিগণের বিরোধের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের উভয় জাতির মধ্যে বিবাহ-সম্পর্ক নাই। জালারিগণ বলিয়া থাকে যে মর্যাদায় তাহারাই বড়। ওয়াডা-বালিজিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে আবার তাহারাও তাহাই বলে। উভয়ের মধ্যে সামাজিক ব্যাপারে একত্র খাওয়া পর্যন্ত চলে না। শুধু তাহাই নহে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে উভয়ের আর্থিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার এবং পূজা-

পার্বণের মধ্যেও সামান্য সামান্য ইতর-বিশেষ দেখা যায়। তবে এই সকল পার্থক্য সত্ত্বেও উভয় জাতিই তেলুগু ভাষায় কথা বলে এবং মোটের উপর একই রকমের সংস্কৃতি পালন করে। সেই সংস্কৃতির সাধারণ পরিচয় দান করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

নুলিয়ারা যদিও সমুদ্রের ধারে থাকে, সমুদ্রেই নিজেদের জীবিকা অর্জন করে, তথাপি তাহাদের পূজাপার্বণ পরীক্ষা করিলে ওড়িশা বা মাদ্রাজের অরণ্যবাসী জাতিগণের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক ছিল বলিয়া মনে হয়।

আকারে তাহারা মাদ্রাজের সাধারণ তেলুগু দেশবাসীরই অনুরূপ। নুলিয়ারা হিন্দু, কারণ তাহারা হিন্দু দেবদেবীর পূজা করে, এবং তাহাদের সামাজিক সংস্কারে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবেরও স্থান আছে। ব্রাহ্মণ পুরোহিত শুধু বিবাহের সময়ে আসেন। দেবদেবীর পূজা নুলিয়ারা নিজেরাই করে, দেবপূজার জন্য কাহারও বংশগত অধিকার নাই, সে অধিকার গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চলিতে থাকে। কেবল গ্রামদেবীর পূজার জন্য একটি বংশ স্থির করা আছে; দেবী নাকি তাহাদেরই বংশে প্রথম আবির্ভূতা হন, সেই জন্যই তাহাদের এই অধিকার।

দেবগণের মধ্যে নৃসিংহ ও মহাদেব প্রধান। ইঁহাদের বিশেষ কোনও অত্যাচার উৎপীড়ন নাই, কিন্তু তাঁহাদের অনুচরবর্গকে সন্তুষ্ট করিতেই নুলিয়ারা প্রাণান্ত হইয়া থাকে। অনুচরগণের নামও সংস্কৃতে নহে, তেলুগু ভাষায়, যথা—অঙ্কপলাম্মা, এনীগী-শক্তি, দাইবুম্ সম্বারম্ ইত্যাদি। ইহাদের খাঁই বড় বেশি। গ্রামে রোগ হইলে বুঝিতে হইবে পূজা দেওয়া দরকার, বাড়ীতে উৎপাত হইলেও তাই। তাঁহাদের পূজার জন্য মোরগ, শূয়ার প্রভৃতি ঘটা করিয়া বলি দিতে হয়।

একদিন এইরূপ একটি পূজা দেখিতে গিয়াছিলাম। শুনিলাম,

একজন গৃহস্থের বাড়ীতে পূজা। তাহার বাড়িতে নাকি দু-একটি দুর্ঘটনার পর বুঝিতে পারা গেল, গৃহস্থের পিতার আত্মা শান্ত হন নাই, তাহার জন্য পূজা দেওয়া দরকার। গুণী লক্ষণ দেখিয়া বলিয়াছে যে, সেই আত্মা নরসিংহ প্রভৃতি দেবতার মধ্যে লীন না হইয়া এনেগী-শক্তির সহিত রহিয়াছেন। সেইজন্য এনেগী-শক্তির নিকট একটি মোরগ বলি দিতে হইবে এবং একটি মাটির বা কাঠের ঘোড়াও দিতে হইবে, যেন পিতার আত্মা তাহাতে আরোহণ করিতে পারেন। নুলিয়ার বাড়ীতে গিয়া দেখিলাম যে গুণী পুরুষ হইলেও শাড়ী পরিয়া ও বিনুনী বাঁধিয়া দেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে এবং মোরগ, নৈবেদ্য, ঘোড়া প্রভৃতি লইয়া আরও জন-দশেক নুলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া আছে।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ নাচিবার পর গুণী বাহিরে আসিয়া পথের উপর কাঠের তরোয়াল লইয়া নাচিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম যে, যতক্ষণ না গুণী আবিষ্ট হইয়া গ্রামের প্রান্তে এনেগী-শক্তির মন্দিরের দিকে যায় ততক্ষণ নাচ চলিতে থাকিবে। চারিদিকে নাচের তাড়নায় ধূলা উড়িতেছে, তাহার উপর দ্বিপ্রহরের রৌদ্র। ইহার মধ্যে ঢাক, শানাই প্রভৃতির তীব্র আওয়াজ, তাহাতে সাধারণ লোকেরই মাথা ঘুরিয়া যাইবার কথা, গুণী বা অপরাপর নর্তকদের ত কথাই নাই। কিছুক্ষণ নাচার পর গুণীর বেগ খুব বৃদ্ধি পাইল এবং একজন লোক গান গাহিয়া গাহিয়া তাহার মুখের সম্মুখে একটি মুরগীর ডিম ধরিয়া যেন লোভ দেখাইয়া টানিয়া চলিল। গুণী একবার আগাইয়া একবার পিছাইয়া যায়। এমনি করিতে করিতে হঠাৎ ডিমটিতে সে এক কামড় দিল। তখন নাকি বুঝা গেল যে দেবী ভর করিয়াছেন। বাজনা-বাদ্যও এক রকম থামাইয়া সকলে তাড়াতাড়ি এনেগী-শক্তির মন্দির পর্যন্ত ছুটিয়া গেল।

নুলিয়াদের গায়ে শক্তি বেশ, দেহের গঠনও ভাল। এরূপ অবস্থায়

গুণীর নাচ মন্দ লাগিতেছিল না। কিন্তু একজন জোয়ান মানুষকে দেবীর সাজে দেখিয়া, তাহার উপর তাহার সুপুষ্ট গোঁফের দিকে নজর করিয়া আমার কেবলই হাসি পাইতেছিল। অথচ মুলিয়ারা সমস্ত ঘটনার মধ্যে হাস্যরসের কিছু ত পায়ই নাই, বরঞ্চ গভীর ভক্তির সহিত দেবী কখন আসেন, তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল। হয়ত আমরা নিজেদের আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারা এমনিভাবে অজ্ঞাতসারে অপরাপর জাতির পক্ষে হাস্য-রসের খোরাক জোগাই, নিজের জাতিগত সংস্কারের মধ্যে এমনিভাবে জড়াইয়া আছি যে মুক্তমনে তাহা মোটেই দেখিতে পাই না।

যাক্ সে কথা। এনেগী-শক্তির মন্দিরে পৌঁছিয়া মোরগটিকে বলি দেওয়া হইল। দেবীর সম্মুখে মোরগটিকে দাঁড় করাইয়া গুণী এবং যজমান সকলেই সাধারণ ভাষায় "দেবি, তুমি গ্রহণ কর। কত খরচ করিয়া পূজা দিতেছি, কেন লইতেছ না ?"—প্রভৃতি বলিয়া নানাবিধ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। গুণী মাঝে মাঝে মোরগটির গায়ে জল ছিটাইতে লাগিল। তাহাদের বিশ্বাস যে মোরগটি যতক্ষণ না গা ঝাড়া দিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত দেবতা বা তাহার পূর্বপুরুষ তাহাকে গ্রহণ করেন নাই—বর্তমান মোরগটি মাঝে মাঝে শুধু মাথা ও ঘাড়ের পালক নাড়িয়া জল ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে হইল না। অবশেষে প্রায় আধঘণ্টা পরে সে একবার গা-ঝাড়া দিল। তখন তাহাকে বলি দেওয়া হইল।

মুলিয়াদের সকল অনুষ্ঠানেই তাই। যতক্ষণ না তাহারা দেবতার আবেশের লক্ষণ দেখে, ততক্ষণ তাহাদের কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না। নমোনমঃ করিয়া পূজা সারিতে তাহারা পারে না, দেবতার সহিত সর্বদাই সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্থাপনা করে। যাহাই হউক, মোরগটিকে বলি দেওয়ার রীতিও বিচিত্র। গা-ঝাড়া দেওয়ার পর গুণী মোরগটিকে তুলিয়া

নিজের হাঁটুর উপর তাহার পিঠ রাখিয়া দুই হাতে তাহার পা দুখানি সজোরে টানিতে লাগিল। কিছুক্ষণ টানের পরে পেটের উপরকার চামড়া ফাটিয়া ছিঁড়িয়া গেল। তখন সে আঙ্গুলে করিয়া মোরগটির নাড়ীভুঁড়ি ও কলিজা বাহির করিয়া আবার তাহারই গলায় জড়াইয়া, কলিজাটি মুখে যথাসম্ভব গুঁজিয়া দেবীর সম্মুখে নিবেদন করিল।

নুলিয়াদের সকল বলিদানেই এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবস্থা দেখা যায়। গ্রামদেবী অঙ্ক-পলাম্মার পূজাতেও একটি কাঠের গাড়ীতে বাঁশের শূলে দুইটি শূকর-শাবককে জীবন্ত গাঁথিয়া দেওয়া হয়। শূকরগুলি তীব্র আর্তনাদ করিতে থাকে এবং গ্রামসুদ্ধ সকলে মহা কোলাহল করিতে করিতে গাড়ীটি লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। নুলিয়াদের বলিদানের প্রথা এরূপ নিষ্ঠুর বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে তাহারা স্বভাবত অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। বস্তুত তাহা ঠিক নহে। নুলিয়ারা অত্যন্ত ভদ্র ও সৎস্বভাবাপন্ন। তবে তাহাদের বিশ্বাস, যে দেবী স্বয়ং নিষ্ঠুর, তাঁহার চাহিদাও তেমনই নিষ্ঠুর। তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইলে তেমনই নিষ্ঠুর কোনও আয়োজন করা দরকার।

বস্তুত নুলিয়ারা যে নিষ্ঠুর আবেষ্টনের মধ্যে থাকে, সেখানে তাহারা যে প্রকৃতির রুদ্রমূর্তিরই পরিচয় পাইবে, তাহাকেই সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একমাত্র সত্য রূপ বলিয়া বিবেচনা করিবে, ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। সমুদ্রের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া ইহাদের অন্নসংস্থান করিতে হয়। পুরীতে শীত ভিন্ন অপর সকল ঋতুতেই সমুদ্রের ঢেউ অত্যন্ত প্রবল বেগে বহে। তাহার ভিতর দিয়া ছোট ছোট ভেলা ভাসাইয়া দিনের পর দিন নুলিয়ারা মাছ ধরিতে যায়। কোন দিন কিছু পায়, কোন দিন পায় না। হয়ত কয়েকদিন লহরীর প্রচণ্ড বেগে ভেলা পারই হইতে পারিল না। আবার হয়ত বা কয়েক দিন ধরিয়া

মাছ কিছুই পড়িল না। তাহার উপর সমুদ্রে মাছ ধরিতে গিয়া বড় বড় হাঙর, শংকরমাছ প্রভৃতি নানাবিধ জীবের আশঙ্কাও আছে। তাহাদের পাইলে নুলিয়ারা ছাড়ে না। হয়ত একবার বঁড়শিতে বড় শংকরমাছ গাঁথিয়া গেল। তাহার বিপুল টানে হু হু শব্দে নীল জল ভেদ করিয়া ভেলা ছুটিয়া চলিল। নুলিয়ারাও ছাড়ে না, মাছও ছাড়িবার পাত্র নয়। এমনি ঘণ্টাখানেক যুদ্ধের পর মাছ ডাঙ্গায় তোলা হয়। তখন গ্রামসুদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলের কি আনন্দ! সবাই ঝুড়ি আনে, কুড়ুল আনে এবং পরমানন্দে মাংস ভাগ করিয়া যে যার ঘরে চলিয়া যায়।

বহুদিন সমুদ্রের সহিত কারবার করিয়া নুলিয়ারা এক দিকে যেমন সাহসী হইয়াছে, অপর দিকে সমুদ্রের বিষয়ে তাহারা অনেক জ্ঞানও লাভ করিয়াছে। ঢেউয়ের শব্দ শুনিয়াই তাহারা বলিয়া দিতে পারে, কি ভাবের স্রোত বহিতেছে। পাড়ের সমান্তরাল ভাবে না অন্যদিকে, শুধু উপরের স্তরে না নীচের দিকে, মাছ আসিবে কি না—সকল কথা নুলিয়ারা ঢেউ দেখিয়া এবং তাহার শব্দ শুনিয়া বলিয়া দিতে পারে। এই জ্ঞানটুকু সম্বল করিয়া, ধৈর্য ও সাহসে ভর করিয়া নুলিয়ারা জীবনের যুদ্ধযাত্রা নির্বাহ করিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাতেও তাহাদের কুলায় না। সকল লক্ষণই হয়ত ভাল, পরিশ্রমও যথেষ্ট করা হইল, তবু জালে যথেষ্ট মাছ পড়িল না। কেননা, দৈব বলিয়াও ত কিছু আছে। তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নুলিয়ারা কতরকম পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, সমুদ্রকে তাহারা গঙ্গাদেবী নামে পূজা করে। তাহারা যে আগে মাটির সহিত বেশী সম্পর্ক রাখিত—সমুদ্রের সহিত নহে—ইহাতে তাহাই সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। যাহাই হউক, প্রকৃতি এবং দৈব ভিন্ন মানুষের কাছেও নুলিয়ারা বিশেষ শান্তি পায় না। মহাজনের নৌকা ও জালের ভাড়া

দিয়া, মহাজনের অন্যান্য নানাবিধ খাঁই মিটাইয়া তাহাদের বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। তাই শহরের যাত্রীদের স্নান করাইয়া অথবা মেয়েদের মজুরের কাজে পাঠাইয়া তাহারা কোনও রকমে দুঃখে কষ্টে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করে।

এরূপ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া তাহারা যে প্রকৃতির মধ্যে শুধু আঘাতকেই বড় করিয়া দেখিবে, ইহাতে বিচিত্র কি ? সেই আঘাতকেই তাহারা দেবতার আসন দান করিয়াছে, এবং নানাবিধ নিষ্ঠুর অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহারই পূজার ব্যবস্থা করিয়াছে। নুলিয়ারা অবশ্য নরসিংহ, মহাদেব প্রভৃতি দেবতার শান্তমূর্ত্তি পূজা করে বটে, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ অর্ঘ্যই নীচের স্তরের নিষ্ঠুর দেবদেবীর নিকট নিবেদিত হয়। দারিদ্র্য ও প্রকৃতির অনিশ্চয়তার বেড়াজাল অতিক্রম করিয়া তাহাদের মন মুক্তির আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া তাহাদের চরিত্রও কোনদিন সহজ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। হয়ত মানুষের অত্যাচার দূর হইলে, পরস্পরের মধ্যে সাহচর্যের ভাব বৃদ্ধি পাইলে তাহাদের মুক্তির পরিধি আরও একটু বিস্তৃত হইবে, প্রকৃতির নিকট গ্রাসাচ্ছাদন আরও উন্নত কৌশলের সহিত আদায় করিতে পারিবে। কিন্তু তাহার জন্য অন্যান্য মানুষের নিকট যে প্রেম ও সহানুভূতির প্রয়োজন, তাহা হইতে আজ তাহারা বঞ্চিত রহিয়াছে।

নুলিয়া সমাজ

পুরী হইতে দক্ষিণে যেখানে গোদাবরী নদী সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখান পর্যন্ত নুলিয়াদের বাস। ওড়িয়া ভাষায় ইহাদের নুলিয়া বলিলেও ইহাদের প্রকৃত নাম ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে একটি জাতির নাম ওয়াড়া-বালিজি, অপরের নাম জালারি। আরও দক্ষিণে যেসকল নুলিয়ার মত জাতি বাস করে তাহাদের নাম কালিঙ্গী। ওয়াড়া-বালিজি এবং জালারিগণের মধ্যে ওয়াড়া-বালিজিগণই অপেক্ষাকৃত ধনী। জালারিগণ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও কৃশকায়। ওয়াড়া-বালিজিগণ আগে সমুদ্রে জাহাজের কাজ করিত, এখন দেশী জাহাজের ব্যবসায় উঠিয়া গিয়াছে বলিয়া তাহারা অপরের মত মাছ ধরে এবং তাহাদের মেয়েরা শহরে মজুরের কাজ করে। ওয়াড়া-বালিজিদের জাতির মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি হইলেন মান্দাসার রাজা মাইলিপিলি নারায়ণ স্বামী। তিনিও ওয়াড়া-বালিজি জাতির লোক, এবং তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সমস্ত প্রধান ওয়াড়া-বালিজি গ্রামে গিয়া গ্রামের কয়েক বৎসরের জমা ঝগড়া-বিবাদ অথবা সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইয়া আসিতে হয়। ওয়াড়া-বালিজিদের পক্ষে মান্দাসার রাজাই সুপ্রীম কোর্ট বলা যাইতে পারে, তাঁহার উপরে আর আপীল নাই।

ওয়াড়া-বালিজি অথবা নুলিয়াদের বসতির মধ্যে গঞ্জাম জেলায় গোপালপুরের মত পুরীও একটি প্রধান জায়গা। এখানে প্রায় পাঁচশ' ঘর নুলিয়ার বাস; তাহা ছাড়া জালারি নুলিয়াও কিছু আছে। নুলিয়াদের মধ্যে একটি বংশের বিশেষ আদর আছে। তাহাদের নাম অঙ্ক। এই বংশের লোকের নাম এইরূপ হয়—অঙ্ক কয়লাম্মা, অঙ্ক রামাইয়া ইত্যাদি। নুলিয়াদের গ্রামে অঙ্ক পলাম্মা প্রধান দেবী। সেই

দেবী নাকি অঙ্ক-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য অঙ্কবংশের পুরীতে এত সম্মান আছে।

পুরীর নুলিয়া-বস্তির শাসনভার গ্রামের একজন অগ্রণীর হাতে আছে। তাঁহাকে 'উর-পেডা' বলা হয়। তাঁহার একজন কার্যাধ্যক্ষ বা 'কারিজি' আছে এবং তদুপরি একজন চাপরাসীও আছে, তাহার নাম 'সাম্মিটোড়ু'। অঙ্কবংশের লোকেরা একটি বিশেষ পরিবার হইতে উর-পেডাকে নির্বাচন করেন। নির্বাচন সিদ্ধ হইলে উর-পেডা মান্দাসার রাজার নিকট হইতে একটি সম্মতিপত্র পান। অঙ্ক বংশের লোকেরা যদি কোন উর-পেডা নির্বাচন করিতে না পারে, তাহা হইলে গ্রামের জনসাধারণ নির্বাচনের সে ভার গ্রহণ করিয়া থাকে। উর-পেডা যদি নিজের কাজ ঠিকমত না করেন, তাহা হইলে গ্রামের লোক তাঁহাকে সরাইয়া সেই পদে নূতন লোক বাহাল করিতে পারে; তবে নূতন লোকটি উরপেডার বংশের লোক হওয়া চাই। একবার পুরীতে হইয়াছিলও তাই। শেষে মান্দাসার রাজা পুরীতে আসিলে তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া সাধারণের কাছে ক্ষমা চাহিবার পর তবে পুরাতন উর-পেডাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল।

উর-পেডার কাজ আগে হয়ত অনেক বেশি ছিল। কিন্তু অনেকাংশে এখন দণ্ডের ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে চলিয়া যাওয়ায় তাহার কাজ অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিবাহ, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম, যথা গ্রাম-দেবতার পূজা প্রভৃতিতে যোগ দেওয়াই এখন তাহার প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উর-পেডা, কারিজি এবং সাম্মিটোড়ুর কাজ আজীবন থাকে। তাহারা মারা গেলে লোকে পুনরায় তাহাদের পদে লোক নির্বাচন করিয়া দেয়।

নুলিয়াদের গ্রামে যে পাঁচ শত ঘরের কথা বলা হইয়াছে গ্রামের

সাধারণ কাজে তাহাদের একত্র হইতে দেখা গেলেও বিবাহ সম্পর্কে এই পাঁচশ' বরের মধ্যে একটি বিচিত্র ভাব দেখা যায়। মুলিয়াদের বাড়ীগুলি ছোট। সচরাচর তাহাতে দু-তিনটি ঘর থাকে। একটি ঘরে স্বামীস্ত্রী এবং ছোট ছেলেমেয়েরা শোয়, অপরটিতে সংসারের কাজকর্ম এবং রান্নাবান্না হয়। আর একটি অন্ধকার কুটুরীর মধ্যে দেবতা ও পূর্বপুরুষদের বেদী থাকে এবং তাহা ছাড়া জাল ও অন্যান্য আবশ্যক জিনিষপত্রও রাখা হয়। বড়ছেলেরা বাড়ীর বাহিরে বারান্দায় শুইয়া থাকে। একটু বড় হইলেই মেয়েদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহারা স্বতন্ত্র ঘর করিয়া থাকে। বাপ মারা গেলে সকল ভাই বাড়ীতে অধিকার পায় বটে, কিন্তু বাড়ী এত ছোট যে, তাহাকে ত ভাগ করা চলে না। তখন বড় ভাই সেই বাড়ী অধিকার করিয়া অন্য ভাইদের অন্যত্র বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দেয় বা যথাসাধ্য তাহার জন্য খরচ যোগাইয়া থাকে।

যাহা হউক, গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন ভাগের কথা বলিতেছিলাম। পুরীর মুলিয়া-বস্তিটি সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের জন্য তেরটি ভাগে বিভক্ত। এই সকল বিভাগকে বিরিসি বলে। বিরিসির নিয়ম হইল যে বিরিসির মধ্যে যে-কোন ঘরে যদি একটি বিবাহ হয় তাহা হইলে বিরিসির সকলকে সেই বাড়ীতে খাটিয়া দিতে হয়। বিরিসির অধিবাসিগণ যেন একান্নবর্তী পরিবার। বিবাহের কয়দিন বিবাহ-বাড়ীতেই তাহারা খায়দায়, কাজ করে এবং আনন্দ করে।

মুলিয়াদের মধ্যে বিবাহ সচরাচর অল্প বয়সে হয়। বরের বয়স সতর-আঠার এবং কনের বার-তের; ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে কদাচিৎ পাঁচ-ছয় বৎসরের ছেলের সহিত তিন-চার বৎসরের মেয়ের বিবাহ হয়। অপর পক্ষে বরের আঠার-উনিশ এবং কনের পনর-ষোলর বেশী বয়স বাড়িতে দেওয়া হয় না।

বরের পিতাই প্রথমে কথা পাড়েন। যদি কন্যাপক্ষ রাজি হয় তখন বাগ্‌দানের অনুষ্ঠান হয়। সেই দিন কয়েকজন ভদ্রলোককে লইয়া বরের পিতা কনেকে গহনা পরাইতে যান। কনের বাড়ীতে সকলে বসিলে কনের বাপ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সে বিবাহে রাজি আছে কিনা। মেয়ে যতই ছোট হউক না কেন, তাহার অনুমতি না লইয়া বাগ্‌দান কিছুতেই নিষ্পন্ন হইতে পারে না। যদি সে রাজি না হয়, তাহা হইলে কনের পিতা বরপক্ষের কাছে মাপ চান, আর একদিন আসিতে বলেন, এবং ইতিমধ্যে কনেকে যথাসাধ্য বুঝাইয়া রাজি করাইবার চেষ্টা করেন। ইহা লুসাই সমাজের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। স্ত্রীলোকদের আসন আমাদের সমাজের চেয়ে সেখানে আরও উচ্চে, সেইজন্য স্ত্রীলোকের অনুমতি বিনা বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না। যদি অনুমতি ব্যতিক্রম করিয়া কোন পিতা বিবাহ দেন তাহা হইলেও শেষে সে বিবাহ ভাঙিয়া যাইতে পারে, এমনও দেখা গিয়াছে। কিন্তু সে কথা পরে হইবে।

যাহা হউক, কন্যা রাজি হইলে সমবেত ভদ্রলোকদের সম্মুখে বরের পিতা তাহাকে সম্পূর্ণ দানের গহনা পরাইয়া দেন, এবং তখন কনের মা সমবেত ভদ্রলোকদের হাত-পা জল দিয়া ধুইয়া দেন। ইহাই হইল বাগ্‌দানের পর্ব। বরকর্তা তখন সমবেত ভদ্রলোকদের তিন টাকা করিয়া ও কন্যাকর্তা দুই টাকা করিয়া প্রণামী দেন। তাহার পর বরকর্তা মেয়ে লওয়ার খেসারৎ-স্বরূপ কন্যাকর্তাকে নয় টাকা দিয়া থাকেন। বাড়ীর একজন কাজের লোক চলিয়া যাইতেছে, ইহারই খেসারৎ নয় টাকা; সে টাকাকে কন্যাবিক্রয়ের মূল্য বলিয়া ধরিবার কোন কারণ নাই।

বাগ্‌দানের পর নায়েক অর্থাৎ জ্যোতিষির সাহায্যে তিথি, লগ্ন ইত্যাদি ঠিক করিয়া বিবাহের দিন ধার্য করা হয়। বিবাহের তিন দিন বরের বাড়ীতে বিরিসির সমস্ত লোক এবং উর-পেডা কারিজি ও সাম্মিটোড়ুর

পাত পড়ে। বিবাহ বরের বাড়ীতে হয়, কনের বাড়ীতে হয় না। কনের বাড়ীতে তাহার বিরিসির লোকের জন্য পাত মাত্র একদিন পড়ে, তাহার বেশি নয়।

যে-রাত্রে বিবাহের কাজ আরম্ভ হয় সেদিন উর-পেডা বরের কব্জিতে একটি হলুদ ও একটি পান সুতা দিয়া বাঁধিয়া দেন। তাহার পরদিন তত্ত্ব সঙ্গে করিয়া বিরিসির একটি মেয়ে হলুদ বাটা, হলদে কাপড়, তিলের তেল, কুঙ্কুম, নারিকেল, দর্পণ প্রভৃতি লইয়া সাম্নিটৌড় বা বা গ্রামের চাপরাসীকে সঙ্গে লইয়া কনেকে বাপের বাড়ী হইতে আনিতে যায়। কন্যা শ্বশুরবাড়ির কুঙ্কুম ও কাপড় পরিয়া, গায়ে হলুদ মাখিয়া বরের বাড়ীতে পৌছায়। বাড়ী হইতে আসিবার সময়ে সে আঁচলে কিছু চাল এবং একটি আস্ত নারিকেল লইয়া আসে। এই অবস্থায় সে বরের বাড়ী পৌঁছিয়া সম্মুখের দরজা দিয়া না ঢুকিয়া খিড়কি দরজা দিয়া প্রবেশ করে।

এইবার বরকন্যার কামান এবং স্নানের জন্য মেয়েরা দূরে কোনও পুষ্করিণী বা কূয়া হইতে জল আনিতে যায়। জল আসিলে বর ও কনেকে নারিকেলপাতায় ছাওয়া শামিয়ানার তলায় পিঁড়িতে বসাইয়া নাপিত নখ কাটিয়া স্নান করাইয়া দেয়। বর ও কনের বিরিসির মেয়েরা উভয়ের গায়ে তেল, হলুদ এবং বিরি কলাই বাটা মাখাইয়া তাহাদের স্নান করাইয়া দেয়। বরকনের সম্মুখে ধান ও উদুখল রাখা হয় এবং ভবিষ্যতে কনেকে যে ধান ভানিয়া সংসার চালাইতে হইবে এখানে তাহারই ইঙ্গিত করা হয়।

ইহার পর ব্রাহ্মণ আসে। মুলিয়াদের কাজকর্মে শুধু এইখানেই ব্রাহ্মণকে দেখা যায়। মৃত্যুর পর তাহাদের মধ্যে বৈষ্ণব আসে, ব্রাহ্মণ আসে না। কিন্তু ব্রাহ্মণ না হইলে বিবাহ নিষ্পন্ন হয় না।

ব্রাহ্মণ বর কনেকে পাশাপাশি বসাইয়া একবার বরের হাত কনের হাতের উপর রাখিয়া মন্ত্র পড়ে, আবার কনের হাত বরের হাতের উপরে রাখিয়া মন্ত্র পড়ে। তাহার পর উর-পেডা অর্থাৎ গ্রামের অগ্রণী বরের মাথায় একটি পাগড়ি বাঁধিয়া দেয় এবং ব্রাহ্মণ বর এবং কনে দুজনের গলায় দুইটি পৈতা পরাইয়া দেয়। বোধ হয় এইভাবে কিছুক্ষণের জন্য বরকনেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে অভিষিক্ত করা হয়।

পৈতার পর ব্রাহ্মণ কুশ দিয়া উভয়ের হাত বাঁধিয়া দেয়। সঙ্কল্প ও পূজাদির পর বরের কাপড় ছাড়াইয়া ঘোড়ায় চড়াইয়া উভয়কে একবার গ্রামের মধ্যে ঘুরাইয়া আনা হয়। কনে সামনে বসে, বর পিছনে। কিন্তু কনে বড় হইলে সচরাচর বরের সঙ্গে হাঁটিয়া যায়। উভয়ে ঘুরিয়া আসিলে নারিকেলমণ্ডপে উভয়কে বসাইয়া গাঁটছড়া বাধা হয়। গাঁটছড়ার মধ্যে দুইটি সুপারি ও দুইটি পয়সা থাকে। তাহার পর বর ও কনে উভয়ে আঁচলে চাল লইয়া পরস্পরের মাথার উপরে তাহা ছড়াইয়া দেয়।

এইবার বরকনে দেখিবার পালা। উভয় পক্ষের বন্ধুবান্ধব বরকনের মুখ দর্শন করিয়া কেহ এক টাকা, কেহ দুই টাকা, কেহ বা দশ টাকা দিয়া আশীবাদ করিয়া যায়। ইহাতে এত টাকা জমে যে, আগাগোড়া বিবাহের খরচ ইহা হইতেই উঠিয়া যায়। কিন্তু সমাজের নিয়ম অনুসারে কে কত দিল তাহার সঠিক হিসাব রাখিতে হয়। তাহার পর তাহার বাড়ীতে আবার বিবাহের সময় ঠিক তত টাকা দিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিতে হয়। এইভাবে একজন লোক হয়ত দশ বাড়ীতে দশ বৎসরের মধ্যে একশত টাকা দিয়াছে। তাহার সুবিধা হইল, সে আবার নিজের বাড়ীর কাজের সময়ে সেই টাকা এবং হয়ত কিছু বেশী টাকা ফেরৎ পায়।

লৌকিকতার এই প্রথাটি কতকটা বিবাহ ইনসিওরেন্সের মত ব্যাপার। ইহার ফলে বিবাহের খরচটা নুলিয়াদের কোন দিন গায়ে লাগে না। কেবল দানের গহনাপত্রের খরচটা বরপক্ষকে অন্য ভাবে যোগাইতে হয়।

যাহা হউক, বিবাহের পরদিন খুব ঘটা করিয়া বরকনেকে শহর ঘুরান হয়। ফিরিয়া আসলে বরের ছোটভাই দাদার ও বৌদির পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়। সে নানারকম আপত্তি করে, ঠাট্টা করে, শেষে দাদার কাছে বিবাহ দেওয়াইবার প্রতিজ্ঞা পাইলে তবে দ্বার ছাড়িয়া দেয়। ঘরে ঢুকিয়া বরকনেকে একটি ঘড়ার মধ্য হইতে সোনার ও রূপার আংটি খুঁজিতে দেওয়া হয়। যে সোনারটি পাইবে তাহার বরাত ভাল, এবং যে রূপার পাইবে তাহার অপেক্ষাকৃত মন্দ বলিয়া নুলিয়াদের বিশ্বাস।

বিবাহের তিনদিন বাদ দিয়া একটি ভাল যোগলগ্ন দেখিয়া বর শ্বশুরবাড়ীতে যায় এবং সেখানে তাহার স্ত্রীকে রাখিয়া চলিয়া আসে। কিছুকাল পরে তাহার স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের সংস্কার হইলে তবে সে তাহাকে ঘরে আনিয়া সংসার করে।

ইহাই হইল নুলিয়াদের বিবাহের সাধারণ নিয়ম। কিন্তু বিধবা অথবা ত্যক্তা স্ত্রীর সহিত যখন বিবাহ হয়, তখন এত ঘটা কোনদিনই করা হয় না। তখন শুধু কয়েকজন ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া কুঙ্কুম, বস্ত্রাদি লইয়া বরকর্তা কন্যাকে তাহার পিত্রালয় হইতে লইয়া আসেন, তাহাতেই বিবাহ সিদ্ধ হয়।

নুলিয়াদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদ আছে। বিচ্ছেদের জন্য খ্রীষ্টান আইনের মত কোনও দোষ দেখাইবার প্রয়োজন হয় না। পরস্পরের মনের মিল নাই, এমন কারণেও বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিতে পারে। কিন্তু

কোন পক্ষ বিচ্ছেদ চাহিলে পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া পঞ্চায়েতের ফি পনর টাকা দিতে হয়, এবং যে পক্ষ বিচ্ছেদ চায় তাহাকে আরও পঞ্চাশ টাকা অপর পক্ষকে খেসারৎস্বরূপ দান করিতে হয়। কিন্তু যদি পঞ্চায়েতের বিবেচনায় বিচ্ছেদের যথেষ্ট কারণ থাকে, তাহা হইলে কোনও টাকা না-ও লওয়া যাইতে পারে। ধরা যাউক, স্ত্রী স্বামীর মারধর সহিতে না পারিয়া বিচ্ছেদ চাহিতেছে। তখন হয়ত তাহার সমস্ত জরিমানা মাপ করা হয়; এমন কি তাহার পয়সা না থাকিলে পঞ্চায়েতী পাওনা পনর টাকা পর্যন্ত মকুব করিয়া দেওয়া হয়।

যে সকল ক্ষেত্রে জরিমানা হয়, সেখানেও এককালীন টাকা দিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। অনেক ক্ষেত্রে কিস্তিবন্দীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এই সকল সুবিধা থাকার জন্য পুরীর নুলিয়া-বস্তিতে প্রতি বৎসর চার-পাঁচটি করিয়া বিবাহবিচ্ছেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে তাহাদের বিবাহিত জীবন যে অসুখী তাহা বলা চলে না; বরং তাহারা মোটের উপর বর্ণহিন্দুদের চেয়ে সুখে সংসার করে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

নুলিয়াদের মধ্যে বিধবা-বিবাহও প্রচলিত আছে। বিধবা স্বাধীনভাবে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বামীর পুত্রকন্যা ছাড়িয়া তাহাকে চলিয়া যাইতে হয় এবং যাইবার সময়ে সে পিতৃগৃহ হইতে যে গহনা আনিয়াছিল, শুধু তাহাই লইয়া যাইতে পারে। পুত্র স্বামীর, স্ত্রীর নহে। এই জন্য স্বামী বর্তমানে যদি কোনও স্ত্রীলোক বিবাহবিচ্ছেদ ঘটায় তাহা হইলে তাহাকেও পুত্রকন্যা ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হয়। তবে শিশু থাকিলে সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং যতদিন না শিশু বড় হয়, ততদিন নিজের কাছে রাখিতে পারে। বড় হইলে তাহাকে পূর্বস্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিতে হয়

এবং তখন সে পুত্রের পিতার নিকট এতদিনের ভরণ-পোষণের ন্যায্য মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিবাহবিচ্ছেদ ঘটিলে বা বিধবা অন্যত্র বিবাহ করিলে তাহার স্বামীর সম্পত্তির উপর সকল অধিকার চলিয়া যায়। বিধবা কিন্তু ইচ্ছা করিলে দেবরের সহিত স্ত্রীরূপে বাস করিতে পারে। এরূপ বিবাহ সমাজে সিদ্ধ হইলেও তাহার যে খুব প্রচলন আছে তাহা মনে হয় না। দেবরের বিধবা ভ্রাতৃবধুর উপর কোনও দাবি নাই। অপরে তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে দেবর যে কিছু খেসারৎ পাইবে এমন কোনও নিয়ম নাই। যাহা হউক, এরূপ বিবাহ যে নুলিয়াসমাজে প্রচলিত আছে, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহের মত বহুবিবাহের নিয়মও নুলিয়াসমাজে বর্ত্তমান আছে। প্রথম স্ত্রীর সন্তান না হইলে আইনত নুলিয়ারা দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে না। তখন একজনের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া তবে সে অপর স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। এক সঙ্গে দুই জনের বেশী স্ত্রী থাকিতে পারে না, কিন্তু তাহাও বাস্তবক্ষেত্রে খুব বিরল বলা যাইতে পারে। কেবল একটি ক্ষেত্রে পুরীতে এইরূপ বিবাহ হইয়াছিল, তাহারই কথা বলিতেছি। তাহা হইতে নুলিয়াসমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থার অনেকটা পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ঘটনাটি বেশী দিনের নয় এবং তাহার নায়কেরা সকলেই আমার সুপরিচিত। সেইজন্য প্রকৃত নাম গোপন রাখিয়া ঘটনাটি বিবৃত করিতেছি। পলাম্মা নাম্নী কোনও একটি বালিকা রামাইয়া নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। রামাইয়ার বিবাহ পূর্বেই হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্ত্রী লইয়া সুখেই

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। উভয় পরিবারের কর্তাদের মধ্যে কিন্তু সদ্ভাব ছিল না, এমন কি যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল বলা যাইতে পারে। পলাম্মা সুন্দরী এবং ধনীর সন্তান, সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব হয় নাই। কিন্তু সেই যে সে রামাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া ধরিয়া বসিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলান গেল না। তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক তন্ত্রমন্ত্র করিলেন, শেষে মারধরও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

অবশেষে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যার অসম্মতি সত্ত্বেও তাহার অন্যত্র বিবাহ দিলেন। কিন্তু পলাম্মা কিছুতেই স্বামীর বাড়ী যাইত না। অবশেষে পঞ্চায়েৎ সে-বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইল. পলাম্মার পিতা বরপক্ষকে যাবতীয় দানের সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পলাম্মা যাহাতে রামাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সে রহিল না। তখন তিনি রাত্রে, বিশেষ করিয়া আমোদ-উৎসবের রাত্রে, বাড়ীর চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতেন। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কিন্তু পলাম্মা রামাইয়ার বাড়ীতে খবর পাঠাইল যে, যদি তাহার বিবাহ দেওয়া না হয় তবে সে জোর করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে লোকে যাই বলে বলুক না কেন। গ্রামের লোক অবশেষে রামাইয়ার পিতার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। পলাম্মার পিতা ত প্রস্তাব শুনিলেনই না, উপরন্তু ভদ্রলোকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিন্তু কিছু হইল না। ইতিমধ্যে রামাইয়ার শ্বশুর স্বীয় কন্যার দুঃখের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া

গেলেন, আর পাঠাইলেন না। রামাইয়া বহু চেষ্টা স্বত্বেও স্ত্রীকে আনিতে না পারিয়া শেষে একদিন সবান্ধবে শ্বশুরের বাড়ী পৌছিল। শ্বশুর তাহার নির্দোষিতা শুনিয়াও কিছুতেই কন্যাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন।

রামাইয়ারও ইচ্ছা নাই, তাহার স্ত্রীরও সম্পূর্ণ আপত্তি; তবু কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুরা টাকা দিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে সে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিয়া গেল, রামাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইল, কিন্তু সে সে-সকল কিছু না লইয়া তাহার স্ত্রীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী যাইতেছে বলিয়া গেল, কিন্তু শেষে তাহার এক বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া কয়েকদিন বাস করিল। সেইখানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে একদিন তাহার স্ত্রীর সহিত গোপনে চরের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করিল। তাহার স্ত্রী পিতামাতার কাছে শান্তশিষ্ট ভাবে কয়েকদিন থাকিয়া একদিন ভিন্ন গ্রামে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। হাটে অবশ্য গেল, কিন্তু হাট হইতে সে স্বামীর সহিত পলায়ন করিল এবং তাহার পর হইতে আর পিত্রালয়ের দিকে যায় নাই।

রামাইয়ার স্ত্রী পলাম্মার প্রেমের কথা সবই জানিত, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এদিকে পলাম্মার জিদ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই যখন একদিন সে রামাইয়ার বাড়ী আসিয়া বাসা বাঁধিবে এমন ভয় দেখাইল, এবং গ্রামের লোকজনও তাঁহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইলেন। রামাইয়ার পিতা লোকজন পাঠাইয়া নূতন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন এবং সেই অবধি

সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছিল। উভয় পরিবারের কর্তাদের মধ্যে কিন্তু সদ্ভাব ছিল না, এমন কি যথেষ্ট মনোমালিন্য ছিল বলা যাইতে পারে। পলাম্মা সুন্দরী এবং ধনীর সন্তান, সুতরাং তাহার পাত্রের অভাব হয় নাই। কিন্তু সেই যে সে রামাইয়াকে বিবাহ করিবে বলিয়া ধরিয়া বসিল, তাহাকে আর কিছুতেই টলান গেল না। তাহার পিতা তাহাকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন, অনেক তন্ত্রমন্ত্র করিলেন, শেষে মারধরও করিলেন, কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

অবশেষে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যার অসম্মতি সত্ত্বেও তাহার অন্যত্র বিবাহ দিলেন। কিন্তু পলাম্মা কিছুতেই স্বামীর বাড়ী যাইত না। অবশেষে পঞ্চায়েৎ সে-বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে বাধ্য হইল, পলাম্মার পিতা বরপক্ষকে যাবতীয় দানের সামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন।

এদিকে পলাম্মা যাহাতে রামাইয়ার সঙ্গে দেখা করিতে না পারে, তাহার জন্য তিনি সতত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাকে অন্য গ্রামে পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু সে রহিল না। তখন তিনি রাত্রে, বিশেষ করিয়া আমোদ-উৎসবের রাত্রে, বাড়ীর চারিদিকে লাঠি লইয়া পাহারা দিতেন। এমনি ভাবে কিছু দিন গেল। কিন্তু পলাম্মা রামাইয়ার বাড়ীতে খবর পাঠাইল যে, যদি তাহার বিবাহ দেওয়া না হয় তবে সে জোর করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিবে, তাহাতে লোকে যাই বলে বলুক না কেন। গ্রামের লোক অবশেষে রামাইয়ার পিতার দ্বারা বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইল। পলাম্মার পিতা ত প্রস্তাব শুনিলেনই না, উপরন্তু ভদ্রলোকদের অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

ইহাতেও কিন্তু কিছু হইল না। ইতিমধ্যে রামাইয়ার শ্বশুর স্বীয় কন্যার দুঃখের দিন আসিতেছে ভাবিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া

গেলেন, আর পাঠাইলেন না। রামাইয়া বহু চেষ্টা স্বত্ত্বেও স্ত্রীকে আনিতে না পারিয়া শেষে একদিন সবান্ধবে শ্বশুরের বাড়ী পৌঁছিল। শ্বশুর তাহার নির্দোষিতা শুনিয়াও কিছুতেই কন্যাকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু পঞ্চায়েৎ ডাকিয়া বিবাহবিচ্ছেদের প্রস্তাব করিলেন।

রামাইয়ারও ইচ্ছা নাই, তাহার স্ত্রীরও সম্পূর্ণ আপত্তি; তবু কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পুরা টাকা দিয়া অনেক করিয়া রামাইয়ার মুখ দিয়া বাহির করা হইল যে সে বিবাহ ভাঙিয়া দিতে প্রস্তুত আছে। বিবাহ ভাঙিয়া গেল, রামাইয়া যথেষ্ট টাকা পাইল, কিন্তু সে সে-সকল কিছু না লইয়া তাহার স্ত্রীকে দান করিয়া চলিয়া গেল। পুরী যাইতেছে বলিয়া গেল, কিন্তু শেষে তাহার এক বন্ধুর পরামর্শে পার্শ্ববর্তী গ্রামে গিয়া কয়েকদিন বাস করিল। সেইখানে থাকিতে থাকিতে অবশেষে একদিন তাহার স্ত্রীর সহিত গোপনে চরের সাহায্যে ষড়যন্ত্র করিল। তাহার স্ত্রী পিতামাতার কাছে শান্তশিষ্ট ভাবে কয়েকদিন থাকিয়া একদিন ভিন্ন গ্রামে হাটে যাইবার অনুমতি চাহিল। হাটে অবশ্য গেল, কিন্তু হাট হইতে সে স্বামীর সহিত পলায়ন করিল এবং তাহার পর হইতে আর পিত্রালয়ের দিকে যায় নাই।

রামাইয়ার স্ত্রী পলাম্মার প্রেমের কথা সবই জানিত, কিন্তু তাহাতেও তাহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। এদিকে পলাম্মার জিদ ক্রমশ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে বাস্তবিকই যখন একদিন সে রামাইয়ার বাড়ী আসিয়া বাসা বাঁধিবে এমন ভয় দেখাইল, এবং গ্রামের লোকজনও তাঁহাকে ধরাধরি করিতে লাগিল, তখন বাধ্য হইয়া তাহার পিতা বিবাহে স্বীকৃত হইলেন। রামাইয়ার পিতা লোকজন পাঠাইয়া নূতন স্ত্রীকে গ্রহণ করিলেন এবং সেই অবধি

উভয়ে একত্র বাস করিতেছে। যতদূর জানি উভয়ের মধ্যে কোন কলহ নাই এবং উভয়ে সুখে একত্র বসবাস করিতেছে।

এরূপ ঘটনা নুলিয়া সমাজে বিরল হইলেও উহা হইতে সে সমাজে নারীর স্থান অনেকাংশ বুঝা যায়। পিতামাতার যেমন জোর করিয়া বিবাহ দিবার অধিকার আছে, নারীরও তেমনই সে অধিকার ভাঙিবার ক্ষমতা আছে। সমাজের মর্যাদা রক্ষার দিকে পিতামাতার যেমন দৃষ্টি আছে, সামাজিক ঠাট বজায় রাখিবার জন্ম তাহাদের যেমন চেষ্টা আছে, মানুষকে সুখী করিবার, তাহার স্বাধীনতাকে স্বীকার করিবারও তেমনি একটা ইচ্ছা সমাজের দিকেও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাতে নারীকে যেমন মর্যাদা দিয়াছে, তেমনই তাহার চরিত্রকে স্বাভাবিক ভাবে পুষ্ট হইবার আরও সুযোগ দিয়াছে।

ইহার সাক্ষাৎ কারণ আবিষ্কার করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। নুলিয়ারা মাছ ধরিয়া যাহা রোজগার করে তাহা মদ খাইতে, সখের জিনিষপত্র কিনিতে ও মহাজনের পাওনা মিটাইতে খরচ হইয়া যায়। বাস্তবিক সংসার চালায় মেয়েরা। তাহারা মজুরি করে, ইট বহিয়া, বালি বহিয়া ঘরে পয়সা আনে এবং সেই পয়সায় সংসারের খরচপত্র চলে। অন্নের জন্ম তাহারা স্বামীর উপর নির্ভর করে না। এরূপ ক্ষেত্রে তাহাদের স্বাধীনতা সমাজেও যে স্বীকৃত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

"অবনত" জাতির সামাজিক আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর হরিজন আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর হইতে জাতিভেদ ও জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত আচার-বিচার সম্বন্ধে আমরা যেন আরও সজাগ হইয়া উঠিয়াছি। কিছুকাল পূর্বে বীরভূম জেলায় একটি গ্রামে মুচিদের মধ্যে এই জিনিষটির পরিচয় পাইয়াছিলাম। হরিজন আন্দোলনের ঢেউ এই গ্রামে আসিয়া পৌছিলে গ্রামের মুচিরা একত্র হইয়া কতকগুলি সংকল্প করিল। এই সংকল্পগুলির মধ্যে ছিল, তাহারা মদ ছাড়িয়া দিবে, প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলায় হরিনাম সংকীর্তন করিবে, মরা গরুর মাংস খাইবে না, এবং ছেলেদের লেখাপড়া শিখাইবে। এমন কি তাহাদের মধ্যে একজন মাতব্বর ব্যক্তি এ প্রস্তাবও করিলেন, মুচিজাতি আর মরা গরুর চামড়া ছাড়াইবে না, চাষবাসের শুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিবে।

এই আন্দোলনের স্বরূপ বুঝিতে হইলে অবনত জাতিভেদের পূর্ব্ব ইতিহাস একটু জানা দরকার। বাঙলাদেশে রেলগাড়ি হওয়ার পর হইতে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের চামড়া সরাসরি কলিকাতার বাজারে চালান হইতে আরম্ভ করে। ইহাতে মুচিদের ব্যবসায় খুব ঘা খাইয়াছিল। তাহা ছাড়া, একদিকে কলিকাতা হইতে সস্তা জুতা আমদানি হওয়ায় এবং অপরদিকে বিহারের পরিশ্রমী মুচিরা পশ্চিম বাঙলার বাজারগুলি ছাইয়া ফেলায় বাঙালী মুচি বড়ই দুর্দশায় পড়িয়াছিল। অনেকে জাতিগত ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া চাষবাসের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার ফলে অন্যান্য চাষীজাতিগুলির সহিত

তাহাদের যে-সকল আচারগত পার্থক্য ছিল, সেগুলি ক্রমশ লোপ পাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তবুও মুচি বলিয়া ইহাদের অপবাদ ঘুচে নাই এবং অস্পৃশ্যবোধে সমাজ ইহাদিগকে কামার, কুমার প্রভৃতি কারুজীবী জাতির সমান কখনও মনে করে নাই। কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে মুচিদের মধ্যে আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে ও ইহারা সমাজের অন্যান্য জাতির নিকট সমান মর্যাদা দাবি করিতেছে।

বাঙলাদেশে মুচি, কৈবর্ত, হাড়ি, ডোম প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নজাতির মধ্যে এমন কতকগুলি প্রথা আছে যাহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতির মধ্যে নাই। 'অবনত' জাতিগুলির মধ্যে কেহ কেহ গোমাংস ভক্ষণ করে, মুরগী ও শূকর পালন করে এবং তাহাদের মাংস খায়; অনেকের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ অথবা দেবার্চনাতে কেহ কেহ নিয়মিতভাবে মদ্যপান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ কায়স্থ, অর্থাৎ সমাজে সম্মান যাহাদের বেশি, তাহাদের মধ্যে এ সকল প্রথা নাই। সেইজন্য যখন অবনত জাতিগণের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ জাগিয়া উঠে, যখন তাহাদের সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আকাঙ্ক্ষা হয়, তখন তাহারা স্বভাবত ধারণা করিয়া লয়, তাহাদের বর্ণগত আচারকে শুদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রতিষ্ঠাশালী ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের আচারের অনুকরণ করিতে হইবে। ইহারই ফলে বীরভূম জেলায় মুচিদের মধ্যে হরিজন আন্দোলন আচারশুদ্ধির আকার গ্রহণ করিয়াছে। ইহারই ফলে মুচিরা মদ্য এবং গোমাংস পরিহারের সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার কাজ বর্জন করিবার ইচ্ছা করিয়াছে, এবং এই কারণেই কৈবর্তগণও হঠাৎ বিধবাবিবাহ বন্ধ করিয়া উচ্চজাতির মত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

বাঙলাদেশে হরিজন সেবকসঙ্ঘের দুই তিন বৎসরের কাজের সন্ধান লইলে জানা যায় যে, অবনত জাতিদের মধ্যে শিক্ষার জন্য একটি প্রবল আগ্রহ জন্মিয়াছে। হাড়ি, পোদ, ডোম, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতির ছাত্রগণ স্কুলে লেখাপড়া সাঙ্গ করিয়া কলেজে ভর্তি হইতে চায় এবং তাহার জন্য অবিরাম আর্থিক সাহায্যের দরখাস্ত করে। দরখাস্তের সংখ্যা এত বেশি হইয়া দাঁড়ায় যে হরিজন সেবকসঙ্ঘকে বিশেষ বিব্রত হইয়া উঠিতে হয়। শুধু তাহাই নয়। প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে সেবকসঙ্ঘের নিকট হঠাৎ সংবাদ আসিল, ফরিদপুর জেলায় বারুজীবি জাতি উপবীত ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং এ-বিষয়ে তাহারা সঙ্ঘের সহানুভূতি এবং অনুমোদন প্রার্থনা করে। বাঙলাদেশের বাহিরেও অবনত জাতিদের উচ্চজাতি বলিয়া পরিগণিত হইবার ইচ্ছা দেখা দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে রাজপুতানা এবং যুক্তপ্রদেশের নাপিতগণ স্বীয় জাতির ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণের চেষ্টা করিতেছে; কেহ কেহ উপবীত ধারণও করিয়াছে। এই ঢেউ বাঙলাদেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং ফলে পূর্ববঙ্গের নাপিত সমাজের কেহ কেহ ব্রাহ্মণত্বের দাবি জানাইয়া উপবীত ধারণ করিতেছে। কেহ বা অতদূর ভরসা না করিয়া স্বগ্রাম হইতে দূরে কোনও সহরে গিয়া পদবী পরিবর্তন করিয়া 'ভদ্রলোকে'র মত বাস করিতেছে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া প্রাচীন জাতিভেদ প্রথা ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। হরিজন আন্দোলন এই পরিবর্তনেরই একটি অংশ। অজ্ঞাতসারে এবং ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজের মধ্যে যে সকল পরিবর্তন সাধিত হইতেছিল, এই আন্দোলনের ফলে তাহাই সজ্ঞানে এবং আরও দ্রুতভাবে সাধিত হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, বরং আনন্দ করিবার মত জিনিষ আছে।

কিন্তু আশ্চর্য না হইলেও আমাদের একটি বিষয়ে সর্বদা দৃষ্টি রাখা উচিত; আন্দোলন যে পথ লইয়াছে তাহা মঙ্গলের কি-না, জাতির এবং সমগ্র দেশের পক্ষে তাহা শেষ পর্যন্ত কল্যাণকর কি-না, সেদিক হইতে অবনত জাতিগণের মধ্যে যে সকল সংস্কার চেষ্টা চলিতেছে আমরা তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার খোরাক পাই। এমন কি আমরা যদি যথেষ্ট তৎপর না হই, তাহা হইলে ভবিষ্যতে সমাজের বহু অকল্যাণ হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায় হইবে না।

আমরা দেখিয়াছি মুচি, হাড়ি, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতিগণের মধ্যে 'ভদ্রলোক' হইবার প্রবল বাসনা জাগিয়াছে। তাহাদের আত্ম-সম্মানবোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং সামাজিক মর্যাদা অর্জন করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু প্রকৃত মর্যাদা এক জিনিষ এবং ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতির আচার অনুকরণ করা অন্য জিনিষ। ব্রাহ্মণ কায়স্থের মধ্যে অনুকরণযোগ্য বহু আচার থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কুসংস্কারেরও অপ্রাচুর্য নাই। ব্রাহ্মণদের সকল আচারকে যেমন নির্বিচারে সৎ বলা চলে না, অবনত জাতির সকল ব্যবহারকেও তেমনই নির্বিচারে অসৎ বলা যায় না। ধরুন, বিধবা-বিবাহের কথা। সহজেই বলা যাইতে পারে, বিধবা-বিবাহ ভাল, অন্তত সমাজের দিক হইতে বর্তমান অবস্থায় এরূপ বিবাহে কোনও বাধা থাকা উচিত নয়। তেমনই অনুরোধপ্রথাও বহু অবনত জাতির মধ্যে নাই। অথচ যখন 'ভদ্র' হইবার চেষ্টায় তাহারা সৎপথটিকে বর্জন ও অসৎটিকে গ্রহণ করে, তখন তাহাদের ভাল বলা যায় কেমন করিয়া? এই অন্ধ অনুকরণের মূল কোথায়?

বাঙলাদেশের কিছুকাল আগেকার ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা এমন কতগুলি ঘটনা দেখি যাহা মূলত গুরুতর হইলেও যাহার

মধ্যে হাস্যরসের উপাদানের অভাব নাই। বাঙলাদেশে সে সময়ে ইংরেজ শক্তিশালী, বাঙালী দুর্বল। শক্তিমান বলিতে ইংরেজকেই বুঝাইত। এমন অবস্থায় বাঙালী শক্তিসাধনার চেষ্টায় এক সময়ে হঠাৎ ঠিক করিয়া বসিয়াছিল, ইংরেজ গরুর মাংস খায় ও মদ্য পান করে, তাই তাহাদের শক্তি। অমনি শক্তিলাভের চেষ্টায় রাত্রে গোলদীঘির বেড়া টপকাইয়া শক্তিকামী বাঙালীসন্তান লুকাইয়া মদ্যপান ও গোমাংস ভক্ষণ করিতে লাগিয়া গেল। মুসলমান যে সময়ে দেশের রাজা, তখনও তেমনই পদদলিত হিন্দুদের মধ্যে মুসলমানী আচার ব্যবহারের প্রতি প্রবল মোহ আসিয়া পড়িয়াছিল। উগ্র একেশ্বরবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমানী খানাপিনা, দিল্লী-দরবারের মত পোষাক পরিচ্ছদ, পর্দা, আদবকায়দা, সবই একসময়ে হিন্দুসমাজকে অভিভুত করিয়াছিল। আজ মুসলমান শাসকগণের শক্তি গিয়াছে, ইংরেজের শক্তি বাড়িয়াছে। তাই পায়জামার বদলে প্যাণ্টালুনের কদর বাড়িয়াছে, মুসলমানী খানার বদলে অজ্ঞাতসারে ইংরেজী খাদ্য বাংলাদেশে প্রসার লাভ করিতেছে, একেশ্বরবাদের চেয়ে গণতন্ত্রের দিকে লোকের ঝোঁক বেশি দেখা যাইতেছে।

হরিজনগণ 'ভদ্র' হইবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থগণের আচার-ব্যবহারকে যে নির্বিচারে অনুকরণ করিতেছে তাহার মূলেও সেই শক্তিপূজা রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত হইবার, চাকুরি করিবার, গোমাংস বর্জন করিবার, বিধবাবিবাহ নিরোধ করিবার অথবা নরনারীর সম্পর্ক সম্বন্ধে নূতন একটি 'শুচিতা' সৃষ্টি করিবার যে প্রয়াস দেখা যাইতেছে, তাহা অন্ধের শক্তিপূজা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অন্ধত্বের কারণ হরিজনগণ আজও আসলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ অপেক্ষা নিজেদের হীন বলিয়া মনে করে। তাই মর্যাদালাভের চেষ্টায় তাহারা ব্যস্ত হইয়া শুদ্ধির পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

শক্তিসাধনায় কোনদিনই দোষ নাই, কিন্তু অন্ধ হওয়ায় দোষ আছে। আমরা এই বিপদের কথাই পূর্বে বলিয়াছি। অন্ধের মুক্তি নাই। 'অবনত' ও দরিদ্র জাতিগুলি যখন সামাজিক মর্যাদা লাভের চেষ্টায় বিধবাবিবাহ পরিহার করে, তখন তাহারা উহার দোষগুণ বিচার করিয়া দেখে না, করিলে দেখিত ঐ বিষয়ে তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাদের নারীজাতি এক বিষয়ে উচ্চ-শ্রেণীর নারীজাতি অপেক্ষা সুখী। শিক্ষালাভের চেষ্টায় দোষ নাই, কিন্তু তাহারা নানাবিধ বৃত্তি ত্যাগ করিয়া চাকুরির দিকে ছুটিতেছে, কায়িকশ্রমকে গ্লানি বলিয়া বিবেচনা করিতেছে। অথচ তাহারা পরোপজীবী ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের কথা ভাবিয়া দেখিতেছে না। শক্তির সাধনা ভাল হইতে পারে, কিন্তু অন্ধভাবে তাহা অনুসরণ করা উচিত নয়।

বাংলার অবনত সমাজ শিক্ষার অভাবে এবং আভ্যন্তরিক দুর্বলতার জন্য আজ অন্ধ হইয়া আছে। সেইজন্য সমাজসংস্কার করিতে গিয়া 'ভদ্র' হইবার চেষ্টা করিয়া তাহারা অকল্যাণের পথ গ্রহণ করিয়াছে। যদি অবনত জাতির মত শিক্ষিত সমাজও, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণও, আজ অন্ধ হইয়া বসিয়া থাকে, তবে তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কিছু হইতে পারে না। হরিজন সম্প্রদায়ের সংস্কার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিয়া ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণের নিকট সুপ্ত দাসত্ব হইতে তাহাদের মুক্ত করিতে হইবে, হাতের কাজের মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে হইবে। হয়ত ইহার জন্য মুচির কাজ, কামারের কাজ, ছুতারের কাজ, সব বৃত্তিকেই উন্নত প্রণালীর করিয়া তুলিতে হইবে। যেমন করিয়াই হউক, পরশ্রমোপজীবী সমাজের কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে অবনত জাতির মনকে মুক্ত করিতে হইবে। আর যদি

আমরা তাহা করিতে না পারি, এ বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে থাকি ও স্রোতে তৃণের মত গা ভাসাইয়া নিশ্চেষ্ট দর্শক মাত্র হইয়া থাকি, তাহা হইলে অবনত জাতির ভবিষ্যতের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎও যে অন্ধকার হইয়া আসিবে তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রাচীন হিন্দুসমাজের আদর্শ

য়ুরোপে সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আমরা একটি আদর্শের পরিচয় পাই। মানুষের জন্যই সমাজ অথবা রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির প্রচ্ছন্ন বৃত্তিগুলিকে প্রস্ফুটিত হইবার সুযোগ দেওয়া সমাজব্যবস্থার উদ্দেশ্য। আদর্শ অবস্থায় প্রতি মানুষ স্বীয় স্বাভাবিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া থাকিবে, অথচ কেহ কাহারও সহিত বিরোধ করিবে না এবং পরস্পরের ব্যক্তিত্ববিকাশে বাধা ঘটাইবে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য সুযোগের সন্ধান করিবার অধিকার সকল মানুষের আছে বলিয়া য়ুরোপ স্বীকার করে।

বিজ্ঞানচর্চার প্রভাবে য়ুরোপের বাহুশক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাহার সাহায্যে স্বীয় ভোগপ্রবণ সভ্যতাকে বিস্তার করিয়া য়ুরোপ-বাসিগণ জগতের বহু জাতিকে পরাধীন রাখিয়া তাহাদের প্রভূত অকল্যাণ করিয়াছে। এইরূপে যে পন্থা ঘটনাচক্রে য়ুরোপ বস্তুতঃ গ্রহণ করিয়াছে তাহা দেশের আদর্শের বিপরীত। শক্তির মত্ততায় ও বিজিত জাতির প্রতি অবজ্ঞায় তাহারা মানবজাতিকে ছোট করিয়া দেখিতেছে। এইরূপে সাধনার ক্ষেত্রে য়ুরোপের আদর্শ সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহার জন্য য়ুরোপীয় সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার আদর্শকে ছোট করিয়া দেখিবার কোন কারণ নাই। ক্ষেত্রের দোষে যদি ধর্মসাধনা মলিন হয় তবে তাহার জন্য ধর্ম বা আদর্শ দায়ী হইতে পারে না।

য়ুরোপের সহিত তুলনা করিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষে সমাজগঠনের মধ্যে আমরা কয়েকটি আদর্শের সন্ধান পাই। মধ্য যুগে বিকৃত খ্রীষ্টীয়ধর্মের অত্যাচার হইতে ব্যক্তিকে বাঁচাইবার চেষ্টায় য়ুরোপ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের

আদর্শ লাভ করিয়াছিল; তেমনি পুরাতন ভারতবর্ষে বহু সভ্যতার সংঘাতের ক্ষেত্রে মানুষ সাম্যের সন্ধান পাইয়াছিল। সকল পন্থাই শেষে ব্যক্তিকে একই প্রদেশে লইয়া যায় এ জ্ঞান ভারতবর্ষেই মানুষ সম্যক্‌ভাবে লাভ করিয়াছিল। ভারতের সমাজস্রষ্টাগণও ঐ আদর্শের বশে সকল সভ্যতার অধিকার মানিয়া, তাহাদের বিশিষ্টতা বজায় রাখিয়া তাহাদের সমন্বিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

হাড়ি, ডোম প্রভৃতি যে সকল জাতি পূর্বে কোল ভীলদের সমশ্রেণী ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণের ধারণা জন্মিয়াছে, তাহারা স্বীয় আচারধর্ম আংশিকভাবে বজায় রাখিয়াও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইতেছে। হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মারাঠী, তেলুগু, তামিল সকলে হিন্দু হইয়াও আহারে, বিহারে, লোকাচার পালনে স্বতন্ত্র। কিন্তু জগতের অন্যান্য দেশে যাহারা নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টিয়ান অথবা মুসলমান হইয়াছে তাহাদের খাওয়া পরা, আচার ব্যবহার আমূল পরিবর্তিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে সকল পথের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল বলিয়াই আজ এত পন্থার অস্তিত্ব ও হিন্দুদের মধ্যে আহার বিহার সকল বিষয়ে এত তারতম্য বর্তমান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে সামান্য ধর্ম বোধ হয় এইমাত্র যে সকলে ব্রাহ্মণপুরোহিতের অধিনায়কত্ব স্বীকার করে এবং পরিপূর্ণ বা আংশিকভাবে বৈদিক ক্রিয়াদিতে অধিকার রাখে।

এরূপ আদর্শদ্বারা বর্ণধর্ম প্রবর্তিত হইলেও তাহার ঈদৃশ অধঃপতন হইল কেন? ইহার ঐতিহাসিক কারণ কি? সমাজের পরিচালকেরা যাহাদের একত্র করিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে একদল বিজিত এবং অপরদল বিজয়ী ছিলেন। মানুষ মাত্রেই পরাজিতকে ঘৃণা করে। ইংরাজেরা আমাদের যে চোখে দেখে বৈদিক জাতিও দ্রাবিড় নিষাদ প্রভৃতিকে সেই চোখে দেখিতেন। বহুদিনব্যাপী আর্থিক সম্বন্ধের

ফলে এবং রক্তসংমিশ্রণের জন্ম তখন সকলকে লইয়া বৃহত্তর হিন্দুসমাজ গঠন করা প্রয়োজন হইল তখনও কিন্তু বিজিত অর্থাৎ অবৈদিক জাতির প্রতি বিজেতাগণের মনোভাব পরিবর্তিত হয় নাই। তাই এক সমাজ-ভুক্ত হইলেও কাহারও স্থান উচ্চে কাহারও বা নিম্নে হইল। ইংরাজ ও ভারতবাসী বর্তমান অবস্থায় এক সমাজভুক্ত হইলেও ঐরূপ তারতম্য থাকিবে। দেশীয় খ্রীষ্টান সমাজের সহিত ইংরাজদের বর্ত্তমান সম্পর্ক বিচার করিলে ইহার সত্যতা অনুভব করা যায়।

বহুকাল পরে অপরিমিত ভোগৈশ্বর্যের ফলে হিন্দুজাতির অবনতি আরম্ভ হইল। ভারত ক্রমে পরাধীন হইয়া পড়িল এবং তখন ক্রমে সমাজ হইতে সমন্বয়ের আদর্শ লুপ্ত হইল। উচ্চজাতি তথাকথিত নিম্নজাতির উপর আধিপত্য খাটাইয়া পরাজয়ের কলঙ্ক ভুলিতে চেষ্টা করিল। ইংরাজ ও ভারতবাসী যদি বর্তমান অবস্থায় একটি মিশ্র সমাজ গড়ে এবং যদি তাহা ভবিষ্যতে অন্য কোন জাতির অধীনতা পাশে বদ্ধ হয় তবে সেই পরাজিত মিশ্রসমাজের মধ্যে ইংরাজ নিজের হীনতাকে সহনীয় করিবার জন্ম অবশিষ্ট সামাজিক ক্ষমতার অপব্যবহার করিবেই করিবে। এবং তাহার আঘাত সহিতে হইবে পূর্বপরাজিত ব্যক্তিগণকে। ভারতে যে উদারতার বশে বিজয়ী অগ্রসর হইয়া বিজিতের সঙ্গে মিলিতে গিয়াছিল, পরাধীনতার হীনতায় তাহা লুপ্ত হইয়া ক্রমে প্রভেদ ও বিদ্বেষের ভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমাজের যে যে ঐক্যবন্ধনের ব্যবস্থা পূর্বচার্যগণ করিয়াছিলেন তাহা ভাঙ্গিল না, কিন্তু পরস্পরের প্রতি প্রেম ও সাহচার্যের পরিবর্ত্তে ভেদাভেদজ্ঞান বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম যুগের বিজিতের প্রতি যে ঘৃণা দেখা যায়, পরবর্তী সংগঠনের যুগে তাহার পরিবর্তে উদারতার পরিচয় পাওয়া

যায়। তখন যেমন একদিকে ভিন্নজাতীয় মানুষের প্রতি প্রেম, তেমনি পুরাগত সংস্কারবশে ঘৃণাও বর্তমান ছিল। কিন্তু সেই ঘৃণাকে অতিক্রম করিয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যে প্রেম ও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন ইহার মত সাহসও ত' আর কোন দেশে প্রায় দেখা যায় না। সেইজন্য অবনত অবস্থায় বর্ণব্যবস্থাকে বিচার করিবার সময়ে তাহার দোষের উপরেও যে মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অস্বীকার করা চলিবে না।

একটি সমস্যা আছে। এমন ভাবে নানা জাতিকে একত্র করার কি উদ্দেশ্য ছিল? শুধু এক হওয়াই ত' কাজ নয়। বোধ হয় মানুষকে বলিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, সকল বৃত্তি ও সকল ধর্ম মিলিয়া যখন সমাজে পূর্ণতার সৃষ্টি করে তখন প্রত্যেকটিই সেই সম্পূর্ণতার সমান অংশীদার। কোন বৃত্তি ছোট নয়, কোনটি বড় নয়। সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত স্বীয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকাই মানুষের কর্তব্য। কিন্তু বৃত্তিই মানুষের সর্বস্ব নহে। ইহা মনুষ্যত্ববিকাশের পথে সহায় মাত্র। শেষ গন্তব্য মোক্ষ। মোক্ষলাভের জন্য একটি শিক্ষাধারা ভারতবর্ষে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহা আশ্রম ধর্ম। চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়া মানুষকে চালিত করিয়া তাহাকে আসক্তিহীন হইয়া স্বীয় কর্তব্য করিবার শিক্ষা দেওয়া হইত। এবং সেই আদর্শকে অবিরাম সমাজের সম্মুখে বাঁচাইয়া রাখার জন্য একদল জ্ঞানান্বেষী অথচ দারিদ্র্যব্রতাবলম্বী অভিজাতবংশের সৃষ্টি হইল।

এই আদর্শেরও বহু ব্যভিচার হয়ত হইয়াছে। পরাধীনতার বশে অথবা সম্মানের আতিশয্যের ফল অভিজাতিকুল ও সাধারণ মানুষ হীন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু অবস্থাবিপর্যয়ে অথবা ক্ষেত্রের দোষে যাহা ঘটিয়াছে তাহার জন্য আমরা স্বাধীন অবস্থার হিন্দু সমাজ যে আদর্শকে

আশ্রয় করিয়াছিল তাহাকে যেন ভুল না বুঝি। এ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে সে আদর্শ অনুযায়ী সমাজের ব্যবস্থা হইতে পারে না ভাবিয়াও যেন আমরা তাহার নিন্দা না করি। বস্তুত এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহা সকল অবস্থাতেই খাটে। সত্য, সুন্দর, সাম্য, প্রেম ইহারাই সনাতন। কোন একটি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে তাহাদের আবদ্ধ করা যায় না, নানা অবস্থার মধ্যে তাহারা নানাভাবে প্রকাশ পায়। যে প্রেম য়ুরোপের গণতন্ত্রের মধ্যে বর্তমান, তাহাই ক্ষেত্রভেদে ভারতবর্ষে সমন্বয়ের আদর্শে প্রকাশিত হইয়াছিল।

হিন্দু সোসিয়ালিজম্ ?

ইংরেজের নিকট পরাজিত হইবার পর বাঙালীর জীবনে অনেক রকম ঘটনা ঘটিয়াছে। হিন্দু কলেজের আমলে বাঙালী ইংরেজী সভ্যতাকে বড় বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, বাঙালী ছেলেরা হিন্দুত্ব ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ইংরেজ হইবার চেষ্টা করিত। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সেই সময় হইতেই একদল লোক ঘোর হিন্দু হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ধারণা হইল ইংরেজের সবই খারাপ এবং যাহা কিছু ভাল তাহা সবই প্রাচীন ভারতবর্ষে ছিল। এই উগ্র হিন্দুর দল হিন্দুত্বের আড়ম্বরপূর্ণ ব্যাখ্যা করিলেও মনে মনে ইংরেজের কাছে হার মানিতেন। অবশ্য সকলে নয়। যাঁহারা যথার্থ হিন্দু সংস্কৃতির সারমর্ম বুঝিয়া, অন্য দেশের প্রতি দ্বেষ না রাখিয়া হিন্দুত্ব রক্ষা করিতেন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু বাজারে বহু লোক খামকা ইংরেজকে গালাগাল দিবার জন্যই হিন্দুধর্মের ধ্বজা উড়াইতেন। ইহা তাঁহাদের কাছে শুধু ইংরেজকে গালি দিবার একটা অছিলামাত্র ছিল। ইঁহারা যে মনে প্রাণে ইংরেজের কাছে হার স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে তাঁহারা "ইংরেজী ভাষায়" কথা বলিতেন। কথাটা খুলিয়া বলি।

উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজী সভ্যতার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট যুগ। বিজ্ঞানের উন্নতিতে ও প্রসারে সারা শতাব্দীটি উজ্জ্বল হইয়াছিল। বাজারের হিন্দুরা যখন সেইজন্য হিন্দুধর্মকে রক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখা গেল যে তাঁহারাও বিজ্ঞানের দোহাই পাড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের মতে হিন্দুধর্ম একটি প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্মে পরিণত হইল।

হিন্দুর শিখা, হিন্দুর গোবর সবেরই পিছনে একটি গূঢ় বৈজ্ঞানিক রহস্য লুকায়িত আছে দেখা গেল। ইহাকেই "ইংরেজী ভাষায়" হিন্দুধর্মের রক্ষা বলা যাইতে পারে। এই সকল ব্যক্তির হাতে পড়িয়া হিন্দুধর্ম শুধু বৈদ্যুতিক শক্তি, শিখা এবং গোবরে পরিণত হইল।

সুখের বিষয়, দেশে সকলের সম্পূর্ণ বুদ্ধি লোপ হয় নাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীগণ হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে যাহা সত্যই শ্রেষ্ঠ তাহারই জ্ঞান দেশে বিকীরণ করিতে লাগিলেন। বাজারের খেলো আওয়াজ তাহার প্রভাবে কতকটা চাপা পড়িয়া গেল। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মত সমান কল্যাণকর, অথবা তদপেক্ষা অধিক কল্যাণকর, বিদ্যা যে ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত আছে, স্বামী বিবেকানন্দ সে কথা দেশের নিকট শুনাইতে লাগিলেন। স্বামীজীর গুণ ছিল এই যে তিনি হিন্দুত্বের বিচার করিতে গিয়া তাহার দোষের সম্বন্ধে অন্ধ থাকিতেন না। হিন্দুধর্মকে তিনি শশধর তর্কচূড়ামণির ন্যায় কোনও খেলো সামগ্রীতে পরিণত করেন নাই। তাহার গুণের সম্বন্ধেও তিনি যেমন সজাগ ছিলেন, দোষের সম্বন্ধেও তেমনই। দোষের কথা তিনি হিন্দুদের কাছে ভারতবর্ষে বার বার বলিতেন, এবং গুণের কথা বিদেশে বিদেশীর কাছে তেমনই ভাবে শুনাইতেন।

কিন্তু বিপদ হয় তখনই যখন কোনও মানুষ স্বামী বিবেকানন্দের মত মুক্ত সন্ন্যাসীর মন না লইয়া ভারতবর্ষেই হিন্দুত্বের গুণ বার বার গাহিতে থাকেন। তখন হিন্দু নিজের আলস্যে খুশি হইয়া শুইয়া থাকে, এবং ধর্ম ও সমাজের মধ্যে যাবতীয় দোষ কায়েমী হইয়া বসিয়া থাকে। এই রকমই একটা ব্যাপার কিছুদিন হইতে হিন্দু সভ্যতার আধুনিক ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে দেখা যাইতেছে। রাশিয়ার সোসিয়ালিষ্ট রিপাবলিক স্থাপিত হইবার পর হইতে বাঙলার আকাশ তাহার জয়গানে ভরিয়া

উঠিয়াছে। ইহা অস্বাভাবিক কিছু নহে। কিন্তু অস্বাভাবিক না হইলেও দুঃখের বিষয় হইল এই যে হঠাৎ দু-এক জন গুণী লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে হিন্দুরা সোসিয়ালিজম্ জানিতেন এবং প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্ম সোসিয়ালিষ্ট আদর্শে গঠিত ছিল।

অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাশ সম্প্রতি বর্ণাশ্রমের আদর্শকে এইভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। চেষ্টা করিলেই যে দোষ হয় তাহা নয়। কিন্তু সেই চেষ্টার মধ্যে সততা এইটুকু থাকা দরকার যেন প্রতি-পক্ষকে যথাযথ হইতে ছোট করিয়া দেখান না হয়, এবং স্বপক্ষকে যথাযথ হইতে বড় করিয়া দেখান না হয়। অথচ আমাদের বিশ্বাস কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহার "সোসিয়ালিজম বা সমাজতন্ত্রবাদ" নামক গ্রন্থে দুইই করিয়াছেন। অপর কেহ এরূপ করিলে দুঃখের কিছু ছিল না, অথবা চুপ করিয়া থাকিলেও চলিত; কিন্তু কালীপ্রসন্নবাবুর মত একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের নিকটে এরূপ আচরণ পাইলে আমাদের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে দেশে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বর্তমান সমালোচনার অবতারণা করা যাইতেছে।

সোসিয়ালিজম্ ও কমিউনিজমের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অযথা সোসিয়ালিষ্টগণের প্রতি কতকগুলি দোষারোপ করিয়াছেন। ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে যে প্রভেদ আছে একথা যে কমিউনিষ্টগণ অস্বীকার করেন, তাহা নহে। আদর্শবাদী সকল সোসিয়ালিষ্টই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন যে হাতের কাজ ভাল পারে, হাতের কাজে যাহার প্রবৃত্তি, তাহাকে সেই কাজেই নিয়োজিত করা যে সমাজের পক্ষে কল্যাণকর একথা আদর্শবাদী-মাত্রেই স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ ইহার সহিত আরও একটি কথা বলেন, তাহার উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থে কোথাও পাওয়া গেল না। তাঁহারা বলেন যে, মানুষে ক্ষমতার তারতম্য থাকিলেও, সেই

অজুহাতে একদলের হাতে অবশিষ্ট সকলের মঙ্গলামঙ্গলের সম্পূর্ণ ভার ছাড়িয়া দেওয়া ঠিক নহে। অথবা, ক্ষমতাশালী বলিয়াই আর সকলকে শ্রমের উচিত মূল্য হইতে বঞ্চিত করিবার অধিকার তাহাদিগকে দেওয়া উচিত নয়। একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। ধরুন, এক দেশে কয়েক জন এমন লোক জন্মিল যাহাদের সামাজিক পরিচালনা করিবার বিষয়ে একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে। সেখানে সেই কয়েকজনকে স্বীয় বিদ্যা কাজে খাটাইবার সুযোগ দেওয়া সমাজের পক্ষে উচিত। ইঁহাদের ইঞ্জিনিয়ারের কাজে লাগাইলে দেশের ক্ষতি হইবে। সেইজন্য যে সমাজ ঐ সকল ব্যক্তিকে তাহাদের সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী কাজের সুযোগ দিতে পারে তাহা যে শুধু কয়েকজনের ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধন করে তাহা নহে, বরং সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণ করে। ইহা এক কথা। কিন্তু যদি সেই শাসনকার্যে দক্ষ কয়েকজন লোকের হাতেই দেশের রাষ্ট্রভার সম্পূর্ণরূপে অর্পণ করা হয়, তবে যে তাহারা সেই ক্ষমতা স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থোদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবে না তাহা কে বলিতে পারে?

অথচ রাষ্ট্রের কাজ চালাইতে হইলে কয়েকজন লোকের হাতেই কাজের ভার দিতে হয়। পাছে এই দলটি নিজেদের স্বার্থের অনুসরণ করে তাহার জন্য তাহাদের নিয়োগ করিবার ভার দেশের কোন-না-কোন শ্রেণীর উপরে সচরাচর ন্যস্ত থাকে। সোসিয়ালিষ্টগণ ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, কখনও এই ভার পুরোহিতদের হাতে ন্যস্ত ছিল। কখনও বা তাহা যোদ্ধা সৈনিকদের হাতে ছিল, এখন প্রায় সমস্ত জগতে তাহা ধনিক ব্যবসায়ীদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। ইতিহাসের মধ্যে দেখা যায় যে, এই সকল শ্রেণী প্রধানতঃ স্বীয় শ্রেণীর স্বার্থপুষ্টির জন্য রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল, অপরকে যাহা দিয়াছে তাহা প্রসাদী সুবিধামাত্র। রাষ্ট্রের মালিকেরা যাহা দয়া

করিয়া দিয়াছে, জনগণ তাহাই লাভ করিয়াছে। সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার তাহাদের কখনও ছিল না।

মানুষের সহিত মানুষের বিভিন্নতা অস্বীকার করা এক জিনিষ, আর বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক ক্ষমতার তারতম্য দূর করা সম্পূর্ণ অন্য জিনিষ। এই শ্রেণীগত প্রভেদ দূর করাই কমিউনিষ্টগণের লক্ষ্য। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে ক্ষমতার তারতম্য আছে, তাহার লোপ-সাধন করা তাঁহাদের লক্ষ্য নয়। অবশ্য আপদ্ধর্মের কথা স্বতন্ত্র। যুদ্ধকালে অথবা রাষ্ট্রবিপ্লবে হয়ত এই নীতি সম্যক্‌রূপে অনুসৃত হয় না। কিন্তু তাহা আদর্শের দোষ নহে, সাধনার দোষ হইতে পারে।

কমিউনিষ্টগণ মনে করেন মানবের কল্যাণর জন্য শ্রেণীভেদ দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহারই উপায়স্বরূপ তাঁহারা মনে করেন অন্ততঃ একবার প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্রকে ধনিক শ্রেণী, ক্ষত্রিয় শ্রেণী প্রভৃতির আধিপত্য হইতে মুক্ত করিয়া শূদ্র শ্রেণীর একাধিপত্য স্থাপন করিতে হইবে (Dictatorship of the Proletariate)। ইহাতে শ্রেণীগত শাসন দূরীভূত হইল না বটে,কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর একাধিপত্য অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর আধিপত্য ভাল, তাহাতে অন্তত বেশী লোকের স্বার্থপুষ্টি হয়। সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সুযোগসুবিধার ভেদাভেদ দূর করিতে হইলে দেশে সম্যক্ শিক্ষা ও সম্যক্ মনোভাবের সৃষ্টি করিতে হইবে। এবং সেই রকম শিক্ষা বিস্তারের সুবিধার জন্যই শূদ্রগণের একাধি-পত্য বিশেষ প্রয়োজন। শূদ্র ভিন্ন অন্য শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রশক্তি থাকিলে সেই শ্রেণী সাম্যের শিক্ষা বিস্তার করিতেই দিবে না বলিয়া কমিউনিষ্টগণ মনে করেন। কেন না তাহা তাহাদের শ্রেণীগত স্বার্থের পরিপন্থী হইবে।

আলোচ্য গ্রন্থে সমাজতন্ত্রবাদের দীর্ঘ আলোচনার মধ্যে এই দিকটি যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

তারপর হিন্দু সমাজগঠনের কথা। পুস্তকের শেষ কয়েক পৃষ্ঠায় এবং মধ্যস্থলেও গ্রন্থকার ইঙ্গিত করিয়াছেন যে চাতুর্বর্ণ্যের দ্বারা ভারতবর্ষে সাম্যের অথবা সাম্যের কাছাকাছি কোন অবস্থার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, বর্তমান কালে ইংরেজী সভ্যতার মোহে পড়িয়া আমরা সে কথা ভুলিতে বসিয়াছি। ইহা সত্য হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। হিন্দু সমাজব্যবস্থার মধ্যে যাহা যথার্থ ভাল ছিল, তাহা ভোলা আমাদের পক্ষে দূষণীয় হইবে। কিন্তু হিন্দুত্বের মোহেও যেন আমরা হিন্দুত্বকে সত্য অপেক্ষা বড় করিয়া না দেখি, এ-বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

আলোচ্য গ্রন্থে গ্রন্থকার ভারতবর্ষের প্রাচীন যৌথ পরিবারের প্রথাকে একটি আদর্শ সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়াছেন। তিনি এমনও বলিয়াছেন যে কমিউনিজমের যাহা আদর্শ যৌথ পরিবারের আদর্শ তাহারই ভারতীয় সংস্করণ। একটি পরিবারের মধ্যে হয়ত স্বার্থত্যাগের দ্বারা সাম্যের ভাব আনা যায়, কিন্তু সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এই ব্যবস্থার প্রয়োগের দ্বারা কি করিয়া মীমাংসা হইবে, তাহা বুঝা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা একটি পরিবারের অর্থনৈতিক সমস্যার সমতুল নহে। তদ্ভিন্ন যাহারা রক্ত-সূত্রে আবদ্ধ নহে সেরূপ একটি বৃহৎ জনতার মধ্যে একটি সাধারণ দেশ-মাতৃত্বের ধুয়া তুলিয়াও আত্মীয়তাবোধ আনা সম্ভব নয়। আরও একটি কথা আছে। হিন্দুরা যে কোনও কালে কামার, কুমার, স্যাকরা, ব্যবসায়ী, চাষী সকলকে লইয়া একটা যৌথ পরিবার গড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে পরিবারের মধ্যে সকলের আয় সম্মিলিত হইয়া অবশেষে বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনমত ব্যয়িত হইবে, শাস্ত্রগ্রন্থে কোথাও তাহার প্রমাণ নাই। তবে মনুসংহিতা বা মহাভারত সমালোচনা করিলে একটি আশ্চর্য বিষয় পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণগণকে সমাজের

দৃষ্টিতে অত্যধিক প্রতিপত্তি দিলেও তাহাদিগকে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন অপরাপর ধনীরাও যাহাতে সাধারণের উপকারার্থ অর্থ ব্যয় করেন, মন্দির, পথঘাট নির্মাণ করিয়া দেন বা কূপতড়াগাদি খনন করেন, সেই জন্য এই সকল কার্যকে খুব পুণ্যের কার্য বলিয়া বর্ণনা করা হইত। বর্তমান কালে ট্যাক্সের দ্বারা ধনীর হস্ত হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া রাষ্ট্র অথবা মিউনিসিপ্যালিটি যে ভাবে সাধারণের কার্যে অর্থ ব্যয় করে প্রাচীন ভারতবর্ষে তেমন ব্যবস্থা ছিল না। তৎপরিবর্তে স্বর্গের লোভ দেখাইয়া, অথবা সামাজিক মর্যাদা অতিরিক্ত পরিমাণে পরিবেশন করিয়া ধনীদিগকে সেই কার্যে নিয়োজিত করা হইত। অর্থাৎ আইনের ভয়ে না ফেলিয়া বরং পুণ্যের আকর্ষণে ধনবৈষম্যের দোষ কতকাংশে কাটান হইত। কিন্তু যদি কেহ স্বীয় ধনসম্পদ সৎকার্যে ব্যয় করিতে না চাহিতেন, তাহা হইলে সমাজ বা রাষ্ট্র তাঁহার উপর কোনও জোর করিতে পারিত না। তাঁহাদের আয়ের তাঁহারাই মালিক ছিলেন, তাহার উপর দেশের লোকের কোনও দাবি আছে বলিয়া রাষ্ট্রের আইনে স্বীকার করা হইত না। আয়ের উপর দাবি ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে ধনোৎপাদনের যে সকল সাধন আছে (means of production যথা জমি, খনি, মূলধন প্রভৃতি) তাহার উপরে ব্যক্তিবিশেষের মালিকানা স্বত্বই স্বীকার করা হইত। সেগুলিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তি করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষে দেখা যায় না। সেই জন্ত হিন্দুর সমাজসংগঠন সাম্যবাদের আদর্শে গঠিত হইয়াছিল একথা বলা চলে না।

যাঁহারাই হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি জাতিকে ব্রাহ্মণেরা যেভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেন, প্রাচীনকালে অপর কোন দেশে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টানেরা অথবা মুসলমানগণ লোককে;

নিজের সমাজভুক্ত করিতে হইলে ধর্মে, আচারে, সামাজিক সংস্কারে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে পোষাক পরিচ্ছদেও বদলাইয়া লইয়া থাকেন। কিন্তু হিন্দুরা হিন্দু করিতে হইলে এরূপ নীতি অনুসরণ করেন নাই। চাতুর্বণ্যের আধ্যাত্মিক দিক যতই বড় হউক না কেন, তাহার একটা মোটা রকমের অর্থনৈতিক দিক ছিল। এক একটি জাতি যেমন হিন্দু হইতে লাগিল, অমনই তাহাদের জন্য এক একটি বৃত্তিও স্থানীয় চাহিদা অনুসারে বাঁধিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। বন্য জাতিগুলি হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া কেহ বাঁশের কাজ ধরিল, কেহ মাটির কাজ করিতে লাগিল, কেহ জ্বালানি কাঠ জোগাইতে লাগিল, কেহ বা আর কিছু ব্যবসায় গ্রহণ করিল। প্রত্যেক জাতি হিন্দু হইবার পূর্বাবস্থায় নানা-প্রকার কাজকর্ম করিত। কিন্তু হিন্দুদের বৃদ্ধি ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বনজঙ্গল উড়িয়া গেল, বন্য পশুর শিকার বন্ধ হইল, অথবা অন্য উপায়ে তাহাদের প্রাচীন বৃত্তি লোপ পাইতে লাগিল। তখন হিন্দুরা তাহাদিগকে স্বীয় অর্থনৈতিক সংগঠনের অঙ্গীভূত করিয়া তাহাদের এক একটি বিশেষ বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দিলেন। এই সকল বৃত্তির সমষ্টি লইয়া দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন গড়িয়া উঠিল। রাজার কাজ ছিল এই যে, প্রত্যেকে যেন নিজের বৃত্তি অনুসরণ করিয়া খাইতে পরিতে পায়, ইহা দেখা। একের বৃত্তি অপরে যাহাতে গ্রহণ না করে এ-বিষয়েও তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শুধু তাহাই নহে, ব্যবসায়ে একচেটিয়া অধিকারের বশে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন কারিগরগণ জিনিষের মূল্য অত্যধিক বাড়াইতে না পারে তাহার জন্য রাজাকে জিনিষের মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিতে হইত। এইরূপ একটি নির্দেশ মনুসংহিতার মধ্যে পাওয়া যায়। (অধ্যায় ৮, শ্লোক ৪১০-৪১৮)।

আপদ্ধর্মের বশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বৃত্তি-বদল করিতে পারিতেন

বটে কিন্তু শূদ্রের এ-বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না। বস্তুত সমস্ত রাজধর্ম বিষয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িলে দেখা যায় যে, চাতুর্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রম রক্ষা করাই রাজশক্তির প্রধান কাজ ছিল।

বহু কাল ধরিয়া বহু জাতি এইভাবে এক একটি বৃত্তি লইয়া হিন্দু-সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠনে স্থান পাইয়াছে। পাইবার পর সেই সকল জাতির মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্মে, ধর্মানুষ্ঠানেও হিন্দুর সংস্পর্শের ফলে কোন কোন পরিবর্তন সাধিত হইত। অঙ্গীভূত জাতিগুলির ধর্ম পরিবর্তনের বিষয়ে হিন্দুদের বিশেষ উৎসাহ ছিল না। কেবল, সেই সকল ধর্মের মধ্যে যদি কোনও হিন্দু-নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান থাকিত তবে তাহারই মার্জনা করিয়া লওয়া হইত। নরবলির বিকল্পে পশুবলি এই-ভাবে কয়েকটি তথাকথিত নিম্ন হিন্দুজাতির মধ্যে স্থান পাইয়াছিল। হিন্দু হইবার পর ঐ সকল জাতির মধ্যে আরও কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিত। তাহারা গরুর মাংস খাওয়া ছাড়িত, মুরগা অথবা শূকর বলি দেওয়া ছাড়িয়া দিত এবং সামাজিক সংস্কারে নিজেদের জাতীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা বৈদিক দু-একটি অনুষ্ঠান করাইয়া লইত। বস্তুত, ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দ্বারা ক্রিয়া করাইবার অধিকার লাভ করিলে তবে তাহারা সামাজিকভাবে হিন্দু বলিয়া গণ্য হইত। ইহাই ছিল হিন্দুত্ব লাভের সাধনোপায়।

এইভাবে যে সমাজ গঠিত হইল তাহার মধ্যে বহু জাতি স্থান পাইল বটে, নিজেদের পূর্বতন ধর্মানুষ্ঠানের বিষয়ে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার দ্বারা কোনও সোসিয়ালিষ্ট সমাজ গড়িয়া উঠে নাই। তাহার কারণ বিভিন্ন কারিগরদের মধ্যে আয়ের সমতা কখনও স্থাপিত হয় নাই। কামার, কুমার, অধ্যাপক, পুরোহিত, স্বর্ণকার, শিল্পী বা ব্যবসায়ীদের আয়ের মধ্যে যথেষ্ট তারতম্য ছিল। শুধু

তাহাই নহে, ইহাদের লইয়া যে-কয়েকটি শ্রেণী ছিল, তাহারা আইনের চোখে, সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারে, সকল বিষয়েই বিভিন্ন ছিল। কামার, কুমার প্রভৃতি শূদ্র; অধ্যাপক, পুরোহিতেরা ব্রাহ্মণ; স্বর্ণকার, শিল্পী প্রভৃতি হয় শূদ্র নয় বৈশ্য। ইহাদের মধ্যে আইনে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট তারতম্য স্বীকৃত হইত। চাতুর্বণ্য যে সোসিয়ালিজমের আদর্শে গঠিত ছিল না, ইহাই তাহার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

রাশিয়াতে বর্তমান কালে যে সমাজ গঠন চলিতেছে, তাহার সহিত ভারতবর্ষের চাতুর্বর্ণ্যের কোন কোন বিষয়ে মিল আছে। ভারতে কোন্ জাতি কোন্ বৃত্তি লইবে তাহা দেশের প্রয়োজন অনুসারে স্থিরীকৃত হইত। স্থানীয় চাহিদা অনুসারে প্রতি জাতি স্বীয় বৃত্তি ঠিক করিয়া লইত, রাষ্ট্র বৃত্তিনিরূপণে বোধ হয় সাহায্য করিত না। কিন্তু একবার যে জাতি যে বৃত্তি গ্রহণ করিত, বহু যুগ ধরিয়া তাহাকে সেই বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইত। সে বৃত্তিতে তাহার একাধিপত্য রাষ্ট্র স্বীকার করিয়া লইত। স্বেচ্ছায় লোকে বৃত্তি গ্রহণ বা পরিবর্তন করিতে পারিত না। রাশিয়াতেও তেমনই বৃত্তিগ্রহণ ব্যাপারে কেহ স্বেচ্ছাচারিতা করিতে পারে না। ইহা দুই দেশের মধ্যে একটি বড় মিল বলিতে হইবে।

অপর পক্ষে রাশিয়াতে দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন কি তাহা রাষ্ট্রপতিরা ঠিক করিয়া দেন। যে-কোন বৃত্তি লইয়া গোলমাল সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাই। দেশের প্রয়োজন পূরণ করিবার ব্যাপারে একজন মজুর কাপড়ের কলে কাজ করিবে, কি লোহার কলে কাজ করিবে, এইটুকু বাছিয়া লইবার স্বাধীনতাই শুধু তাহার আছে। ভারতবর্ষে মানুষের অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা জন্মের দ্বারা ও কতকটা দেশের চাহিদা অনুসারে স্থিরীকৃত হইত, দেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন ঠিক কি তাহা রাষ্ট্রপতিরা স্থির করিয়া দিতেন না। লোকের বিশ্বাস ছিল জন্মগত

পদ্ধতি অনুসরণ করিলেই দেশের অভাব মিটিয়া যাইবে। দুই দেশের মধ্যে এইটুকু প্রভেদ ছিল। কিন্তু দুই দেশই মানুষের অর্থনৈতিক চেষ্টাকে রাষ্ট্রশক্তির অধীন করা হইয়াছিল। ব্যক্তির অর্থনৈতিক স্বেচ্ছাচার কোথাও স্বীকৃত হয় নাই।

ইহার পর আমরা আরও দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ এবং রাশিয়া উভয়েই মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অস্বীকার বা সঙ্কুচিত করিলেও জাতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধে যথেষ্ট স্বাধীনতা দান করিয়াছে। এইখানে দুই দেশের মিল। অবশ্য ব্রাহ্মণেরা যেমন সংস্কৃতিগত স্বাধীনতা দিয়াও "নিম্ন প্রকৃতি"র কাছে বেদবেদান্তের মহিমা ঘোষণা করিতেন, রাশিয়াতেও তেমনিই জাতীয় সংস্কৃতির উপর আধুনিক বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির বিষয়ে যথেষ্ট প্রচার করা হইয়া থাকে। উজবেগ, তুর্ক প্রভৃতি জাতি রাশিয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মানিয়া লইয়া স্বচ্ছন্দে স্বীয় পোষাক পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার লইয়া কালযাপন করিতেছে। উপরন্তু ইউরোপের বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সম্বন্ধেও বহু উপদেশ লাভ করিতেছে।

কিন্তু দুইটি বিষয়ে রাশিয়া এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম হইল, বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে সামাজিক সুবিধার ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার তারতম্য লইয়া ভারতবর্ষে যে শ্রেণীভেদ জন্মাইছিল, রাশিয়া তাহা হইতে দিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষমতা অনুসারে আয়ের তারতম্য বর্তমান রাশিয়াতে আছে, এবং হয়ত শেষ পর্যন্ত থাকিবে। কিন্তু তাহাকে আশ্রয় করিয়া কোনও শ্রেণীভেদ রাশিয়া হইতে দিবে না, ইহাই তাহার আদর্শ।

দ্বিতীয়ত, রাশিয়ায় রাষ্ট্রের অধিনায়কত্ব কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে থাকিলেও লেনিনের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলে দেশের অসংখ্য পঞ্চায়েতের (soviet) মর্জির উপরেই কমিউনিষ্ট পার্টির থাকা-না-থাকা কতকটা

নির্ভর করিতেছে। অর্থাৎ দেশের মালিক কতকাংশে দেশের শূদ্রগণ হইয়া উঠিয়াছে। আপদ্ধর্মের বশে কমিউনিষ্ট পার্টি সে ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে সোভিয়েটগুলির হাতে ছাড়িয়া দিতে পারে নাই বটে, কিন্তু বাহিরে বিপদের মেঘ কাটিলে তাহারা সেই ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে দেশের জনগণের হাতে ছাড়িয়া দিবে, ইহাই হইল আদর্শ। ভারতবর্ষের শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ কোনও আদর্শ বা অভিলাষ ছিল বলিয়া আমরা জানি না।

এই দুইটি হইল চাতুর্বর্ণ্য এবং রাশিয়ার সমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রভেদ। আজ রাশিয়াতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সুস্থ সমাজে যতটা দরকার তাহা-অপেক্ষা অধিক সঙ্কুচিত হইয়াছে। কিন্তু আপদ্ধর্মের কথা ভুলিলে চলিবে না। চতুর্দিকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত রাজ্যের মধ্যে আবৃত থাকিয়া যদি রাশিয়া ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে যথাযথ মূল্য দিতে না পারে, তবে তাহা ইচ্ছার অভাবে শুধু নয়, অবস্থার বিপর্যয়েও বটে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সে বহুকাল মানুষকে দিবে না বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে সে পরে আরও বেশী স্বাধীনতা দিবার আশা রাখে। রাশিয়ার মহত্ত্ব হইল এই যে, জগদ্ব্যাপী শূদ্রদের দুঃখ দেখিয়াই সে আজ শূদ্ররাজত্ব স্থাপন করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত সে নৈরাজ্য স্থাপনা করিবার অভিলাষ রাখে, কিন্তু কবে নৈরাজ্য সম্ভব হইবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই।

হিন্দুসমাজ রাষ্ট্রের দ্বারা যে কত দূর নিয়ন্ত্রিত ছিল তাহা যে-কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ খুঁজিলে জানা যায়। হিন্দুও বহু জাতিকে একত্র করিয়া ক্যাপিটালিষ্ট সমাজ অপেক্ষা একটি উৎকৃষ্ট সমাজ গঠন করিয়াছিল একথা ভাবিয়া আমরা গর্ব অনুভব করিতে পারি। হিন্দু সমাজ সকলের কাজের ব্যবস্থা করিয়া দিত, অর্থনীতির ক্ষেত্র বাদে সকলের জাতীয় সংস্কৃতি স্বাধীনভাবে পালন করিতে দিত, ইহা সত্যই গর্বের বিষয়। কিন্তু তাই বলিয়া সেখানে সোসিয়ালিজমের আদর্শ ছিল, অর্থাৎ আয়ের সমতা

স্থাপন করার চেষ্টা ছিল বা শ্রেণীগত সুযোগসুবিধার তারতম্য ছিল না, একথা বলিলে ঠিক হইবে না। অথবা আমরা যদি অহঙ্কার করিয়া বলি যে, হিন্দুর সমাজ গঠন ও শিক্ষাপদ্ধতি এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ছিল যে "রাষ্ট্রীয় দণ্ডনীতির বলে বাধ্য করিয়া লোককে ইহার অধীন রাখিবার প্রয়োজন কখনও হয় নাই" (পৃঃ ২৯১), তাহা হইলে ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষিত হয় না। রামচন্দ্র শম্বুককে বধ করিয়াছিলেন ইহা ভুলিলে চলিবে না। হিন্দু যেটুকু করিয়াছিল তাহার জন্যই সে বড়, বড় প্রমাণ করিবার জন্য যাহা সে করে নাই, তাহা আরোপ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

বহু বেদনার ভিতর দিয়া শুধু ভারত নয়, ইউরোপও আজ চলিয়াছে। মানুষ সর্বত্রই মানুষ। ভারতেও তাহার দুঃখ আছে, ইউরোপেও আছে। দুই দেশেই এমন লোক আছেন যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির দুঃখকে সমাজব্যবস্থার দ্বারা যতদূর সম্ভব নিবৃত্ত করিতে চান। এবিষয়ে যে-দেশ যতটুকু সাফল্যলাভ করিয়াছে তাহার জন্য তাহাকে ততটুকুই মর্যাদা দিতে হইবে। একদেশের মাটির উপর অত্যধিক প্রেমবশত সেখানকার অধিবাসীদের কীর্তিকে অযথা বাড়াইবার প্রয়োজন নাই, অপরের মাটির বাসিন্দাদের কীর্তিকে অযথা কমাইবারও দরকার কখনও হয় না।

মানুষের কীর্তিকে সর্বত্রই মুক্তদৃষ্টি লইয়া দেখিতে হইবে। তাহা না হইলে ঐতিহাসিক সত্যকে পাওয়া যায় না। সর্বশেষে একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে জ্ঞান আহরণের জন্য আমাদের দৃষ্টিকে সম্পূর্ণরূপে অনুরাগ এবং বিদ্বেষ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়োজনীয়তা ভারতবর্ষে যেমন করিয়া বলা হইয়াছিল অন্য কোন দেশে তেমনভাবে বলা হয় নাই।

বাঙালীর সমাজ

মানুষের সুখ বাড়াইবার জন্য ও দুঃখ দূর করিবার জন্য সমাজ গড়া হয়। এক রকম সামাজিক ব্যবস্থা করিলে তাহা যে চিরদিন মানুষকে সুখ বণ্টন করিতে পারিবে, তাহা কখনও সম্ভব নয়। বাঙলাদেশে পূর্বকালে যে সকল সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা একদিন বাঙালীর উপযোগী ছিল বলিয়া যে আজকেও তেমনই থাকিবে তাহার মানে নাই। অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর আজ বহুবিধ দুঃখ সঞ্চিত হইয়াছে। সেই জন্য প্রাচীন সমাজ বাঙালীর গায়ে আর ভাল করিয়া মানাইতেছে না; এবং সমাজে নানাবিধ পরিবর্তন করিবারও সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পরিবর্তনের চেষ্টা যে না হইতেছে তাহা নহে কিন্তু পরিবর্তন করিবার পূর্বে আমাদের ঠিক কি কি দুঃখ আছে, তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ দুঃখ সামাজিক বিধানের দ্বারা দূর করা যায়, তাহা বিচার করা প্রয়োজন। বিচার শুধু হাতে হয় না, বিচারের পূর্বে অনুসন্ধানের প্রয়োজন। সেই জন্য বাঙলাদেশের সমাজের সম্বন্ধে, বাঙালীর সুখ দুঃখের বিষয়ে, আমাদের যথেষ্ট অনুসন্ধান করিবার সময় আসিয়াছে।

বাঙালী আগে যেমনই থাকুক না কেন, আজ বাঙালীর সমাজে মোটামুটি দুইটি ভাগ হইয়া গিয়াছে। একদল লোককে চাকুরি করিয়া খাইতে হয়, অপর দল গ্রামে থাকিয়া যেমন তেমন ভাবে চাষ করিয়া অথবা ছোটখাট শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। যে সকল মধ্যবিত্ত বাঙালীকে সহরে একত্র বাস করিতে হইতেছে, তাহাদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে প্রভেদ আছে। কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ কায়স্থ, কেহ

নমঃশূদ্র, কেহ বা তিলি, তামলী, তন্তুবায় অথবা নাপিত। পূর্বে গ্রামে থাকিতে ইহাদের স্বতন্ত্র ব্যবসায় ছিল, শিক্ষা দীক্ষার ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল, আয়ের তারতম্য ছিল, বাস করিবার হয়ত বিভিন্ন পাড়া ছিল, সমাজও ভিন্ন ছিল। কিন্তু আজ সেই সকল বিভিন্ন জাতির ব্যক্তিকে সহরে চাকুরি অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের জন্য পাশাপাশি বাস করিতে হইতেছে। চাকুরির আয়ে জাতিগত কোনো প্রভেদ না থাকায় সকল জাতির আচার এক রকম হইয়া আসিয়াছে এবং সকলকে একই স্কুলে ও কলেজে ছেলেমেয়ে পাঠাইতে হইতেছে। ফলত মধ্যবিত্ত ব্যক্তিগণের জীবনধারণ ও আচার ব্যবহার কতকটা সমতা লাভ করিয়াছে।

অথচ গ্রাম সমাজে যখন বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রভেদ আরও সুস্পষ্ট ছিল, সে সময়ের সামাজিক নিয়ম কানুন আজও বলবৎ রহিয়াছে। নমঃশূদ্রের ছেলের সঙ্গে কায়স্থের মেয়ের আজ আলাপ হইতেছে। উভয়ে নিজেদের বিভিন্ন পরিবারের চালচলনের কোনও প্রভেদ দেখিতে পাইতেছে না, অথচ তাহাদের বিবাহ করিবার যো নাই। সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন জাতির লোককে একত্র বাস করিতে হইতেছে। কিন্তু একত্র বাস করিলে যে সকল আদান প্রদান হওয়া স্বাভাবিক, সেগুলির বিষয়ে সামাজিক বাধা বর্তমান রহিয়াছে।

ইহা একপ্রকার দুঃখ, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার দ্বারা ইহা অনেক পরিমাণে নিরাকরণ করা যায়।

কিন্তু আমরা আজ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দুঃখের কথাই আলোচনা করিতে বসি নাই। মধ্যবিত্তেরা শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহারা স্বকীয় দুঃখের সম্বন্ধে সচেতন। এবং তাহারা যদি সচেষ্ট হয় তবে স্বীয় দুঃখ অনেকাংশে দূর করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভিন্ন বাঙ্গলাদেশের জনসাধারণের সামাজিক জীবনেও যে নানাবিধ দুঃখ আছে তাহারই কথা আজ কিছু

আলোচনা করিব। তাহারা স্বীয় দুঃখের বেদনা অনুভব করিলেও কোথা হইতে তাহার উৎপত্তি, কোন্ পথ অবলম্বন করিলে দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, সে বিষয়ে কিছুই জানে না। অধিকাংশ পল্লীবাসীর শিক্ষা নাই, নিজেরা পরিষ্কারভাবে সমস্যার বিষয় ভাবিতেও পারে না। সেই জন্য যখন অপরিষ্কার ভাবে ভাবিয়া দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করে তখন ঠিক পথ না লইয়া ভুল পথই বার বার লয়। সংসারে ঠিক পথ একটি বা দুইটি, কিন্তু ভুল পথ বহু। চোখ বুজিয়া চলিলে ঠিক অপেক্ষা ভুল পথে চলিবার সম্ভাবনাই অধিক।

এইবার গরীব লোকের দুঃখের একটি উদাহারণ দিতেছি। বোলপুর অঞ্চলে বহু মুচির বাস আছে। এক সময়ে এদিকে যুগী জাতিরও বাস ছিল তাহা ছাড়া হাড়ি এবং ডোমদেরও এখানে যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে। মুচিরা পূর্বে চামড়ার কাজ করিত, যুগীরা তাঁতে মোটা কাপড় বুনিত এবং হাড়ি ডোমেরা বাঁশের কাজ করিত। জাতীয় ব্যবসায় ভিন্ন সকলেই চাষের কাজ বা মজুরিও করিয়া খাইত। বর্তমান যুগে পল্লী গ্রামে সকল ব্যবসায়ের ওলট পালট হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা সহর হইতে আমদানি জুতায় বোলপুরের বাজার ছাইয়া গিয়াছে, দেশী মুচির জুতা কেহ পরে না। দেশী মুচিরা চামড়ার কাজেও কোন উন্নত প্রণালী অবলম্বন করে নাই। ফলত মুচিজাতি বোলপুর অঞ্চলে অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তাহারা আজকাল প্রধানত-চাষের কাজ করে ও মজুরি করে। মুচিদের মত অন্যান্য জাতিরও ব্যবসায় সহরের তাড়নায় ক্রমে লোপ পাইয়াছে, সেইজন্য চাষী-মজুরের সংখ্যা এ অঞ্চলে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলগাড়ীর সুবিধা লইয়া বোলপুরের ধানের কলে সাঁওতালেরা কাজ করিতে আসে। সাঁওতালেরা বলিষ্ঠ, সমান মজুরিতে মালিককে বেশী কাজ দেয়। সেইজন্য মজুরির বাজারে সাঁওতালদের চাহিদা বেশি, দেশী মরেমজু

চাহিদা কম। দশ রকম কারণে মিলিয়া বোলপুর অঞ্চলের মুচি হাড়ি, ডোম প্রভৃতি সকলের অবস্থা খুব খারাপ হইয়াছে।

পাঠক হয়ত বলিবেন, তা' না হয় হইল; কিন্তু ধান ভানিতে শিবের গীত কেন? তাহাতে সমাজের কি হইয়াছে? এইবার সেই কথা বলি। যুগীদের জাতীয় ব্যবসায় যখন মুচিদের ব্যবসার মত চলিয়া গেল, তখন তাহাদের সমাজে একটি বিচিত্র পরিবর্তন উপস্থিত হইল—যুগীর সংসারে যখন হাঁড়ি চড়ে না, তখন যুগী মেয়েরা অন্যান্য গরিব জাতির মেয়েদের মত গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করিল। গণিকাদের সন্তান সম্ভাবনা কম, সেই জন্য যুগী সমাজে ক্রমে ক্রমে লোকাভাব হইতে লাগিল। যুগী পুরুষেরা বিবাহ করিবার মত ভাল মেয়ে পায় না। যাহারাও বা আছে, তাহারাও দরিদ্র স্বামীর সংসারে আবদ্ধ থাকিতে চায় না। অল্পদিনের মধ্যে যুগী পুরুষেরা বিবাহের বাজারে বড় দুরবস্থায় পড়িল। তখন তাহারা হাড়ি ডোমের ঘরে বিবাহ করিল; নয়ত হাড়ি ডোমের মেয়ের সঙ্গে স্বগ্রাম হইতে দূরে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে বোলপুর অঞ্চল হইতে যুগীজাতি একেবারে লোপ পাইয়া গিয়াছে।

মুচিদের অবস্থা যুগীদের মত না হইলেও যথেষ্ট খারাপ হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে জন্মের হার কমিয়াছে, মৃত্যুর হার বাড়িয়াছে এবং সুস্থ ও সুন্দরী মেয়েগুলি বিপথে যাওয়ার জন্য সমাজেও ভাঙ্গন ধরিয়াছে। এ অবস্থায় তাহারা ঠিক কি করিবে স্থির করিতে পারিতেছে না। মুচিসমাজের মাতব্বরগণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে সমাজে প্রচলিত বিধবা বিবাহ বন্ধ করিয়া পবিত্রতার নিগড়ে বাঁধিয়া মুচি জাতিকে রক্ষা করিতে হইবে। কেহ বা ভাবে, তাহাতে লাভ কি? পশ্চিম বীরভূমে কৈবর্ত্ত্যদের মধ্যে নাকি বিধবাবিবাহ নিরোধ করার ফলে ভ্রূণ-হত্যার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এমন অবস্থায় মুচি সমাজের পথে গিয়া লাভ কি? এই

সকল সন্দেহ-দোলায় পড়িয়া মুচি-সমাজ একরকম দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে।

বাঙ্গালাদেশের সামাজিক অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে আমরা এইরূপ নানাবিধ তথ্যের সন্ধান পাই। মধ্যবিত্ত সমাজেও যেমন দ্রুত পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, দরিদ্র পল্লীসমাজেও তেমনই। উভয়ের মধ্যেই জাতিতে জাতিতে পূর্ববর্তী ব্যবধানগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তবে প্রভেদ এই যে, সহরের সমাজে আর্থিক উন্নতির কারণে সেরূপ হইতেছে, কিন্তু পল্লীসমাজে দারিদ্র্যের বশে তাহা সাধিত হইয়াছে।

যে কারণেই হউক, আমরা দেখিতে পাই যে, জাতিতে এবং জাতিতে আচারগত ভেদ ও ব্যবধান ক্রমে লোপ পাইতে বসিয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সমাজের বিধানগুলি উল্লিখিত ঐক্য সাধনের পরিপন্থী। যদি আমরা একীকরণকে ভাল মনে করি, তাহা হইলে প্রাচীন বিধানগুলি যাহাতে বাঙালীর জীবনে আর দুঃখ বিকিরণ করিতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের চেষ্টা করা দরকার। আর যদি আমরা মনে করি যে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনিব, এবং তখন উল্লিখিত ভেদাভেদের ব্যবধানগুলি কাজে লাগিবে বলিয়া সেগুলিকে এখন ভাঙ্গিব না, তাহা হইলে খুব তৎপরতার সহিত সেই প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ফিরাইবার চেষ্টা করা দরকার।

আমরা যাহাই চাই না কেন, বর্তমান অবস্থায় আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকা চলে না। প্রাচীন বিধান ও নূতন অবস্থার মধ্যে অসামঞ্জস্যের ভাবে বাঙালী প্রতিনিয়ত পীড়িত হইতেছে। এ অবস্থায় সমগ্র হিন্দুজাতিকে বেশীদিন ফেলিয়া রাখিলে শেষে হয়ত সমাজের পরিবর্তন সাধন করিবার মত সামর্থ্যও তাহার আর অবশিষ্ট থাকিবে না।

বাঙালীর চরিত্র

বাঙালা দেশে যাহারা চাষবাস করে, গ্রামে থাকিয়া কামার, কুমোর বা ছুতারের কাজ করে, তাহাদের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধ নয়। এই সকল গ্রামবাসীর জাত আছে, সমাজ আছে, গ্রামের শাসন, ভালই হউক অথবা মন্দই হউক, তাহারা মানিয়া চলে। কিন্তু তাহাদের ছাড়া বাঙলার ইংরেজ-শাসনের পরে যে নূতন বাঙালী জাতির সৃষ্টি হইয়াছে, যাহারা অন্নের জন্য ইংরাজের কাছে চাকরি করে, যাহাদের সমাজ নাই, যাহারা একটি পঙ্গু ব্যক্তিত্ববাদের উপাসনা করে, তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করাই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

আজ যে-কেবল বাঙালী শহরে বাস করিতেছে, তিন-চার পুরুষ পূর্বে তাহারা গ্রামেই জীবনযাপন করিত। তাহাদের চাষবাস ছিল, শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, আনন্দ-উৎসব সবই ছিল। তাহার পর ইংরেজ বণিকের হাতে যখন দেশের শাসনভার চলিয়া গেল, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে দেশের বিভিন্ন শিল্প নষ্ট হইতে লাগিল। তাঁতির কাপড়ের ব্যবসায় গেল, এবং বাঙলার বস্ত্রশিল্পকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য যে-সকল শিল্পও ছিল, সেগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইতে লাগিল। এমন অবস্থায় গ্রামের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ছিল তাহারা শহরে আসিয়া ইংরেজ বণিকের জন্য মাল কেনাবেচা করিতে লাগিল। যাহারা তাহা পারিল না, তাহারা গ্রামে থাকিয়া নিজেদের জাতিব্যবসায়ের পরিবর্তে চাষবাসে মন দিল। চাষী-মজুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং জমিদারের সুবিধা বুঝিয়া মজুরির হার কমাইয়া দিতে লাগিলেন। ভাগে চাষ করিবার বহু লোক জুটিল এবং জমিদারেরা বৎসরের পর বৎসর বিভিন্ন চাষীকে ভাগে জমি

চাষ করিবার জন্য নিয়োগ করিতে লাগিলেন। যে-জমিতে মজুর বেশী দিন একটানা থাকিতে পাইবে না, পরের মর্জির উপর যেখানে থাকা-না-থাকা নির্ভর করে, সেই জমিতে খাটিয়া-খুটিয়া সার দিয়া দুইটির জায়গায় তিনটি ফসল করা মজুরের গরজ নয়। সেই জন্য দেশের চাষের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে খারপ হইতে লাগিল।

বাঙালীর গ্রাম্য আর্থিক জীবনে গত শতাব্দী ধরিয়া এইরূপে একটানা ভাঙন চলিতেছে। তাহার ফলে গ্রামের চাষী এবং কামার, কুমোর, ছুতার ও পটুয়া, কাঁসারী অথবা স্যাকরার মধ্যে যে অন্নের বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মুচি চাষ করিতেছে, নাপিতের ছেলে কলিকাতায় পাটের দালালী করিতেছে, কায়স্থ হয় চাকরি করিতেছে নয়ত মোটর হাঁকাইতেছে। এক কথায় পূর্বে যে বর্ণ-বিভাগকে আশ্রয় করিয়া লোকের অন্ন জুটিত, আজ তাহার স্থানে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছে, কেননা জাতীয় বৃত্তির দ্বারা আর আহার জুটিতেছে না।

গ্রামের বিভিন্ন জাতির মধ্যে যেমন একটি অন্নের বন্ধন ছিল, তেমনই তাহার ফলে একটি প্রীতিরও বন্ধন বর্তমান ছিল। সেই অবস্থা হইতে হঠাৎ যখন বাঙালীকে শহরে ইংরেজ বণিকে আপিসে চাকরির সন্ধানে ছুটিতে হইল, তখন তাহার অন্নের বন্ধন পর-ভাষাভাষী, দূরদেশেবাসী জাতির সহিত স্থাপিত হইল। ইংরেজ বণিক ও বাঙালী সহকারীর চেষ্টায় যে নূতন কারবার গড়িয়া উঠিল, তাহা ভারতের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় নাই; বরং ভারতবর্ষ হইতে বহু দূরে অবস্থিত ইংলণ্ডের মঙ্গলের জন্যই প্রধানতঃ গঠিত হইয়াছিল। সেই ইংরেজের আপিসে এবং রাজ-দরবারে চাকরি করিবার জন্য গ্রাম হইতে তাঁতি আসিল, সুবর্ণবণিক আসিল, সদ্‌গোপ আসিল, কায়স্থ ব্রাহ্মণ ত আসিলই। ইংরেজের দরজায় আসিয়া তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল এবং তাহার মধ্যে যে

বেশী কর্মঠ, বেশী চতুর. সে-ই নিজের সংসার গুছাইয়া লইল। যাহারা পূর্বে একটি সমাজ দেহের হাত, পা, মাথা ছিল, আজ রাষ্ট্র-পরিবর্তনের ফলে তাহারা সবাই নূতন একটি আর্থিক সংগঠনের বাহক বা দাস মাত্র হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে দাসত্বের মাহিনা বাড়াইবার জন্য ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাধিয়া গেল। গ্রাম্য সমাজ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া টুকুরা টুকুরা মানুষগুলি শহরে পাশাপাশি বাস করিত লাগিল বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে নূতন কোনও সমাজ গড়িয়া উঠিল না। আজ তাহারা পরস্পরের সহযোগিতায় অন্ন-সংস্থান করে না, বরং অন্ন সংস্থানের জন্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই করিয়া থাকে।

ইহার ফলে বাঙালী গত শতাব্দী ধরিয়া সামাজিকতার পরিবর্তে উত্তরোত্তর ব্যক্তিত্ববাদের ঘোর উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষের মধ্যে নবপ্রবর্তিত আর্থিক ব্যবস্থার ফলে বাংলা দেশের যত পরিবর্তন হইয়াছে, অন্য কোনও প্রদেশে তত হয় নাই। অন্যান্য প্রদেশে কামার, কুমোর, বণিক, স্যাকরা, মুচি এবং চাষী সবই স্থানীয় লোক পাওয়া যায়। তাহারা পরস্পরের সাহায্য এখনও বাঁচিয়া আছে; সেখান এখনও পুরাপুরি গ্রাম্য আর্থিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া যায় নাই। কিন্তু বাঙলা দেশে ভাঙন এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে বাঙলার গ্রামে কামার, ছুতার অথবা চাষী মজুর পর্যন্ত বিহার সাঁওতাল পরগণা হইতে আনিতে হয়; এবং বাঙলায় যত কামার, কুমোর, এমন কি "হরিজন" পর্যন্ত ছিল তাহারা সবাই লেখা-পড়া শিখিয়া "ভদ্রলোক" হইয়া শহরে চাকরির সন্ধানে ঘুরিতেছে। গ্রামের সমাজে এখন আর প্রাণ নাই এবং শহরের মধ্যে ত কোন সমাজ এখন পর্যন্ত গড়িয়াও উঠে নাই। ইহার ফলে বাঙালীর চরিত্রে সামাজিক বৃত্তিগুলি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া বাঙালী একচ্ছত্র ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই সকল ঐতিহাসিক কারণের বশে, ব্যক্তিত্বের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে, আজ বাঙলা দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া নূতন কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছে না। আধুনিক বাঙলায় যে বড় লোক নাই, তাহা নহে। যাঁহারা আমাদের দেশে বড়, তাঁহারা যে-কোন দেশে, যে-কোনও কালে বড় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারা একাই বড়। একাই তাঁহারা বড় বড় কাজ করিয়াছেন। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যে দশ জন বাঙালী মিলিয়া, দশ জনের সম্মিলিত মতে কোথাও একটা বড় কাজ করিয়াছে বলিয়া দেখা যায় না।

বাঙালীর গড়া তিনটি প্রতিষ্ঠান লওয়া যাক; কাহারও নিন্দা করিবার জন্য এ আলোচনা করিতেছি না, বাঙালী-চরিত্রের পরিণতি বুঝিবার জন্যই আমাদের এ আলোচনার প্রবৃত্তি হইয়াছে। বাঙালীর গড়া নামকরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আজ কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় এবং কংগ্রেসী করপোরেশন ও বোলপুরের শান্তিনিকেতন ধরা যাইতে পারে। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এ তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী, অসামাজিক, বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ই হউক আর করপোরেশনই হউক, তাহা মোটামুটি এক-এক জন মহা শক্তিশালী বাঙালীর কীর্ত্তি। আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত সকলেই চরম ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক। তাঁহারা যে-সকল প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, তাহা অসংখ্য লোকের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। অর্থাৎ তাহা কোনও সমাজের দ্বারা গড়া জিনিষ নয়। যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের নাম করা হইয়াছে, তাহারা একান্ত ভাবে ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি। অন্য যাঁহারা আশুতোষ চিত্তরঞ্জন বা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাজ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপ বাদ দিয়া কেবল

আজ্ঞাবাহকের মত কাজ করিয়াছেন। ফলতঃ প্রতিষ্ঠানগুলি একান্ত ভাবে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এই তিন জন মহাপুরুষই মজ্জায় মজ্জায় ইংরেজী আমলের ব্যক্তিত্ববাদী বাঙালী।

গ্রামের মধ্যে একবার একটি সভায় দেখিয়াছিলাম যে যাহারা কার্যারম্ভের পরে আসে তাহারা সমস্ত সভার একটা সম্মিলিত সত্তাকে স্বীকার করিয়া লয়। দেরি করিয়া আসিলে তাহারা সভাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া পরে তাহার অঙ্গীভূত হইয়া যায়। কিন্তু শহরে বাঙালীর সভায় দেখিয়াছি যে যাঁহারা দেরিতে আসেন, এমন কি যাঁহারা সভার মধ্যেও আছেন, তাঁহারা সভার কোন স্বতন্ত্র সত্তা আছে বলিয়া মানেন না। বাহিরে যে যদু, মধু অথবা রামের সঙ্গে তাঁহাদের আলাপ ছিল, সভার মধ্যে তাহারা যে আর যদু মধু রাম নাই, বরং একটি বৃহৎ সমাজের অঙ্গ স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন, এ কথা তাঁহারা ভুলিয়া যান। সভার মধ্যে থাকিয়াও ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা পরস্পরের সুখ-দুঃখ লইয়া আলোচনা করেন। অথচ এমন হইবার কোনও কারণ নাই। সভাস্থ আমি এবং বাহিরের আমির মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ আছে ইহা স্বীকার করাই সমাজ-জীবনের মূলকথা।

বোম্বাইয়ে একদিন ট্রামে যাইতেছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া অপর এক জনের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। ট্রামের কণ্ডাক্টার তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল, "বাবু, এটি আপনার বাড়ি নয়, আরও দশ জন আছেন।" অথচ এরূপ ঘটনা বর্তমান কলিকাতা শহরে কল্পনা করাও বোধ হয় কঠিন। ট্রামে, বাসে, রেলগাড়ীতে যে মুহূর্তে আমি উঠিলাম সেই মুহূর্তেই যে আমি আর আমি নই, বরং একটি ক্ষুদ্র সমাজের সভ্য, এ-কথা সর্বদা ভুলিয়া আমরা অন্দর-

মহলের আমির মত আচরণ করি। বাঙালীর ব্যক্তিত্ববাদ-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার এই অন্দরমহলের জীবনই বড় হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালীর কংগ্রেসে, করপোরেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বত্রই আসল কাজকর্ম অন্দর-মহলে ঘটিয়া থাকে। ইংরেজী রীতি অনুসারে যে-সকল মিটিং করা হয়, সেখানে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। অন্দরমহলে যে সমাধান আগে হইতে ঠিক হইয়া আছে, তাহাই মিটিঙে পাস করাইয়া লওয়া হয়। তাহাতে অন্ততঃ বাহিরের জগতের কাছে আমাদের সামাজিক ঠাট বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ অথবা চিত্তরঞ্জনের হাতে পড়িয়া এরূপ অন্দর-মহলী অভ্যাসের দ্বারা হয়ত বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু তাঁহাদের পরে, তাঁহাদের অপেক্ষা নীরেস লোকের হাতে পড়িলে যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বারা দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? তিন জনেই সমাজ নামক কোনও অশরীরী বস্তুকে সম্মান করেন নাই। তাঁহারা যে দেশের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়াছেন এ-কথা সত্য, কিন্তু বাঙালীকে নূতন সমাজ বাঁধিতে হইলে যে-সকল সামাজিক গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে, যেগুলি ইংরেজ শাসনের পূর্বে ছিল অথচ এখন লোপ পাইয়াছে, যেগুলি ইংরেজের নিজের মধ্যে আছে এবং ইংরেজ-জাতিকে প্রভূত শক্তিদান করিতেছে, সেগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এ তিন জন শক্তিমান পুরুষ কোনও শিক্ষা দেন নাই।

ইহাই হইল বাঙালীর বর্তমান চরিত্র এবং তাহার উৎপত্তির মূলগত কারণ। বাঙালীকে আজ যদি আবার নিজের চরিত্রের সামাজিকতার বোধ আনিতে হয়, তবে নিজের মধ্যে পুনরায় তাহাকে একটি অন্যের বন্ধন স্থাপন করিতে হইবে। ইংরেজ বণিকের আপিসে অথবা রাজ-সরকারে চাকরি করিবার জন্য বাঙালী এতদিন বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম

(struggle for existence-এর) নীতি অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে ; এবার তাহাকে নূতন একটি জীবন গঠন করিবার জন্ম পারস্পরিক সাহায্যের (mutual aid-এর) শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

নিজেদের মধ্যে অন্নসূত্রের বন্ধন স্থাপন করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রয়োজন। ইহাই হইল মূলকথা। ব্যক্তিত্ববাদ আর যাহাই সাধন করুক না কেন, তাহার এ ক্ষমতা নাই যে সে আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খলকে মোচন করে। স্বাধীনতার স্পৃহা আজ দেশের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করিতেছে এবং তাহারই সাধনায় আজ দেখা যাইতেছে যে যে-ব্যক্তিত্ববাদ চাকরে বাঙালীকে অন্নসংস্থানের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল, আজ তাহাই স্বাধীনতা-অর্জনের যজ্ঞে পদে পদে বাধা দান করিতেছে। সেই স্বাধীনতার জন্মই চাকরে বাঙালীকে আজ তাহার ব্যক্তিত্ববাদ খর্ব করিয়া সামাজিকতাবোধের অভ্যাস করিতে হইবে।

বাঙালীর চরিত্র

শ্রীসত্যাশ্রয়ী

"প্রবাসী"র গত আষাঢ় সংখ্যায় বাঙ্গালীর চরিত্র নামক প্রবন্ধটি পড়িলাম। লেখকের মতে, "ব্যক্তিত্বের অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে আজ বাঙলা দেশে বিভিন্ন ব্যক্তি সম্মিলিত হইয়া নূতন কোন প্রতিষ্ঠান, কোন মহৎ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না।"

দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বাঙালীর গড়া তিনটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন ;—কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও কংগ্রেসী 'করপোরেশন' এবং বোলপুরের শান্তিনিকেতন। তাঁহার মতে, "ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলে এই তিনটির মধ্যে ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রতিষ্ঠান কয়েকটি অসংখ্য লোকের বহুমুখী সম্মিলিত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ নহে।"

যে তিনটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রতিষ্ঠান লেখক কর্তৃক এক সঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে করপোরেশন আদৌ চিত্তরঞ্জনের সৃষ্টি নহে। তিনি ইংরেজের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি গড়া জিনিস হাতে পাইয়াছিলেন মাত্র। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং ইহার গঠনের নিন্দা ও প্রশংসা সুরেন্দ্রনাথের প্রাপ্য। তবে বর্ত্তমান কংগ্রেসী দলের হাতে ইহা আসার মূলে দেশবন্ধু ছিলেন বটে। ইহার আধুনিক আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতির প্রশংসানিন্দাও অংশত তাঁহার প্রাপ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ইহাকে কোনও মতেই "মহাশক্তিশালী বাঙালীর একটি কীর্ত্তি' বলা চলে না। ইহার কোন-

কোন অংশ বাঙালীর কীর্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু এখানেও 'মহাশক্তিশালী বাঙালীর' কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবলম্বিত রাষ্ট্রনীতি লঙ্ঘন করিয়া চলিবার শক্তি ছিল না ও নাই।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত বোলপুরের শান্তিনিকেতন। প্রতিষ্ঠানটি প্রকৃত পক্ষে 'মহাশক্তিশালী বাঙ্গালীর কীর্তি' ও মূলত রবীন্দ্রনাথেরই 'প্রতিচ্ছবি'। কিন্তু ইহার মধ্যে 'ব্যক্তিত্ববাদী অসামাজিক' বাঙালীর হাতের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা, তাহাই বিবেচ্য। করপোরেশনে চিত্তরঞ্জনের বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষের সহিত একযোগে কর্ম করার সুযোগ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার আমার অধিকার নাই।

বোলপুরের শান্তিনিকেতনের কার্য্যপ্রণালী দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠ ভাবে দেখিবার সুযোগ আমি পাইয়াছিলাম। অন্তত এই ক্ষেত্রে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে লেখকের এই অভিযোগ একান্তই অমূলক। রবীন্দ্রনাথ একচ্ছত্র ব্যক্তিত্ববাদের উপাসক হইতে পারেন, কিন্তু শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির ইতিহাসের সহিত যাঁহাদের স্বল্পমাত্র পরিচয়ও ঘটিয়াছে, তাঁহারা জানেন, এই প্রতিষ্ঠানটির মূলে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্দেশ্য ছিল, তাহা লেখকবর্ণিত ব্যক্তিত্ববাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। এই বিদ্যালয়ের বিদ্যার্থিগণ বিদ্যালয়ের সমুদয় কার্য্য সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাহাতে নিজেরাই চালাইতে পারে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রধান উদ্দেশ্য। আশ্রমের পরিচ্ছন্নতা, তাহার সৌন্দর্য্যসাধন, অতিথিসেবা, আহারের ব্যবস্থা—এই সমুদয়ই ছাত্রসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত ছিল। অধিকন্তু ছাত্রদের পরিচালনা, ত্রুটি-বিচ্যুতির দণ্ডবিধান,—যাহা তৎপূর্ব্বে আর কোন দেশে কোন বিদ্যালয়ে কখনও পরীক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি, এমন সমস্ত বিষয়েও ছাত্রসঙ্ঘের

উপরেই ভার ন্যস্ত ছিল, এবং আছে। শিক্ষা-বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞ শিক্ষক—আমেরিকা, ইংলণ্ড প্রভৃতির শিক্ষকগণও, রবীন্দ্রনাথের এই নীতির প্রশংসা করিয়াছেন। কেহ কেহ এ-সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশও করিয়াছেন বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হন নাই।

বাঙলা দেশে সমুদয় বিদ্যালয়ের নীতি ছিল শৃঙ্খলার বলে কঠোর শাসন (strict discipline)। রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে একটি বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ছেলেরাই সভা করিয়া নিয়ম প্রণয়ন করিত, নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিত, নিয়ম লঙ্ঘিত হইলে তাহারা দণ্ড বিধান করিত এবং এখনও করে, তাহারা আহার্য্যের তালিকা প্রস্তুত করিত। পাকশালার বন্দোবস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিত। শৃঙ্খলার ব্যবস্থা করিত। এই সকল বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কিংবা তাঁহার সহযোগী শিক্ষকদের কর্তৃত্বের কোনও অবকাশ ছিল না।

শুধু ছাত্রদের নিজেদের বিষয় লইয়াই নহে, তাহাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত সামাজিক জীবনে তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টা যাহাতে প্রস্ফুটিত হয়, ছাত্রেরা যাহাতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে অভ্যাস করে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। ছাত্রগণ সম্মিলিত হইয়া দারিদ্রভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিল। তাহারা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের দরিদ্র বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিল, এবং ছাত্রগণই নিয়মিত ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কার্য্য করিয়া আসিয়াছে।

বিদ্যার্থীদিগের সৃষ্ট এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান আজও বর্ত্তমান আছে। এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল যে, ছেলেরা তাহাদের প্রয়োজনের নিমিত্ত ব্যাঙ্ক স্থাপন করিবে, ছেলেরাই সেই ব্যাঙ্ক পরিচালনা করিবে এবং আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য মিউনিসিপ্যালিটির ন্যায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া

তুলিবে। এইরূপে তাঁহার কল্পনা বিভিন্ন দিকে কত প্রচেষ্টার সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক সময় তাহা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু তাহা তাঁহার অনিচ্ছা বা অবহেলা প্রযুক্ত নহে। এই সকল চেষ্টার মূলে ছিল ছাত্রগণ যাহাতে সম্মিলিত হইয়া সামাজিক জীবন বিকাশে সমর্থ হয়, সেই তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ইহাকে কি একটিমাত্র মানুষের ব্যক্তিত্বের উপাসনা বলে? শান্তিনিকেতনে একটি কোঅপারেটিভ ষ্টোরস্ বর্ত্তমান আছে। ইহার প্রথম সম্পাদক ছিল এক জন ছাত্র। ডিরেক্টরগণের মধ্যে দুই জন ছাত্র রাখা নিয়ম ছিল। অনেক দিন পরে কর্তৃপক্ষের আপত্তিতে এই নিয়ম পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু গোড়ার কথা ছিল ছাত্রগণ যাহাতে সমবায়-নীতিতে অভ্যস্ত হয়। অধ্যাপকবর্গ সমেত সমগ্র আশ্রমের অন্নবস্ত্র আদি আবশ্যক সামগ্রী সকলের সমবেত চেষ্টায় উৎপন্ন হইবে, এই প্রস্তাব এবং চেষ্টাও রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। চেষ্টা ফলবতী না হইবার কারণ তিনি নহেন।

বিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে যে পর্য্যন্ত না রবীন্দ্রনাথ রেজিষ্টরী করিয়া সম্পত্তির সহিত বিদ্যালয়টি সাধারণের হাতে তুলিয়া দিয়াছেন, তত দিন পর্য্যন্ত ইহার পরিচালনার জন্য সমস্ত অধ্যাপক লইয়া একটি সমিতি ছিল। রবীন্দ্রনাথের আশ্রমে উপস্থিত থাকার সময়ে অসুস্থতা অথবা অন্য কোন কারণে তিনি অনেক আবশ্যক কার্য্যও ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু আশ্রমে উপস্থিত থাকিতে অধ্যাপক সভায় উপস্থিত হন নাই ইহা কখনও দেখি নাই। আশ্রমসংক্রান্ত প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়, প্রত্যেক বিদ্যার্থীর স্বাস্থ্য, পাঠোন্নতি, চরিত্র প্রভৃতির আলোচনা এই সমিতিতে হইত। এই সময় দীনতম অধ্যাপকও অসঙ্কোচে তাঁহার মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। কি অসীম ধৈর্য্যের সহিত রবীন্দ্রনাথ যে এই খুঁটিনাটি আলোচনায় যোগ দিতেন, তাহা ভাবিলে

আমি বিস্মিত হইয়া যাই। এই সভায় রবীন্দ্রনাথ কখনও আপন মত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যগ্র হন নাই; পক্ষান্তরে কত সময় দেখিয়াছি অধ্যাপকগণেরই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

এই অধ্যাপকগণের মধ্যে কাহারও কোন বিশেষত্ব দেখিলে তাহার উন্মেষ পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে সহায়তা করিয়াছেন তাহা অনেকেই জানেন না। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র রায়, ৺অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, ৺জগদানন্দ রায় প্রভৃতির প্রত্যেককে রবীন্দ্রনাথ গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথের পল্লীসংগঠন প্রচেষ্টার মূল কথা কি? "সমাজ গড়িতে হইলে যে-সকল সামাজিক গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে, যেগুলি ইংরেজ-শাসনের পূর্বে ছিল অথচ এখন লোপ পাইয়াছে," সেইগুলি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই তিনি যে বিপুল আয়োজন ও চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা আজও সর্ব্বসাধারণের সুবিদিত না হইয়া থাকিলে তাহা দুঃখের বিষয়। শ্রীনিকেতনের চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সমবায়-নীতিতে তাহাদের যে-সমস্ত স্বাস্থ্যসমিতি তিনি স্থাপন করাইয়াছেন, এবং সাঁওতালদিগের বিদ্যালয়, তাহাদিগের কো-অপরেটিভ ষ্টোরস্ স্থাপন করাইয়াছেন, এই প্রকার সকল বিষয় সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া থাকিলে তাহা পরিতাপের বিষয়।

শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নহে, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তক, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগের সাবেক রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ব্যর্থতা আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেন। পাবনা কন্‌ফারেন্সের পূর্ব হইতেই তিনিই প্রথম স্বাবলম্বনের সার্থকতা তাঁহার জীবন্ত জলন্ত ভাষায় সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ, তাঁহারই দেওয়া

মন্ত্র। এই মন্ত্র উচ্চারণ, তদনুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি রচনা ও তাহাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার চেষ্টা দেশবন্ধুর গঠনমূলক পদ্ধতির এবং কংগ্রেসের ও মহাত্মা গান্ধীর গঠনমূলক পদ্ধতির অনেক আগেকার কথা। তাঁহার কোন কোন স্থানের ও দিকের চেষ্টা ও আয়োজন কেন অন্যদের দোষে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা বলিবার সময় ও স্থান ইহা নয়। সমাজ নামক কোন অশরীরী বস্তুতে তিনিই প্রথম বিদেশী আমলাতন্ত্রের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। শুধু বক্তৃতায় নহে, শুধু লেখায় নহে, তাঁহার সমস্ত চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, এবং প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন, তাহা ভবিষ্যৎ বংশ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে স্বীকার করিয়া লইবে।

বাঙালীর চরিত্র

"দেশ-সম্পাদক মহাশয়,

আষাঢ় মাসের 'প্রবাসী'তে আমি "বাঙালীর চরিত্র" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার মূল বক্তব্য ছিল যে,—

১। বাঙলার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভাঙিয়া যাওয়ায় এবং তাহার জায়গায় ইংরেজের নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় বাঙালীর চরিত্রে সামাজিকতার বোধ কমিয়া গিয়াছে। বাঙালী সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিতন্ত্রবাদী হইয়া পড়িয়াছে।

২। বাঙলাদেশে কংগ্রেসে, করপোরেশনে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্যত্র যে সকল দ্বন্দ্ব ঘটিয়া থাকে তাহার জন্য ব্যক্তিত্ববাদের আতিশয্য কতকাংশে দায়ী।

৩। এই অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইলে বাঙালীর মধ্যে সামাজিকতার বোধ পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহার জন্য পরস্পরের মধ্যে পুনরায় অন্নের বন্ধন স্থাপন করা দরকার।

এই প্রবন্ধটিতে উদাহরণস্থলে আমি লিখিয়াছিলাম যে, বাঙালীর গড়া তিনটি চলতি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমাজিকতাবোধের পরিবর্তে ব্যক্তিত্ববাদের অধিক পরিচয় পাওয়া যায়। সে তিনটি প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেসী করপোরেশন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোলপুরের শান্তিনিকেতন।

শ্রাবণ মাসের 'প্রবাসী'তে ইহার একটি প্রতিবাদ বাহির হয়। প্রতিবাদকারী মহাশয় আমার মূল বক্তব্যের বিষয় আলোচনা না করিয়া

প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উল্লিখিত উদাহরণত্রয়ের মধ্যে অন্তত একটি, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন, আমার বক্তব্য সমর্থন করে না। ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'র জন্য ইহার একটি উত্তর লিখিয়া আমি সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করি। তাহাতে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন ও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলাম যে, উল্লিখিত মহাপুরুষগণের চরিত্রের যে দুর্বলতা দেখা যায়, তাহার জন্য বাঙলাদেশের সামাজিক অবস্থাই বেশী দায়ী।

কাহাকেও নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যে আমি প্রবন্ধ লিখি নাই। বাঙালীর চরিত্রে যে আজ দুর্বলতা আসিয়াছে ইহা অবিসম্বাদী সত্য। ইহা দূর করিবার পূর্বে রোগের নিদানটি ভাল করিয়া বুঝা দরকার। এবং সেই উদ্দেশ্যেই মূল প্রবন্ধ এবং প্রতিবাদের উত্তর লিখিয়াছিলাম। প্রবাসীর সম্পাদক মহাশয় দয়া করিয়া মূল প্রবন্ধটিকে স্থান দিয়াছিলেন; তাহার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তিনি প্রতিবাদের উত্তরটিকে স্থান দিতে পারিলেন না। সেই জন্য আমি বর্তমানে আপনার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি। আমার উদ্দেশ্য নিন্দাবাদ করা নয়—ইহা জানাইয়া আপনার সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যদি বিষয়টিকে সাধারণের আলোচ্য বলিয়া আপনি বিবেচনা করেন এবং যদি আপনার পত্রিকায় ইহাকে স্থান দেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিব। ইতি—

আষাঢ়মাসের 'প্রবাসী'তে "বাঙালীর চরিত্র" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আমি দুইশ্রেণীর প্রতিবাদ লাভ করিয়াছি। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণ সাক্ষ্যসাবুদের দ্বারা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, উল্লিখিত তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্তত একটি, বোলপুরের শান্তি-

নিকেতন, অসামাজিকতাদোষে দুষ্ট নহে। আশ্রম পরিচালনার কার্য মূলত গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে নির্বাহিত হয়, রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছা সে ক্ষেত্রে কার্যকরী নহে। ইহা প্রতিবাদ লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত মত, অতএব আমি তাহাকে সম্মান করি। কিন্তু সম্মান করিলেও তাঁহার সহিত আমি একমত হইতে পারিলাম না। একই তথ্য-সমষ্টি হইতে দুই রকম সিদ্ধান্ত করা বিচিত্র নহে, আমার ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। কেন এইরূপ হইয়াছে তাহা বলিতেছি।

শুধু শান্তিনিকেতনের সম্বন্ধে সমালোচনা করা ঠিক নয় বলিয়া উল্লিখিত আরও দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একত্র আমি সমালোচনার চেষ্টা করিব। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্য পর্যবেক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, সেগুলির মধ্যে কোন কর্মই একচ্ছত্রভাবে কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সাধিত হয় না। বরং সর্বত্রই নির্বাচিত কমিটি নানাবিধ কার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান গুলির কমিটিনির্বাচনে, অথবা কার্যপ্রণালীর মধ্যে আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ইচ্ছাশক্তি বেশী কাজ করিত বলিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা জন্মিয়াছে। শ্রাবণমাসের 'প্রবাসী'র প্রতিবাদে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়াও বর্ত্তমান মত পরিবর্তন করিবার কোন হেতু পাইলাম না। এই অবস্থার একটি তুলনা দিতেছি।

মাহাত্মা গান্ধী যে সময় দেশে চরকা-আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সে সময় রবীন্দ্রনাথ বজ্রকণ্ঠে সেই আন্দোলনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের নিকট কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে, আশু স্বরাজ-লাভের মোহে দেশের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, এবং ইহার জন্য তিনি প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও অন্তত পরোক্ষভাবে মহাত্মা গান্ধীকে দায়ী

করিয়াছিলেন। সে অভিযোগ ভুল কি ঠিক তাহা বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে আরও একটি কথা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে চরকা আন্দোলন কাগজে কলমে কখনও মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ হিসাবে প্রচারিত হয় নাই। সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকে। সেই প্রতিনিধিবর্গ সম্মিলিতভাবে দেশকে চরকা চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। অতএব ইহার জন্য বিধিমত গান্ধীজীকে দায়ী করা চলে না। অথচ রবীন্দ্রনাথ যে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গের তথাকথিত গণতন্ত্রের অন্তরালে মহাত্মা গান্ধীর 'মাহাত্ম্য'ই দেখিতে পাইয়াছিলেন—তাহার মধ্যে কোন ভুল ছিল না।

বাঙলাদেশে যে তিনটি প্রতিষ্ঠানের সম্বন্ধে উদাহরণছলে আলোচনা করা হইয়াছে, সেগুলির মধ্যেও তেমনই ভাবে ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বেশী পরিমাণে দেখা যায় বলিয়া আমার ধারণা। নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা ইহার জন্য দায়ী নহে। বরং যে সকল কমিটিকে কার্যের ভার দেওয়া হয়, তাহার সভ্যগণের দুর্বলতাই ইহার জন্য দায়ী। কোনও শক্তিশালী পুরুষের সম্মুখীন হইয়া কেহ কেহ নিজেদের স্বাধীন বিচারবুদ্ধি বিসর্জন দিয়া থাকেন; এরূপ সভ্যের সংখ্যা সচরাচর অল্প নহে। অথবা কমিটির মধ্যে একজনকে পরিশ্রম করিতে দেখিলে অপরাপর সভ্যগণ স্বীয় দায়িত্বে অবহেলা করেন। যাঁহারা স্বাধীন বিচারশক্তি বজায় রাখিতে পারেন তাঁহাদের সংখ্যা ও শক্তি এত কম যে অধিকাংশ কমিটি আপাতত গণতন্ত্রের নীতি অনুসারে পরিচালিত হইলেও কার্যত ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাশক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া দাঁড়ায়। বাঙলা দেশময় চরিত্রের মধ্যে যে দুর্বলতা ও আলস্য বর্তমান আছে, মূলত তাহাই ইহার জন্য দায়ী। আমার এই মীমাংসা ভুল হইতে পারে। বস্তুত ভুল হইলে

আমি সুখী হইব। কিন্তু উপস্থিত তাহা পরিবর্তন করিবার সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিবাদকারী বন্ধুগণ মূলত প্রবন্ধের বক্তব্য স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বক্তব্য এই যে, বর্তমান বাঙলাদেশে যখন সমাজ পঙ্গু, তখন আশুতোষ অথবা চিত্তরঞ্জনের মত পুরুষগণ সমাজকে শ্রদ্ধা করিবেন কেমন করিয়া? দেশে সুস্থ সামাজিক মত বর্তমান থাকিলে সে মতকে উপেক্ষা করার প্রয়োজন হইত না।

একথা যে সত্য, তাহা আমাদর স্বীকার করিতেই হইবে। বস্তুত আশুতোষ বা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে ব্যক্তিত্ববাদ আশ্রয় করাকেই আমি দোষের বলি নাই। পাঠকের মনে সেরূপ ধারণা হইলে তাহা আমার লেখার দোষে ঘটিয়াছে। আমার অভিযোগ স্বতন্ত্র; এখানে সেই অভিযোগ স্পষ্টভাবে বলিবার চেষ্টা করিব।

আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথের জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যে বিকাশ দেখা যায়, তাহা দোষের নহে বরং গুণের। ইঁহাদের কার্য-প্রণালীর মূলে কতকগুলি মহৎ বস্তু ছিল। আশুতোষ দেশে শিক্ষা বিস্তারের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, চিত্তরঞ্জনের অন্তরে অত্যাচারক্লিষ্ট দরিদ্র নরনারীকে মুক্ত করিবার অদম্য বাসনা ছিল এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সুন্দরের সর্বময় উপাসনার জন্য তেমনই একটি তেজঃপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বর্তমান। এই তিনজন পুরুষই স্বীয় স্বাতন্ত্র্যকে অন্তরের সত্য বস্তুটির সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইঁহারা অন্তরের শাসন মানিয়া চলিতেন বলিয়া বাঙলাদেশের পঙ্গু সমাজ-শাসনকে অবহেলা করিবার অধিকার তাঁহাদের ছিল। কিন্তু যাঁহারা এই সকল সত্যসেবী পুরুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সমাজকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও অন্তরে কোন সত্য বস্তু নাই। সেইরূপ ব্যক্তিবৃন্দের

জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্মই দেশে একটি সুস্থ এবং বলিষ্ঠ সমাজের প্রয়োজন আছে। আমাদের দেশের উল্লিখিত তিনজন নেতাই সেইরূপ সুস্থ সমাজ গড়িয়া তোলেন নাই বলিয়া আমি দুঃখ করিয়াছি। সম্ভবত তাঁহাদের সে শক্তি ছিল না; হয়ত ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় এত বড় পরিবর্তন কখনও সাধিত হইতে পারে না।

আমার অভিযোগ এই যে, যদি সুস্থ সমাজ গড়া তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব না হইয়া থাকে, তাঁহারা অন্তত সমাজ গড়িবার কৌশলের সম্বন্ধে দেশকে কেন শিক্ষা দিলেন না? প্রবাসীর প্রতিবাদ-লেখক মহাশয় বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শিক্ষা দিতে অবহেলা করেন নাই, এমন কি তিনি শুধু 'বাচা' নহে, 'কায়েন' সে চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার অভিযোগ এই যে, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জনপ্রমুখ পুরুষগণ যদিও বা 'কায়েন' এবং 'বাচা' সে চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা 'মনসা' অনেক ক্ষেত্রে তাহার অন্যথা করিয়াছেন। সেইজন্য আসলে তাঁহাদের সামাজিকতার শিক্ষা দেশে সঞ্চারিত হয় নাই। এই বিষয়টি পরিষ্কার করিতে হইলে দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙলার বাহিরের একজন মনীষীর সহিত বাঙালী নেতৃবৃন্দের তুলনা করিতে হইবে।

আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন অথবা রবীন্দ্রনাথ যেমন ব্যক্তিত্ববাদী, মহাত্মা গান্ধীও মূলত সেইরূপ ব্যক্তিত্ববাদী। কিন্তু তাঁহার আচরণের মধ্যে কতকগুলি প্রভেদ আছে। মহাত্মা গান্ধী অন্তরের সত্যের সাধনায় সর্বদা বিনয়ের মার্গ অবলম্বন করেন। সেই জন্য তিনি স্বীয় মতের সমর্থকগণ অপেক্ষা বিপক্ষের মতকে সর্বদা অধিক সমাদর করিয়া থাকেন। বিরোধীর মতের মধ্যে যাহা সত্য, তাহা তিনি সর্বদা বুঝিবার ও আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করেন। মহাত্মা গান্ধী কায়, বাক্য এবং মনের দ্বারা আমাদিগকে সর্বদা অপরের মতের সম্বন্ধে সহিষ্ণু ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন

হইতে বলেন। তাঁহার নিজের মধ্যেও অহমিকা কম, এবং পরকেও তিনি সর্বদা অহমিকা বর্জন করিবার শিক্ষাই দিয়া থাকেন। এই শিক্ষাই গণতন্ত্রের মূল কথা। ইহাকে আশ্রয় করিলে সর্ববিধ সুস্থ সমাজ-জীবন গড়িয়া ওঠে।

বাঙলাদেশের মনীষিগণের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ ছিল যে, সমাজ-জীবনের এই মূলগত প্রয়োজন, শ্রদ্ধা বিনয় ও নিরহঙ্কারিতার সম্বন্ধে তাঁহারা দেশকে যথেষ্ট শিক্ষা দেন নাই। তাঁহাদের ব্যক্তিত্ববাদের মূলে সত্যবস্তু থাকা সত্ত্বেও তাঁহাদের কার্যে মাঝে মাঝে যে অহমিকার ছায়া পতিত হইত, তাহা ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়। হয়ত সেজন্য তাঁহাদের অপেক্ষা তাঁহাদের পার্শ্বচরগণের দায়িত্ব বেশি। তবু এই অহমিকার ছায়াপাত তাঁহাদের সামাজিকতা বোধের শিক্ষাকে পঙ্গু করিয়া দিত।

যে সকল ব্যক্তি আশুতোষপ্রমুখ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা সেইজন্য স্বীয় অন্তরের সত্যবস্তুর সম্বন্ধে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইলেও অপরের উপলব্ধ সত্যের প্রতি অনুরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারেন না। নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অনুকরণ করিতে গিয়া তাঁহারা সেই ব্যক্তিত্ববাদের খাদটুকুও গ্রহণ করিয়া থাকেন; এবং ফলে সামাজিকতার বোধ দেশে পুষ্ট হইতে পারে না।

নিজের উপলব্ধ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া অপরের সত্যকেও মর্যাদা দিতে হইবে। শুধু বচনে নয়, আচরণে ও চিন্তায় এরূপ করিতে পারিলে তবে বাঙলা দেশে পুনরায় সুস্থ সমাজ গড়িয়া ওঠা সম্ভব হইবে।

আমাদের চিন্তার মধ্যে যেমন এইরূপে কতকগুলি পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন, অর্থনৈতিক জীবনেও তেমনই কতকগুলি চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন, ইহাই আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল। বাঙালীর

মধ্যে অন্ন-সূত্রের যে বন্ধন ছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। পুনরায় সেই বন্ধনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। শিক্ষা অথবা মানসিক চেষ্টার দ্বারা আমরা যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির বোধ সৃষ্টি করিতেছি, অন্নের সন্ধানে পরস্পরের মধ্যে সাহচর্য প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাই আরও দ্রুতভাবে, আরও দৃঢ়রূপে দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

বাঙালীর প্রতিষ্ঠান

প্রায় বাইশ তেইশ বৎসর পূর্বের ঘটনা। আমরা তখন স্কটিশ চার্চেস কলেজে পড়ি। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কয়েকজনের মনে হেদুয়া পুষ্করিণীতে একটি সাঁতারের ক্লাব স্থাপন করিবার বাসনা হইল। তাহার কয়েক মাস পূর্বে হেদুয়ায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আমরা দল বাঁধিয়া কলেজের অধ্যক্ষ ওয়াট সাহেবের কাছে মনের অভিলাষ ব্যক্ত করিলাম। তিনি খুব খুসি হইলেন এবং পরদিন এ বিষয়ে আলোচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। ওয়াট সাহেব তখন আমাদের বাইবেল পড়াইতেন, কিন্তু ক্লাসে এক বাইবেল ছাড়া অন্য প্রায় সব রকম আলোচনাই হইত, ছাত্রদের ব্যায়ামশালায় যোগদান করা কর্তব্য, কি করিলে স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রগণ কলেজের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারে, ইত্যাদি। ওয়াট সাহেবের কথাবার্তার মধ্যে কোনও দিন তাঁহাকে বলিতে শুনি নাই, "তোমরা আমার ছাত্র, আমার মুখ উজ্জ্বল কর।" তিনি সুযোগ পাইলেই আমাদিগকে

শুনাইতেন, "তোমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্রের পক্ষে এইরূপ করা উচিত, এইরূপ করা উচিত নয়, ইত্যাদি।"

যাহাই হউক, পরদিবস বাইবেল ক্লাসে আসিয়া প্রথমেই তিনি সাঁতারের ক্লাবের বিষয় উত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন আমাদের উৎসাহ দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়া সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্মকর্তার নিকট হইতে ক্লাবের নিয়মাবলী সমস্ত জানিয়া আসিয়াছেন। মাত্র চার আনা পয়সা দিয়া প্রত্যেকে সভ্য হইতে পারিবে। তদ্ভিন্ন আরও আট আনা দিয়া ব্যাজ কিনিতে হইবে এবং সুইমিং কষ্টিউমে তাহা আঁটিয়া লইতে হইবে। বাস্, তাহা হইলেই হইল। আমরা তো অবাক। কোথায় নিজেদের একটি ক্লাব হইবে, তাহাতে কেহ সেক্রেটারি, কেহ ট্রেজারার হইব, তা' নয়, একেবারে অন্য একটি ক্লাবের মধ্যে ওয়াট সাহেব আমাদের ভলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সাঙ্গ করিয়া আসিয়াছেন! আমরা তখন ভাঙা ইংরেজীতে যতখানি বলা চলে, ততখানি জোরের সঙ্গে আমাদের স্বতন্ত্র ক্লাব গড়িবার বাসনা জ্ঞাপন করিলাম। ওয়াট সাহেব মনযোগ সহকারে সব কথা শুনিলেন। তাহার পর তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা দান করিলেন, যাহার সারমর্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ওয়াট সাহেব বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে আজ যাহা বলিতেছি, তাহা ইংরেজ হইয়া তোমাদের দোষ প্রদর্শন করিবার জন্য বলিতেছি, এরূপ ভাবিও না। তোমাদের শিক্ষকরূপেই একটি কথা আমি বলিতে চাই। বাঙলা দেশে একটি বিষয় আমি লক্ষ্য করিয়াছি, যাহা ইংলণ্ডে বা স্কটল্যাণ্ডে সচরাচর দেখা যায় না। সেখানে আমরা কোনও প্রতিষ্ঠান থাকিলে তাহাকে আরও বড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার চেষ্টা করি।

নিজেদের প্রভুত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সদলবলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দখল করিয়া বসি। কিন্তু একটির পাশে আর একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়িবার কল্পনাও করি না।

"তোমাদের মধ্যে অন্তরূপ দেখিতেছি। ইহা ভাল নয়। সামাজিক শক্তির পক্ষে ইহাতে অনিষ্ট হয়। আজ যদি হেদুয়া সরোবরে তোমরা অপর একটি ক্লাব গঠন কর, তবে হেদুয়ার জলকে দুই দিন পরে দ্বিখণ্ডিত করিতে হইবে, এ পক্ষের লোক অপর পক্ষের এলাকায় সাঁতার কাটিলে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইবে। অতএব তোমাদিগকে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যরূপে সাঁতার কাটিতে হইবে, তাহা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।"

অধ্যক্ষের কথা শুনিয়া আমরা দমিয়া গেলাম, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য কে সহজে বিসর্জন দিতে চায়? অবশেষে সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের কর্তৃপক্ষ ওয়াট সাহেবের সুপারিশে আমাদের ব্যাজে ক্লাবের নাম ছাড়া আমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের ছাত্র, ইহার নির্দেশক S. C. C. চিহ্নও থাকিবে, এইরূপ শর্তে রাজি হইয়া গেলেন। আমরাও সেই হইতে অখণ্ড হেদুয়া সরোবরে সাঁতার কাটিয়া বাঁচিলাম।

ব্যাপারটি যে সময়ে ঘটিয়াছিল, তখন সমাজের বিষয়ে আমাদের মাথা ঘামাইবার বয়স নয়। মাথা আমরা অবশ্য ঘামাইতাম, কিন্তু ফল কিছুই ফলিত না। কেন না, সমাজের তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানও ছিল না, বাঙালীর সম্বন্ধে জ্ঞানের সীমা ততোধিক পরিমিত ছিল। পরবর্তীকালে সমাজের নানাবিধ সংঘাতের মধ্যে পড়িয়া, রাষ্ট্রনৈতিক কোনও কোনও প্রতিষ্ঠানে কাজ করিয়া বাঙলা দেশের প্রতিষ্ঠান এবং বাঙালীর প্রতিষ্ঠান চালাইবার কতকগুলি অভ্যাসের পরিচয় পাইয়াছি, তাহার বিষয়ে আলোচনা করা কর্তব্য বলিয়া মনে হইতেছে।

কিছুদিন পূর্বে বীরভূম জেলায় মুচী, হাড়ী ও ডোমেদের দ্বারা

অধ্যুষিত একটি পল্লীর মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল। মাঝে মাঝে আমাদের মিটিং হইত এবং মিটিং ভিন্নও সভা করিয়া হরিনাম সংকীর্তন রামায়ণ পাঠ অথবা সময়বিশেষে ভাদুর গানের পালাও বসিত। এই সকল অধিবেশনে একটি বিচিত্র ব্যাপার আমরা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। কলিকাতা শহরে কোনও মিটিঙে দেখিয়াছি, যাঁহার বক্তৃতা ভাল লাগে না, তিনি সচরাচর বিনা বাক্যব্যয়ে মিটিং ছাড়িয়া উঠিয়া যান। মিটিং যেন হাবড়া ষ্টেশন, দরকারে লোকে সেখানে আসে, কাজ ফুরাইলেই চলিয়া যায়। হাবড়া ষ্টেশনের দাবি তো কাহারও উপর নাই! কেবল দুই চারি জন সজ্জনকে লক্ষ্য করিয়াছি, যাঁহারা যাইবার পূর্বে সভাপতির নিকট অনুমতি লইয়া তবে বাহির হইয়া যান। ইংরেজগণের এক আধটি মিটিঙে গিয়াছি, সেখানে সকলেই ঐরূপ আচরণ করিয়া থাকেন। হয়তো ইংলণ্ড দেশে সভার তাহাই নিয়ম। কলিকাতায় অধিকাংশ শ্রোতা সেরূপ নিয়মের বশবর্তী নহেন।

কিন্তু হাড়ী এবং ডোমেদের সভায় বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছি— সভা হয়তো বসিয়া গিয়াছে, তখন কেহ আসিলে প্রথমে সমগ্র সভাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, তাহার পর সভাস্থ হয়। সভার একটি স্বতন্ত্র সত্তাকে তাহারা স্বীকার করে এবং সেখানে নিজেও বসিলে নিজেকে সভারই অঙ্গস্বরূপ বিবেচনা করে, স্বীয় পৃথক অস্তিত্বের কথা ভুলিয়া যায়। ইহা এক বিচিত্র নিয়ম। অথচ ইহাও বুঝি যে, সভাকে, সমাজকে, সমগ্রকে যদি আমরা ক্ষুদ্রের সমষ্টিমাত্র না ভাবিয়া তাহা অপেক্ষা মহত্তর স্থান দিই, তবেই মানুষের সামাজিক জীবন দৃঢ় হয়, সমাজ আমাদিগকে পোষণ করে।

প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ পাঠ করিয়া আমার এই ধারণাই হইয়াছে যে, পূর্বকালে ভারতবর্ষে সমাজকে এক সময় সর্বময় কর্তৃত্বের আসন দেওয়া

হইয়াছিল। ব্যক্তি তাহার নিকট আত্মনিবেদন করিত, সমাজও ব্যক্তিকে পোষণ করিত, রক্ষা করিত। অশিক্ষিত সমাজের মধ্যে সমাজের প্রতি সেই আনুগত্যের ভাব এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তাহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। ইংরেজদের সমাজ জীবন্ত, বৃদ্ধিশীল, সেখানেও ঐ আনুগত্যের লক্ষণটি বর্তমান। অভাগা কলিকাতা শহরের শিক্ষিত বাঙালীই যেন পুরাতন ভারতের আনুগত্যটুকু হারাইয়াছে, উপরন্তু ইংরেজের মত নূতন কোনও সামাজিক বোধও লাভ করিতে পারে নাই।

ইহার কারণ কি? আর সামাজিক বোধ এবং আনুগত্য যদি জাতীয় মঙ্গলের পক্ষে প্রয়োজনীয় বস্তু হয়, তবে তাহা লাভ করিবার উপায়ই বা কি?

বিষয়টি ভাবিয়া দেখিবার মত। কিছু ভাবিবার চেষ্টাও করিয়াছি, তবে ঠিক ঠিক বুঝিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যদি অপরে বর্তমান প্রবন্ধ পড়িয়া এই বিষয়ে চিন্তিত হইয়া উঠেন এবং আলোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে মঙ্গল হইবে, সন্দেহ নাই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙালী জাতির দুরবস্থা ঘনাইয়া উঠিয়াছিল। দেশে তখন অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিয়াছে, সকলের ধন এবং মান বিপন্ন। সমাজের কোনও ক্ষমতা নাই, রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আগে সমাজ যেমন ব্যক্তির নিকটে আনুগত্য দাবি করিত, তেমনি রাষ্ট্র তাহাকে রক্ষা করিত,প্রত্যেকে স্বীয় জাতীয় বৃত্তির দ্বারা অন্নসংস্থান করিতে না পারিলে সমাজপতি বা রাষ্ট্রপতিগণের নিকটে অভিযোগ করিতে পারিত, এবং তাঁহারাও এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রশক্তিবিহীন সমাজ জীর্ণ হইয়া পড়িল। মানুষকে রক্ষা করিবার শক্তি

তাহার আর রহিল না, সে কেবল মানুষের নিকট আনুগত্যের দাবি করিতে লাগিল।

এই জীর্ণ সমাজ শুচিবায়ুগ্রস্তের মত, বহিরঙ্গে শুচিতা বজায় রাখিয়া নিজের পরাধীনতার গ্লানিকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। রঘুনন্দনের আমল হইতেই আভ্যন্তরিক শুচিতার দ্বারা অন্তরের গ্লানি মোচনের চেষ্টা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সে বিষয়ে আলোচনা আজ নিষ্প্রয়োজন, ঊনবিংশ শতাব্দীর নরনারী ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিল, আরও সহজভাবে প্রকৃতির দিকে, মানব-সমাজের দিকে, ধর্মব্যবস্থার দিকে চাহিয়া দেখিতে শিখিল। বাঙালী অত্যল্প কালের মধ্যেই আবিষ্কার করিল যে, হিন্দুসমাজ শুধু শাসন করিতে চায়, পোষণ করিতে পারে না। যাহার পোষণ করিবার ক্ষমতা নাই, তাহার আনুগত্যের দাবিকে কেহই স্বীকার করে না। ফলে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া আমরা নানা দিক হইতে হিন্দু-সমাজের শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে নানাবিধ অভিযোগ ও বিদ্রোহের প্রকাশ দেখিতে পাই।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য শিক্ষিত বাঙালীর ধর্ম হইয়া দাঁড়াইল এবং ফলত হিন্দু সমাজের বন্ধন উত্তরোত্তর শিথিল হইতে লাগিল। সময়ে সময়ে ইংরেজের প্রতি রাগ করিয়া বাঙালী এক নব-হিন্দুধর্মের জয়গান করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে বাঙালীও ইংরেজী বইয়ে শেখা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়গান করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পুরোহিত ছিলেন, তিনি ইংরেজীর পরিবর্তে বেদান্তের মারফত নূতন স্বাতন্ত্র্যধর্ম প্রচার করিলেন, তাহাতে হিন্দুর জাতীয় মানও রক্ষা পাইল, অথচ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও প্রচারিত হইল। স্বামীজীও কিন্তু সমাজের জীর্ণ কলেবরকে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতের দ্বারা খান খান করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। তাঁহার অত্যল্পকালব্যাপী চেষ্টায় নূতন সমাজ গড়িয়া উঠা সম্ভব

ভয় নাই বটে, কিন্তু পুরাতন সমাজ তাঁহার নির্মম আঘাতে আমূল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজিক ইতিহাস হইতে আমরা শিক্ষিত বাঙালীর মনকে খানিক বুঝিতে পারি। সমাজের প্রতি আনুগত্যের কথা বলিলেই তাহার মন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। পুরাতনকে ভাঙিতে হইলে এরূপ ভাব নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আজ যাহা প্রয়োজন, কাল তাহা তো অনাবশ্যক হইতেও পারে।

আমার মনে হয়, বাঙালীর সেই যুগ আসিয়াছে। পুরাতন সম্পূর্ণ না ভাঙিলেও অনেকখানি ভাঙিয়া গিয়াছে। ভাঙার কাজ প্রায় শেষই হইয়াছে। কিন্তু যদি বাঙালীকে বাঁচিতে হয়, তবে তো শুধু স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধির দ্বারাই সে বাঁচিবে না, তাহাকে নূতন সমাজ বাঁধিতে হইবে, সে সমাজ আজিকার জগতে যেন তাহাকে জীবন দান করিতে পারে। এবং সেই সমাজের প্রতি তাহাকে আবার একটি একনিষ্ঠ আনুগত্যের ভাব নির্মাণ করিতে হইবে। মনে হয়, আজ সেই মুহূর্ত আসিয়াছে, এবং সেইজন্যই শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে সামাজিক বোধের অভাবকে লক্ষ্য করিয়া আমাদের মনে পীড়ার উদয় হইতেছে। সভায় বাঙালীর অসামাজিক আচরণ, শহরের পথে, ট্রামে, বাসে পরের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি নিদারুণ অবহেলার ভাব, সমিতির মধ্যে দায়িত্ববোধের একান্ত অভাব, কর্তব্যের সম্বন্ধে আশ্চর্য রকমের ঔদাসীন্য সেইজন্য বোধ হয় আমাদিগকে আজ এত পীড়া দিতেছে। কেবলই মনে হইতেছে, আজ নূতন করিয়া বাঁচিবার দিন আসিয়াছে। এমন অবস্থায় আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে, প্রত্যেক সঙ্ঘকে জাতীয় জীবনের পোষণ-কার্যের জন্য নূতন শক্তিতে গড়িয়া তুলিতে হইবে। এমন অবস্থায় যদি সমাজের প্রতি আনুগত্যের জন্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অপরিসর পথে পরিচালিত করিতে

হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আজ যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আমরা ভোগ করিতেছি, তাহার দ্বারা আমাদের চারিদিকের মানুষ কতটুকুই বা লাভবান হইতেছে? সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বৃক্ষে কিই বা এমন ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহার সৌরভ নষ্ট হইলে সমগ্র জগৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে?

এইরূপ নানাবিধ চিন্তা বাঙালীর সভায়, সমিতিতে, শিক্ষাগারে বসিয়া বহু সময় মনে হইয়াছে। হয়তো আমার মত অপরেও শিক্ষিত বাঙালীর অসামাজিকতা দেখিয়া পীড়িত হইয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে ইহার মূল কারণ এবং তাহা নিরাকরণের উপায়ের সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়। অনেকের মনেই যদি নূতন সমাজগঠনের বাসনা সঞ্জাত হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে বাঙালীর জীবনে যে তাহার সুফল ফলিবে, এ বিষয় কোনও সংশয়ের কারণ নাই।

বাঙালীর স্থাপত্য

কোন জাতির জীবনকে টুকরা টুকরা করিয়া দেখা যায় না। মানুষের আহার-বিহার, সাহিত্য, শিল্পকলা সবই তাহার জীবনের অন্তরতম ভাব প্রকাশ করে। সেই জন্য কোনও জাতির মর্ম বুঝিতে হইলে তাহার সাহিত্য পর্যালোচনা করিলে যেমন সেটি বুঝা যায়, শিল্পকলা বা স্থাপত্য পরীক্ষা করিলেও তেমনই বুঝা যায়। যদি আমরা উনবিংশ শতাব্দী এবং আধুনিক কালে বাঙালীর স্থাপত্যরীতি ভাল করিয়া পর্যবেক্ষণ করি, তাহা হইলে ঐ সময়ের বাঙালীর অন্তরে যে-সকল ভাবের দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল তাহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাই। বস্তুত বাঙলা দেশের সামাজিক ইতিহাসে যে সকল তথ্য পাওয়া যায়, স্থাপত্যের ইতিহাসও আমাদিগকে সেই সকল তথ্যে পৌঁছাইয়া দেয়।

বহু প্রাচীন কাল হইতে পশ্চিম বাঙলার ঘরবাড়ি গড়িবার একটি বিশেষ শৈলী প্রচলিত ছিল। পশ্চিম বাঙলার অধিকাংশ জেলায় খড়ের চালের বাড়িতে লোকে বাস করে। অধিক বৃষ্টির জন্যই হউক অথবা অন্য কারণেই হউক, চালাবাড়ি গড়িবার সময়ে চালটিকে চেপটা না-করিয়া হাতীর পিঠের মত কতকটা গোলাকার করা হয়।

ইহা বাঙলা, এবং বিশেষ করিয়া রাঢ় দেশের বিশেষত্ব। ভারতবর্ষের অন্য কোথাও এই ধরণের বৃত্তের ভাবাপন্ন ছাত পাওয়া যায় না। অথচ গড়নটি সুন্দর বলিয়া মোগল যুগে ইহা বাঙলা দেশ হইতে রাজপুতানায় আমদানি করা হইয়াছিল। সেখানে ঘরের পাশে ছোট ছোট বারান্দার

ছাত এখনও বাঙলার অনুকরণে বৃত্তাকার করা হইয়া থাকে এবং তাহাকে "বঙ্গালী ছত্রি" নামে অভিহিত করা হয়।

বাঙলা দেশে পূর্বকালে অধিকাংশ লোক খড়ের চালের বাড়িতে বাস করিত। কোঠাবাড়ি গড়িবার ক্ষমতা সকলের ছিল না এবং লোকে তাহা বেশি পছন্দও করিত না। খড়ের চালের বাড়ি ঠাণ্ডা হয়, এবং ইট তৈয়ারি করা অপেক্ষা মাটির দেওয়াল দেওয়া সহজ কাজ। সে-জন্য কোঠাবাড়ি বেশি হইত না, এবং কোঠাবাড়ি গড়িবার কোনও বাঁধাধরা নিয়মও দেশে স্থাপিত হয় নাই। বাঙালীর বাড়িতে গল্পগুজব করিবার জন্য রক, সামাজিক ক্রিয়াকর্মের জন্য খোলা ছাত এবং মেয়েদের সুবিধার জন্য দালানের বিশেষ প্রয়োজন আছে। কোঠাবাড়ি গড়িবার সময়ে কর্তারা বিশেষ করিয়া এ-সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতেন। ফলত কোঠাবাড়িগুলি কয়েকখানি ঘর, দালান, রক ও ছাতের সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইত। তাহাতে শিল্পের বিশেষ স্থান ছিল না। বাড়িগুলি সুন্দর দেখানোর চেয়ে বাসিন্দাদের আরাম এবং সুবিধার দিকে কর্তারা বেশি নজর দিতেন। প্রয়োজনের বোধে যাহা গড়িয়া উঠে তাহাকে সুন্দর করিবার চেষ্টা না করিলেও তাহার মধ্যে একটি স্বাভাবিক সরলতা ও সৌন্দর্য আসিয়া পড়ে। গ্রামের মধ্যে আমরা যে-সকল কোঠাবাড়ি দেখিতে পাই তাহাদের এমনই একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আছে। বৃত্তাকার চালাবাড়ির মত কোঠাবাড়িও বাঙালীর স্থাপত্যের একটি বড় উপাদান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা দেশে গ্রাম্য জীবন ক্রমশ ভাঙিয়া যাইতে লাগিল এবং ধনী ও শিক্ষিত লোকেরা উত্তরোত্তর গ্রাম ছাড়িয়া শহরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। শহরে সকলের অবস্থা ভাল, তাহা ছাড়া খুব ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া মাটির দেওয়াল ও চালাবাড়ি গড়িলে

শহরের স্বাস্থ্যহানি হইবে ভাবিয়া সকলে কোঠাবাড়ির দিকে বেশি মন দিলেন। কোঠাবাড়ির সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে সুন্দর করিয়া সাজাইবার দিকে সকলের দৃষ্টি গেল।

আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে রাজপুতানায় যে-সকল পাথরের বা ইটের প্রাসাদ তৈয়ারি হয় তাহার মধ্যে বাঙলা দেশের চালের অনুকরণে রচিত একটি উপাদান দেখা যায়। রাজপুতানার স্থপতিগণ ভারতের অন্য একটি প্রদেশ হইতে সুশ্রী জিনিস আমদানি করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বাঙলা দেশে শহরবাসীরা যখন কোঠাবাড়ি সজ্জিত করিবার ইচ্ছা করিলেন তখন তাঁহারা প্রচলিত চালাবাড়ি হইতে কোনও উপাদান না লইয়া একেবারে সাগরপার হইতে সজ্জা আমদানি করিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ শিক্ষিত ও ধনী লোক ইংরেজের অনুকরণ করিতে পারিলে আপনাকে সভ্য মনে করিতেন। সেই মনোভাবের বশে তাঁহারা কোঠাবাড়িগুলিকে বিলাতী থাম, তোরণ, সারসি, খড়খড়ি প্রভৃতি দিয়া সুসজ্জিত করিতেন।

বিলাতী থাম অথবা স্থাপত্যের অন্যান্য উপাদানের এক একটা বিশেষ অর্থ আছে। স্থাপত্যের ভাষায় এগুলি যেন এক একটি অর্থপূর্ণ শব্দ। বাঙালীর কাছে বৃত্তাকার চালা যেমন গ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহার মনে গ্রামের শান্ত নিবিড় জীবনের স্মৃতি বহিয়া আনে, ইংরেজের কাছেও তেমনই কোনও থাম গ্রীসের মন্দিরের, অথবা গ্রীকসভ্যতার সংযম ও দৃঢ়তার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কোনও তোরণ আবার তেমনই রোমের ঐশ্বর্যময় যুগের বীরদৃপ্ত স্মৃতি বহন করিয়া আনে। ইউরোপীয়েরা যখন ঘরবাড়ির মধ্যে বিভিন্ন স্থাপত্যের উপাদান সংযোজিত করেন তখন তাহার অর্থসঙ্গতির দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। শিক্ষিত ইউরোপীয়ের জীবনে গ্রীস ও রোমের স্মৃতি

আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের মত সর্বদা জাগ্রত থাকে। সেই জন্ত তাঁহারা যখন গ্রীক বা রোমের স্থাপত্যের উপাদান ব্যবহার করেন, তাঁহাদের পক্ষে অসঙ্গতিদোষের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু বাঙালী যখন স্থাপত্যের ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহার করিতে লাগিল তখন তাহার ব্যবহারে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি হইতে লাগিল। যে অলঙ্কার শুধু গৃহের নীচের অঙ্গে দিলে অর্থ হয় তাহাকে দ্বিতলে, ত্রিতলে পর্যন্ত যুক্ত করা হইতে লাগিল। ফলত ইউরোপকে অনুকরণ করিতে গিয়া স্থাপত্যের বিষয়ে বাঙালী যথেষ্ট মূর্খতার পরিচয় দিল।

অবশ্য এরূপ হওয়া বিচিত্র নয়। যে ভাষা মানুষে সদাসর্বদা ব্যবহার করে না, সে ভাষায় সৎ সাহিত্য রচনার চেষ্টা করিলে তাহা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রীসে, রোমে ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রাচীন মন্দির, সমাজগৃহ, স্তম্ভ, মঠবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপীয়ের কাছে সেগুলি জীবন্ত বস্তু, বইয়ে শেখা জিনিস নয়। কিন্তু বাঙালীর জীবনে এ সকল পদার্থ বিদ্যমান নহে। বাঙলার চালাবাড়ি, গ্রামের শিবমন্দির, দেউল, এই সকলই তাহার কাছে জীবন্ত বস্তু। কিন্তু তাহা হইতে স্থাপত্যের উপাদান সংগ্রহ না করিয়া যখন সে নির্জীব পুস্তকমালা হইতে তাহা সংগ্রহের চেষ্টা করিল, অথবা ইংরেজদের নির্মিত বাড়ির অনুকরণ করিতে লাগিল, তখন একটি আড়ষ্ট এবং সময়ে সময়ে ভ্রান্তিপূর্ণ শিল্পবস্তুর সৃষ্টি হইল। বাঙালী যে মনে মনে ইংরেজের কাছে পরাভব স্বীকার করিয়াছিল, নিজের গ্রাম্যজীবনের প্রতি তাহার মমতা কমিয়া গিয়াছিল, ইহাই স্থাপত্যে অনুকরণপ্রিয়তার মূলে বিগুমান ছিল। এই মনোভাবের ফলে বাঙালী নিজের দেশি কোঠাবাড়িকে শুধু সভ্য দেখাইবার জন্ত যেন ইংরেজী পোষাক পরাইয়া দিল।

সুখের বিষয়, কিছুদিন হইতে দেশে স্বদেশী ভাবের উন্মেষ হইয়াছে।

সেই সঙ্গে স্থাপত্যের মধ্যে ইউরোপের অনুকরণপ্রিয়তার বিষয়ে মন্দা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। বোধ হয় বাগবাজারের বোসেদের বিখ্যাত প্রাসাদে (৬৫, বাগবাজার ষ্ট্রীট) আমরা স্বদেশী ভাবের প্রথম সূচনা দেখিতে পাই। সেখানে বাড়ির গড়নে ইউরোপীয় প্রভাব বিদ্যমান থাকিলেও স্তম্ভের আকারে এবং সজ্জায় দেশি উপাদানের আমদানি করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করা এই ক্ষেত্রে বোধ হয় প্রথম হয়। কিন্তু ইহা দেশে বিস্তীর্ণভাবে সঞ্চারিত হইতে অনেক সময় লাগিল। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বসুবিজ্ঞানমন্দির রচনার সময়ে স্থপতিদের এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি ছিল, বুঝা যায়। বিজ্ঞান-মন্দিরটিতে ইউরোপীয় অলঙ্কার সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া উত্তর-ভারত হইতে সাজসজ্জা আমদানি করা হইয়াছে।

তাহার পর কিছুদিন কাটিয়া যাইবার পর বিগত দশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশী ভাবটি বাংলার স্থাপত্যে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। ইহার জন্ম সুপরিচিত স্থপতি শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকাংশে দায়ী। তিনি কাগজপত্রে প্রচার করিয়া স্থাপত্যে স্বদেশী ভাবকে খানিক পুষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু নবপ্রবর্তিত স্বদেশী স্থাপত্যের মধ্যে এখনও কিছু খাদ মিশ্রিত আছে বলিয়া মনে হয়। বাঙালী যেমন অনুকরণপ্রিয়তার বশে কোঠাবাড়িকে ইউরোপীয় পোষাক পরাইয়াছিল, এখন মনে হইতেছে সেই ভাবেই সে যেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হইতে স্থাপত্যের নানা উপাদান আমদানি করিয়া কোঠাবাড়িকে দেশী পোষাক পরাইবার চেষ্টা করিতেছে। বাড়িগুলির গড়নে বিশেষ কিছু নূতনত্ব দেখা যায় না। নবপ্রবর্তিত স্বদেশী স্থাপত্যে সংযমের অভাব প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধ স্তূপ, উত্তর-ভারতের প্রাসাদ, উড়িষ্যার তোরণ অথবা দুয়ার, এই সমস্ত বস্তুর এক-একটি অঙ্গ একই বাড়িতে একটির পর

একটি চাপাইয়া আড়ম্বরবহুল করা হয়। এই সকল ঘরবাড়ি যেন উচ্চকণ্ঠে বলিতে থাকে, "আমরা ইউরোপীয় নহি, ইউরোপীয় নহি।" কিন্তু উগ্রভাবে বলার মধ্যেই যে তাহার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে তাহা আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে, অথবা বিভিন্ন কালের স্থাপত্যের উপাদান একত্র সংগ্রহ করায় কোনও দোষ নাই; কিন্তু যদি তাহারা মূল বস্তুটিকে অলঙ্কারের আতিশয্যে ঢাকিয়া ফেলে তাহা হইলে স্থাপত্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ধরা যাউক, একটি গৃহ এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে তাহাতে শান্তি ও বিশ্রামের ভাব পরিস্ফুট হইল। ভাল স্থপতি হইলে এরূপ গৃহের সজ্জায় শুধু সেই অলঙ্কারই ব্যবহার করিবেন যাহার দ্বারা গৃহগঠনের মূল কথাটি আরও স্পষ্ট, আরও সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্তু শান্তির নীড়ে যদি হঠাৎ কতকগুলি যুদ্ধের চিত্র আঁকা হয়, অথবা তাহার চূড়ায় এমন কোন পদার্থ যোগ করা হয় যাহা দর্শকের মনে অদম্য উচ্ছ্বাসের ভাব আনয়ন করে, তবে গৃহের সহিত তাহার সজ্জার সামঞ্জস্য থাকে না।

শুধু অসামঞ্জস্য নয়, অসংযমও স্থাপত্যকে দুর্বল করিয়া থাকে। কোনও বাড়িতে যদি এত অলঙ্কার থাকে যে, বাড়ির গড়ন হইতে আমাদের দৃষ্টি সরিয়া গিয়া অলঙ্কারের দিকে বেশি নিবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে স্থাপত্যের চেয়ে তাহার সজ্জার জাঁকজমকই বড় হইয়া দাঁড়ায়। যে দেহ সুন্দর তাহাকে সজ্জিত করিতে অলঙ্কারের আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন। অলঙ্কারের বাহুল্য দেখিলেই সন্দেহ হয় যে, গড়নে বোধ হয় দুর্বলতা আছে, তাহাকে ঢাকিবার জন্য সজ্জার এত আয়োজন করা হইয়াছে।

স্বদেশীয়ানার প্রথম স্রোতে নানাবিধ ভুলভ্রান্তি হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, বাঙালী এই ভাবটিকে ক্রমশ কাটাইয়া উঠিয়াছে। আমরা বাঙালী। আমাদের নিজের জীবনযাত্রার সঙ্গে

সামঞ্জস্য রাখিয়া যে-সকল ঘরবাড়ি গড়িয়া উঠিবে, তাহাই যে খাঁটি স্বদেশী, একথা বলিবার মত সাহস বাঙালী ক্রমে ক্রমে লাভ করিতেছে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে কতকগুলি বাড়ি দেখিয়া তাহা মনে হয়। সেগুলি স্বদেশীয়ানার আতিশয্য হইতে ক্রমশ মুক্ত হইতেছে। তাহাদের সাজসজ্জায় নানা প্রদেশের স্বদেশী উপাদান থাকিলেও সেগুলি সাজানোর মধ্যে খাঁটি সৌন্দর্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলিকাতায় বালিগঞ্জ অপেক্ষা বোলপুর শান্তিনিকেতনে নবপ্রবর্তিত স্থাপত্যের মধ্যে ইহা আরও স্পষ্টভাবে সূচিত হয়। শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যরীতি প্রবর্তন করিয়াছেন শিল্পী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর। তিনি ভাল চিত্রকর ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার রচিত ঘরবাড়ির মধ্যে আড়ম্বরের বাহুল্য নাই। যতটুকু অলঙ্কার প্রয়োজন ততটুকু অলঙ্কার তিনি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের স্থাপত্যরীতি এখনও কোন স্থৈর্য লাভ করিতে পারে নাই। এখনও সময়ে সময়ে সৌন্দর্যবোধ এবং প্রয়োজনের মধ্যে বিরোধ বাধিয়া যায়। সেই জন্য বোলপুরের কয়েকখানি গৃহ শিল্পের দৃষ্টিতে সুন্দর হইলেও বাসিন্দাদের পক্ষে সম্যকরূপে আরামপ্রদ হয় নাই। নবজাত শৈলীর মধ্যে এরূপ ভুলভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী এবং ইহা জীবন্ত বলিয়াই শীঘ্র সর্ববিধ অসুবিধা কাটাইয়া উঠিতে পারিবে, আশা করা যায়।

বাঙলা দেশে স্বদেশী স্থাপত্যের মধ্যে যে প্রাণের আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ আশাপ্রদ। এ জীবনধারা এখনও কোন স্থির আকার ধারণ করে নাই বটে, তবে আমরা যতই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইব, যতই আমাদের মন ইউরোপের অথবা প্রাচীন ভারতের অনুকরণ পরিত্যাগ করিবে, যতই বাহিরের জগতে আমরা জাতীয় জীবনকে নিজের হাতে গড়িবার ও ভাঙিবার শক্তি লাভ করিব, ততই অন্যান্য শিল্পের মত আমাদের স্থাপত্যও প্রাণবান ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

বিহারে বাঙালী

বিহারে বাঙালী বিপন্ন হইয়াছে। যোগ্যতা সত্ত্বেও তাহাদের চাকরি মিলিতেছে না, নামমাত্র অছিলা পাইলেই চাকরি হইতে বরখাস্ত করা হইতেছে, তিন-চার পুরুষ ধরিয়া বিহারে যাঁহারা বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও বিহারের অধিবাসী বলিয়া স্বীকার করা হইতেছে না—এইরূপ নানা উপায়ে প্রবাসী বাঙালী সম্প্রদায় শুধু বাঙালীত্বের জন্যই আজ অপদস্থ অথবা বিপন্ন হইতেছে। ইহার হেতু সম্বন্ধে বিহারীগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে, "এত দিন ধরিয়া বিহারের ভাল ভাল চাকরি বাঙালী জাতি ভোগ করিয়াছে। তাহারা বাঙালীত্বের গর্বে স্ফীত হইয়া আমাদিগকে 'মেড়ো,' 'ছাতু' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া সর্বদা অপমানিত করিয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ফলে আজ যখন আমরা কিছু ক্ষমতা লাভ করিয়াছি, তখন সেই অপমানের যে প্রতিশোধ লইব ইহাতে আশ্চর্য কি? যোগ্যতা-অযোগ্যতার বিচার না করিয়াই শুধু বিহারীকে সরকারি চাকরি দিব, ইহাতে আর অস্বাভাবিক কি আছে?"

স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের প্রশ্ন না হয় ছাড়িয়াই দেওয়া যাক। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে আজ পরাধীনতাই "স্বাভাবিক" হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা ত সে অবস্থাকে ভাল বলি না। স্বাধীনতা আমাদের নিকট অনেকটা "অস্বাভাবিক" হইলেও আমরা তাহারই জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছি, কেন না স্বাধীনতা ভিন্ন যে ভারতের স্থায়ী মঙ্গল সম্ভব নয় ইহা আমরা স্বীকার করিয়া

লইয়াছি। বিহারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পর বিহারীর পক্ষে বাঙালী জাতিকে নানা কারণে হীনস্থ করার ইচ্ছা হয়ত স্বাভাবিক হইতে পারে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর পক্ষে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিহারীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক বলিয়াই যে ইহা ভাল, তাহা ত সত্য নয়। আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ভারতের স্বাধীনতার প্রচেষ্টা আরও অগ্রসর হইবে কি না। যদি হয় তবে ভাল, আর যদি না হয় তবে এ পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না, বিহারই হউক আর বাঙলা দেশই হউক, শেষ পর্যন্ত উভয় প্রদেশের পরিশ্রমী জনগণের কল্যাণ স্বাধীনতা লাভের উপরেই নির্ভর করিতেছে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহোদর শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন দাশ বিহারে প্রবাসী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি বিহারে বাঙালী সমিতি নামে এক সমিতি গঠনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। ইণ্ডিয়া এক্টের একটি ধারায় লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ধর্মগত, প্রদেশগত কোনও ভেদ স্বীকার করা হইবে না, সকলকে একমাত্র ভারতের অধিবাসী হিসাবেই গণ্য করা হইবে। কংগ্রেস করাচিতে অনুরূপ এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্লরঞ্জন দাশ মহাশয় এই দুইটি অনুশাসনের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে, বিহারে বাঙালীর বিরুদ্ধে বাঙালী হিসাবে কোনও অন্যায় আচরণ হওয়া উচিত নয়, বিশেষ করিয়া আজ যখন কংগ্রেসী দল বিহারে মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, দাশ-মহাশয়ের দাবি একান্ত ন্যায়সঙ্গত এবং বিহারে সকল অংশ হইতে বাঙালীগণের সম্মিলিত ভাবে এই দাবি লইয়া আন্দোলন করা কর্তব্য। আচরণের দ্বারা বিহার গভর্মেণ্ট যখন প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতেছেন, তখন বাঙালীগণ

সম্মিলিত কণ্ঠে গভর্মেণ্টকে জাতীয়তার পরিপন্থী পথ হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিবে ইহা তাহাদের ন্যায্য অধিকার এবং কর্তব্য বলিয়া মনে করা উচিত।

কিন্তু ন্যায্য অধিকার হইলেই জগতে কেহ তাহা স্বীকার করিয়া লয় না, শুধু মৌখিক আন্দোলনকে শাসক সম্প্রদায় সর্বদা উপেক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করেন। যদি কোনও দাবির পিছনে জোর থাকে, শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, শুধু তখনই শাসকবৃন্দ তাহা মানিয়া লন। এ ক্ষেত্রে প্রবাসী বাঙালী-সম্প্রদায় তাহা বুঝিতে পারিয়া শুধু যে করাচি প্রস্তাব এবং ইণ্ডিয়া এক্টের দোহাই দিয়া স্বীয় গণতান্ত্রিক দাবি পেশ করিতেছে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সকল বাঙালীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া নিজেদের সম্প্রদায়কে আংশিকভাবে আত্মনির্ভরশীল করিবার চেষ্টাও করিতেছে। বাঙালী-সমিতির দ্বারা অনুষ্ঠিত একটি সভায় বক্তৃতা শুনিয়া ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইয়াছে যে, বাঙালীরা নিজেদের ছোটখাট কারখানা খুলিয়া, শুধু বাঙালী দোকানদারের কাছে মাল খরিদ করিয়া, এবং প্রয়োজন হইলে বাঙলা দেশে বিহার হইতে আমদানি চালানি মাল বর্জনের চেষ্টা করিয়া সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বার্থকে আরও পরিপুষ্ট ও সুদৃঢ় করিতে চায়। ফলে বিহারীগণ বাঙালীর শক্তিতে শঙ্কিত হইয়া হয়ত তাহাদের নাগরিকত্বের ন্যায্য দাবি স্বীকার করিয়া লইবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভয় দেখাইয়া দাবি আদায়ের চেষ্টা স্বাভাবিক। কিন্তু প্রথম প্রশ্ন হইল, ইহা মঙ্গলের পথ কি না এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল, যদি ইহা মঙ্গলের পথ না হয় তবে প্রকৃত মঙ্গলের পথ কোথায়? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর একে একে দিবার চেষ্টা করিব।

প্রথম প্রশ্নের সোজা উত্তর হইল, ইহা মঙ্গলের পথ নয়। বাঙালী যখন বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর কাছে ভারতীয়ত্বের দাবি করিতেছেন, যখন বলিতেছেন ভারতীয়েরা তো এক জাতি, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে বাঙালীর আর্থিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা কখনও ভাল দেখায় না। তাঁহাদের ন্যায়ের দাবির সহিত আচরণের মধ্যে কি বিরোধ দেখা যায় না? হয়তো বিহারে বাঙালীগণ আজ বিপন্ন হইয়া নিজেদের সর্ববিধ অনৈক্য বিসর্জন দিয়া দৃঢ় ঐক্যবিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হইতে চান। কিন্তু ভারতের জাতীয়তা বৃদ্ধির পথে এরূপ আর্থিক স্বাতন্ত্র্যবিশিষ্ট সম্প্রদায় থাকা মোটেই কল্যাণকর নহে। নিখিল ভারতের আর্থিক স্বার্থ যখন এক হইবে, এবং সে-ঐক্য যখন আচরিত জীবনে পরিস্ফুট হইবে, তখনই প্রকৃতভাবে ভারতে জাতীয়তার উদয় হইবে। বিভিন্ন আর্থিক স্বার্থবিশিষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বী কতকগুলি সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে অথবা প্যাক্টের দ্বারা কখনও জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। যদিও বা আপাতত হয়, সেরূপ জাতীয়তা ধোপে টিঁকিবে না, সঙ্কটকালে এরূপ দুর্বল ঐক্যের বন্ধন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে।

তবে কি বাঙালী সঙ্ঘবদ্ধ হইবে না? ইহার উত্তরে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। হাঁ, বাঙালীকে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে এবং নিজের ন্যায্য অধিকারের দাবিও করিতে হইবে—করাচি প্রস্তাব এবং ইণ্ডিয়া এক্ট তাহাকে যে-অধিকার দিয়াছে, তাহা কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ হইতে দেওয়া উচিত নহে। তবে, সেই অধিকার আদায়ের জন্য আর্থিক স্বাতন্ত্র্যসাধনের ভয় দেখাইবার প্রয়োজন নাই, বাঙলায় বিহারী দ্রব্য বর্জন করিবার চেষ্টারও দরকার নাই; কিন্তু সেই অধিকারের পিছনে অন্যবিধ জোর থাকার প্রয়োজন আছে। সেই জোর সেবার দ্বারা

বাঙালী-সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। কিরূপ সেবার দ্বারা ইহা সম্ভব তাহার বিষয় আলোচনা করা যাক।

আজ কংগ্রেসী গভর্মেণ্টের হাতে বিহারের শাসনভার আসিয়া পড়িয়াছে। কংগ্রেসের কার্যপদ্ধতির মধ্যে এমন অনেক কাজ আছে যাহার ভার বাঙালী সমিতি গ্রহণ করিতে পারেন। চরকা, খদ্দর মাদকদ্রব্য বর্জন, গ্রাম-উদ্যোগের চেষ্টা—সবই বাঙালীর দ্বারা সম্ভব। যদি বাঙালীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সমিতির পক্ষ হইতে, সমিতির আর্থিক সাহায্যে, এই জাতীয় কর্ম নিষ্ঠার সহিত পূর্ণোদ্যমে করেন এবং তাহার পর কংগ্রেসী গভর্মেণ্টের নিকট বলেন, "দেখ, আমরা নিজেদের বিহারী হইতে স্বতন্ত্র ভাবি না, ভারতবর্ষের যে কাজ তাহাকেই আমরা নিজের করিয়া লইয়াছি," তখন বোধ হয় কংগ্রেসী গভর্মেণ্ট বাঙালীর ন্যায্য অধিকারগুলি অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ইহাকেই মঙ্গলের পথ বলিয়া মনে হয়। ভয় দেখাইয়া নয়, সেবার দ্বারা শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহারই জোরে অধিকার লাভের চেষ্টা সর্বতোভাবে ভাল। ভয় দেখাইয়া যে আদায় করা যায় না তাহা নহে, তবে সে উপায়ে ভারতবর্ষ আরও এত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে যে তাহাকে কখনও মঙ্গলের পথ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বিহারে প্রবাসী বাঙালীগণ একটি কথা বলিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন, "বাপু হে, এ পথ ভাল তাহা না হয় স্বীকার করিলাম, কিন্তু বিহারের বিহারীরাই কোন্ সেবার কাজ করিয়া নাগরিকত্বের অধিকার লাভ করিয়াছে? তাহারা শুধু বিহারী নামধারী বলিয়া, বিহারে জন্মিয়াছে বলিয়াই ত সরকারি চাকরি পাইতেছে, অন্যায় করিলে ক্ষমা লাভও করিতেছে। আমরা তবে এত খাটিয়া ন্যায্য দাবি আদায়ের চেষ্টা করিব কেন?" কথাটা আপাতত ঠিক শুনাইলেও বাঙালীর মত

বুদ্ধিমান জাতির পক্ষে বলা বোধ হয় শোভন হয় না। ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রদেশের চেয়ে বাঙলা দেশে রাজনৈতিক চেতনা যে বেশি,এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই; ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিলেই ইহা অনুভব করা যায়। এহেন অগ্রগামী জাতির পক্ষে উল্লিখিত প্রশ্ন করা কি শোভা পায়? আমরা তো গুটিকয়েক চাকরির সুবিধা লইয়াই বাঁচিয়া থাকিতে চাই না, ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই আমাদের উদ্দেশ্য। সেজন্য যদি আমাদের কিছু বেগার খাটিতেও হয় তাহাতেই বা দোষ কি? যদি সেই পরিশ্রমের ফলে বিহারে আমাদের ন্যায্য অধিকার পর্যন্ত স্বীকৃত না হয়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? যদি এই সঙ্গে আমরা ভারতবর্ষের জনগণকে রাষ্ট্রীয় ভাবে আরও সচেতন করিয়া তুলিতে পারি, তাহাতে তো পরোক্ষ-ভাবে গণস্বাধীনতার আন্দোলনকে আরও অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইবে। তাহা কি কম লাভের কথা? কিন্তু শুধু গীতাপাঠ করিয়া অনাসক্তভাবে কর্ম করার প্রস্তাব করিতেছি না। ইহার পিছনে একটু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও র হিয়াছে, তাহা খুলিয়া বলা আবশ্যক।

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে আজ কংগ্রেস গভর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। যে-সকল ব্যক্তি গভর্মেণ্টে মন্ত্রিত্বের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলের সম্মানিত। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমাদের ধারণা, তাঁহারা যে সকল ক্ষেত্রে ত্যাগ ও দেশসেবার দ্বারাই বর্তমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে। কয়েক ক্ষেত্রে ত্যাগ করিয়াছেন এক জন, মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছেন অপর জন। কোন কোন প্রদেশে কংগ্রেসী দল সামান্য মাত্র সেবার কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু কংগ্রেসের ভারতব্যাপী প্রতিষ্ঠার ফলে আজ তাঁহারা হাতে শাসনভার পাইয়াছেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সেবায় এতখানি ফল ফলে নাই, ইহা সুনিশ্চিত। ইহা কংগ্রেস-অধিকৃত প্রদেশগুলির সম্বন্ধেও যেমন সত্য,

বাঙলা দেশের আইনসভাস্থ কংগ্রেসী দল সম্বন্ধেও আংশিক ভাবে তেমনই সত্য। নানা কারণে মিশাইয়া কংগ্রেসী সভ্যগণ আজ আইনসভায় ক্ষমতার আসন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ক্ষমতা লাভ করিলেই তো চলে না, তাহাকে বজায় রাখার জন্যও খাটুনির প্রয়োজন হয়। সে-পথ হয় সেবার পথ, নয়তো রাজনৈতিক চালবাজির পথ। কংগ্রেসী দল শুধু সেবার দ্বারা হয়তো নিজেদের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিতে পারিতেছেন না, কেন না নূতন শাসনতন্ত্রে সত্য সত্যই তাঁহাদের খুব বেশি সেবার ক্ষমতা জন্মায় নাই। দ্বিতীয়ত, সকলের মধ্যে জনগণের সেবার ইচ্ছাও যে প্রবল ইহা বলা চলে না। এরূপ অবস্থায় কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল দেশবাসীকে হঠাৎ একটা ভয় দেখাইয়া নিজেদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিতে পারেন। আমার মনে হয়, বিহারে অকস্মাৎ বাঙালীর বিরুদ্ধে অভিযান এমনই কোনও রাজনৈতিক চালবাজি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। বোধ হয় রুশিয়ারই কোনও শাসনকর্তা এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "জনগণকে যদি আর কোনও উপায়ে না পার, অন্তত একটা যুদ্ধ বাধাইয়া কিছুক্ষণের জন্য ভুলাইয়া রাখ"। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সময়ে সময়ে মনে হইয়াছে, যে-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ বিভিন্ন প্রদেশগুলিতে শাসনভার লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলের পিছনে সেবার মূলধন নাই। তাই আজ তাঁহারা স্বীয় প্রতিষ্ঠা বজায় রাখিবার জন্য নানাবিধ বিপদের ভান করিতেছেন। বিহারে এবং হয়ত ওড়িশ্যাতে বাঙালীবিদ্বেষের মূলে তাই এবং বোধ হয় বাঙলা দেশে মুসলমানপ্রধান শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষের পিছনেও অনুরূপ কোনও প্রেরণা রহিয়াছে।

বিহারে বাঙালী সমিতির কার্যসূচী হিসাবে আমরা যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার বিষয়ে পুনরায় আলোচনা করা যাক। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, যদি বাঙালীগণ কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যভার গ্রহণ করেন,

তবে তাঁহারা কিছু প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিতে পারিবেন। পরে তাহার জোরে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলের কাছে নিজেদের ন্যায্য অধিকার চাহিতেও পারেন। ইহাকেই আমরা বর্তমান অবস্থায় সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রস্তাব বলিয়া মনে করি।

কিন্তু যদি বাঙালী সমিতি বর্তমান কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যপদ্ধতি না লইয়া আরও বিপ্লবাত্মক কার্যভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলে দেশের পক্ষে হয়তো আরও ভাল হয়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে বাঙালী সমিতির পক্ষে সেরূপ কার্যভার গ্রহণ করার সম্ভাবনা খুব কম বলিয়া মনে হয়। যাহাই হউক, কার্যপদ্ধতিটি কি তাহা আলোচনা করা যাক।

দেশের অধিকাংশ লোক যেখানে চাষী অথবা মজুর, সেখানে দেশ প্রধানত তাহাদেরই স্বার্থরক্ষার জন্য শাসিত হইলে ভাল হয়। যাহারা পর-শ্রমজীবী, তাহাদের শ্রেণীগত সুবিধার জন্য রাষ্ট্রশাসন হওয়ার কোনও হেতু নাই। তাহারা তো এত দিন সর্ববিধ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। যদি বাঙালী সমিতি চাষী ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য এখন হইতে তাহাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন এবং সুকৌশলে, অধ্যবসায়সহকারে এই কার্য পরিচালনা করেন, তবে বাঙালী সমিতি ভবিষ্যতে এক বিপুল রাষ্ট্রনৈতিক শক্তির অধিকারী হইবেন। বাঙালীকে নিজে খাটিতে হইবে এবং যাহারা খাটে তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহাদেরই স্বাধীনতার জন্য সর্ববিধ প্রচেষ্টা করিতে হইবে।

এই কার্যের ফলে বাঙালী আজ যে-সকল ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে শুধু যে তাহাই ফিরিয়া পাইবে তাহা নয়, ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে স্বরাজের পথে সে অনেক দূর অগ্রসর করিয়া দিবে। যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় আজ কংগ্রেসী গভর্মেণ্ট হাতে পাইয়া কিছু চাকরি বিতরণের সাহায্যে স্বরাজলাভের আনন্দ ভোগ করিতেছেন, উপরিউক্ত

কর্মধারার ফলে তাঁহাদের শ্রেণীগত স্বার্থ কোথায় যে ভাসিয়া যাইবে তাহার ঠিক নাই। ইহা যে শুধু বিহারে বাঙালী সমস্যার সম্বন্ধে সত্য তাহা নহে, বাঙলা দেশেও যে-মধ্যবিত্ত দল হিন্দুমুসলমান সমস্যাকে গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন, বাঙলার চাষীদের মধ্যে হিন্দুগণ রাজনৈতিক কার্য পরিচালনা করিলে অবশেষে তাঁহারাও ভাগীরথীর সম্মুখে ঐরাবতের মত ভাসিয়া যাইবেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। চাষী এবং মজুরগণের স্বরাজলাভের জন্য যে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা অথবা উভয় পক্ষের রক্তপাতের প্রয়োজন আছে, তাহা নহে। সম্পূর্ণ অহিংস অসহযোগের দ্বারা, মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত সত্যাগ্রহের দ্বারাই পরিশ্রমশীল জনগণের স্বরাজ স্থাপিত হইতে পারে ইহা আমরা অতিশয় দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি।

বাঙালী এই ভাবে রাজনীতি এবং অর্থনীতিতে বাঙালীত্ব বিসর্জন দিয়া বাঙালী হইয়া বাঁচিতে পারে। হিন্দু রাষ্ট্রনীতিতে হিন্দুত্ব বর্জন করিয়াই তবে হিন্দু সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করিতে পারে।

তবে বিহারে বাঙালী অথবা বাঙলায় হিন্দুগণ এরূপ চেষ্টা করিবেন কি না জানি না। সেইজন্য অন্তত বিহারের পক্ষে পূর্বে বলিয়াছি—বর্তমান কংগ্রেসের গঠনমূলক কার্যভার গ্রহণ করাই সমিতির পক্ষে সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ন্যায্য দাবির জন্য সমিতিকে ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালাইতে হইবে। বাঙালী সমিতি গঠনমূলক কার্যভার যদি গ্রহণ করেন, তবে বিহারে বাঙালীর স্বার্থ যে স্বতন্ত্র নয় ইহা প্রমাণিত হইবে এবং খদ্দর, গ্রাম-উদ্যোগ সঙ্ঘের কার্যাবলী অথবা স্বদেশী-প্রচারের সাহায্যে বেকার বাঙালী যুবকগণেরও কিছু কিছু অন্নসংস্থান হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

সাম্প্রদায়িক সমস্যার এক দিক*

ভারতীয় সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

মুসলমান শাসনের পূর্বে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। মুসলমান ও পরে ইংরেজের শাসনের ফলে তাহার মধ্যে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকিলেও আজ পর্যন্ত গ্রামদেশে অথবা ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে তাহার প্রাচীন রূপ কিয়দংশে বজায় রহিয়াছে।

সারা ভারতবর্ষে গ্রামাজীবনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে একটি মৌলিক সাদৃশ্য দেখা যায়। গ্রামের মধ্যে ধোপা নাপিত কামার কুমার ছুতার গয়লা কলু মালি মুচি হাড়ি ডোম প্রভৃতি জাতি বাস করিয়া সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈয়ার করে অথবা বিশেষ বিশেষ কাজ করিয়া দেয়। গ্রামের শিল্পিকুলের ঘরে যাহা পাওয়া যায় না তাহা দৈনিক বাজারে অথবা সাপ্তাহিক হাটে কিনিতে পাওয়া যায়। ইহার দ্বারাই গৃহস্থের আটপৌরে প্রয়োজন মিটিয়া যায়। পিতল-কাঁসার বাসন অথবা কাঠের দরজা জানালা কড়ি বরগা মানুষের রোজ লাগে না। ধানকাটার পর শীতকালে দুতিন মাস ধরিয়া বিভিন্ন গ্রামে মেলা বসে, এবং প্রতি মেলাতেই বিশেষ বিশেষ জিনিসের আমদানি হয়। কোথাও গরুবাছুর হাতীঘোড়া, কোথাও কাঠের দরজাজানালা কড়িবরগা, খুঁটি, ছোটবড় নৌকা, কোথাও তাঁতের সরঞ্জাম, সূতা কাপড় গামছা অথবা মশারি বেশি বিক্রয় হয়, এবং নানা গ্রামের লোক প্রয়োজনমত সেই সকল বস্তু খরিদ করিয়া লইয়া যায়। এদিকে আবার কাঁসাপিতলের

কারিগরদের মধ্যে এক শ্রেণী গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ঘুরিয়া গৃহস্থকে নূতন বাসন অথবা ধান মাপিবার পাই অর্থাৎ পিতলের কুনকে বেচিয়া পুরনো ভাঙা বাসনকোসন সংগ্রহ করিয়া থাকে। গ্রামবাসিগণও তীর্থ করিবার উদ্দেশ্যে গয়া কাশী বৃন্দাবন বা শ্রীক্ষেত্রে গিয়া প্রতি তীর্থের বিশেষ বিশেষ শিল্পসম্পদ সাধ্যমত সংগ্রহ করে। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে সারা ভারতবর্ষে মানুষের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণ ও তাহা বিক্রির কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। একজন কামার বহু খরিদ্দারের অভাব মিটাইতে পারে, একজন কলু অনেক গৃহস্থকে তেল যোগাইতে পারে। বংশবৃদ্ধির ফলে চাষীর ঘরে যে পরিমাণ অসুবিধা হয়, কারিগরের ঘরে তাহার চেয়ে বেশি হইবার কথা। ফলে পূর্বকাল হইতেই শিল্পী অথবা কারিগর শ্রেণীর লোক সময়ে সময়ে একই গ্রামে ঘন বসতি করিয়া নূতন কোন শিল্প উদ্ভাবনের দ্বারা অর্থোপার্জনের ব্যবস্থা করিয়া লইত। বর্ধমান জেলায় কামারপাড়া নামে একখানি গ্রাম আছে। সেখানকার কামারেরা পিতলের গিল্‌টি করা গয়না গড়ে এবং কলিকাতার ব্যবসায়ী মহাজন তাহা ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি বাঙলার বিভিন্ন জেলায় পাইকারদের কাছে বেচিয়া থাকে। সকল জায়গার মাটি সমান নয়। হাঁড়ি গড়ার পক্ষে কোন কোন গ্রামের অথবা মাঠের মাটি ভাল হয়। তাহার আশপাশে কুমার জাতির ঘন বসতি স্থাপিত হয় এবং বৎসরের মধ্যে সুবিধামত কোনও এক সময়ে তাহারা গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ফিরিয়া মাটির বাসন বেচিয়া আসে।

এমনই ভাবে পুরনো ভারতবর্ষে কালক্রমে তাঁতীর গ্রাম, সেকরার গ্রাম, তীর্থস্থান অথবা রাজধানীর মধ্যে পল্লীবিশেষে পটুয়া বা চিত্রকর, কাঁসারী, হাতীর দাঁতের কারিগর, সোনারূপার কর্মকার, অথবা পাথরের

খোদাইকারী জাতির ঘন বসতি হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহাদের কাজ ভারতবর্ষের সীমা ছাড়াইয়া দেশদেশান্তরেও বিক্রয় হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে বিদেশে মাল চালান দিবার কাজ এক সময়ে আরব দেশের অধিবাসীদের হাতে ছিল। চাঁদ সওদাগরের মত দেশী বণিকও একাজে যোগ দিতেন। পরবর্তীকালে ওলন্দাজ অথবা ইংরেজ ব্যবসাদারগণ রপ্তানির ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লয়। যাহাই হউক, হিন্দু আমলের ভারতবর্ষ তদানীন্তন ইংলণ্ড, ফ্রান্স অথবা জার্মানি ইটালির মত দেশের চেয়ে শিল্পসম্পদে অনেক উন্নত ছিল। মালের বাজারও বহুদূরব্যাপী ছিল বলিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি পৈত্রিক বৃত্তি অনুসরণ করিয়া সুখে সংসার নির্বাহ করিত। সওদাগরের ছেলে সওদাগরি করিত। কামারের ছেলে কামার হইত, তাঁতীর ছেলে তাঁত চালাইয়া স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিত। চাকরিজীবীর ছেলেরও চাকরির অভাব ঘটিত না।

কিন্তু উপরোক্ত ব্যবস্থায় কোথাও যে ত্রুটি ছিল না তাহা বলা চলে না। সমাজদেহে বুদ্ধিজীবীর আসন উপরে, কারিগর শ্রেণীর স্থান নীচে এবং চাষীর স্থান আরও অধম বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহার মধ্যে কেহ জলচল কেহ অজলচল। কাহারও বিদ্যাভ্যাস করিবার অধিকার আছে, কাহারও নাই। কেহ সোনারূপার গয়না ব্যবহার করিতে পারে, কেহ বা পয়সা থাকিলেও অপরের সমক্ষে সেরূপ গয়না পরিতে পারে না। কাহারও পক্ষে অপরের উঠান পর্যন্ত প্রবেশ করিবার অধিকার আছে, কাহাকেও বাহিরবাড়ির দাওয়ায় শুধু বসিতে দেওয়া হয়, ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। কেহ ব্রাহ্মণপল্লীর ভিতর দিয়া যাইবার সময়ে ডাক দিয়া যায়, যেন উচ্চবর্ণের লোকজন তাহার ডাক শুনিয়া সতর্ক হইয়া যায়। কাহারও আবার সেরূপ পল্লীর মধ্যে আদৌ প্রবেশ করিবার অধিকার নাই।

সামাজিক মর্যাদায় যেমন ইতরবিশেষ ছিল, মানুষের আর্থিক অবস্থার মধ্যেও তেমনই যথেষ্ট তারতম্য দেখা যাইত। বাণিজ্যসেবী সহজে ধনী হইতে পারিত, কামার বা কুমারের পক্ষে তাহা সম্ভব ছিল না। চাকরি-জীবী রাজা অথবা জমিদারকে আশ্রয় করিয়া ভূসম্পত্তির মালিক হইয়া শেষ বয়সে পায়ের উপরে পা দিয়া বসিয়া, অথবা তীর্থভ্রমণে দিন কাটাইত, তাহাদের উত্তরপুরুষ আলস্যে বা ব্যসনে ডুবিয়া থাকিত। কৃষকের অবস্থা সব সময়ে ভাল চলিত না। তবে কৃষকের চেয়ে শিল্পীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে গরিব মরিত বেশি, ধনী বা সাধারণ গৃহস্থের তত কষ্ট হইত না।

এমনই ভাবে ভালয় মন্দয় দিন কোনরকম কাটিয়া যাইতেছিল। এমন সময়ে ইসলাম ধর্মাবলম্বী পাঠান এবং মধ্য এশিয়ার মোগল জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশ জয় করিয়া রাজ্য স্থাপন করিল। তাহার ফলে উত্তরকালে সমাজদেহের আর্থিক অঙ্গে যে যে পরিবর্তন সাধিত হইল, তাহার আলোচনা করা যাক। পাঠান ও মোগল লুণ্ঠকেরা যখন শাসক হইয়া বসিল তখন চাকরিজীবী হিন্দু জাতিগুলি নূতন সরকারের কাছে চাকরি আরম্ভ করিল। শিল্পিগণের মধ্যে অনেকে রাজধানীর আশপাশে সমবেত হইয়া রাজদরবারের আশ্রয়পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু রাজার প্রভাব বড় শক্ত প্রভাব। ফলত খাওয়ায় পরায় চালচলনে, এমনকি ভাষা, বিদ্যা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ইসলাম এবং পারস্য সংস্কৃতির ছাপ পড়িতে লাগিল। স্বভাবত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং প্রতি প্রদেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরে এই প্রভাব বিভিন্ন মাত্রায় ফুটিয়া উঠিল। কোন কোন জায়গায় শিল্পিকুল ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইল। কোথাও বা চাকরিজীবী হিন্দুজাতির মধ্যে মুসলমানের স্পর্শজনিত নূতন উপজাতির উদ্ভব হইল। তাহা ছাড়া নানা জাতির লোকই মুসলমানী আমলে

পৈত্রিক বৃত্তিতে যথেষ্ট লাভ হইতেছে না দেখিয়া চাকরিজীবী অশ্বারোহী অথবা পদাতিক সৈনিকের ব্যবসায় গ্রহণ করিল।

অতএব পূর্বে হিন্দু আমলে সকল বৃত্তিকে একান্তভাবে বংশানুগ করিবার যে অভিপ্রায় এবং চেষ্টা দেখা গিয়াছিল, তাহার প্রভাব কিছু কমিয়া আসিল; কেননা রাজশক্তি আজ অপরের হাতে। কিন্তু গ্রাম্য সমাজজীবনের ধারা আর ঠিক আগের মত না বহিলেও খুব বেশি অদলবদল হয় নাই। মুসলমানী রাজশক্তি ভারতবর্ষে নূতন কোন অর্থনৈতিক সংগঠনের চেষ্টা করে নাই, ফলে পুরাতনটিই ঈষৎ টাল খাইবার পর কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে টিঁকিয়া গেল। গ্রামদেশে যে সকল শিল্পী বা দরিদ্র অবহেলিত জাতি ইসলামধর্ম আশ্রয়ের ফলে সামাজিক মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছিল, তাহারাও পূর্বেকার গ্রাম্য জীবনের বৃত্তিমূলক সংগঠন ভাঙে নাই,—এ বিষয়ে মোটামুটি পূর্বপ্রথা মানিয়া চলিত। মুসলমান নিকারি অল্পদিন পূর্বেও মাছ ধরিত না, শুধু কেনা-বেচার কাজ করিত। মুসলমান কলু বা জোলার পক্ষে সৈয়দের ঘরের মেয়ে বিবাহ করা সম্ভব ছিল না। মুসলমান পটুয়া বা চিত্রকর আগের মত আজও গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে মনসার ভাসান গাহিয়া পয়সা রোজগার করে। যশোহরের মধ্যে যাহারা পূজা-পার্বণে বাজনা বাজাইয়া থাকে, তাহাদের নামধাম, চালচলন, সবই গরিব হিন্দুদের মত, কেবল নৈমিত্তিক কর্মের সময় মৌলবী সাহেব আসিয়া মুসলমানী নীতি অনুযায়ী অনুষ্ঠান-গুলি সম্পন্ন করাইতে সাহায্য করেন। ময়মনসিংহের বাজনদার মুসলমান নাগরচি জাতির যে স্থান, পশ্চিম বাঙলার হিন্দু ঢুলির স্থান তাহা হইতে ভিন্ন নয়। ইসলামধর্মাবলম্বী জাতিবৃন্দের শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য অবশ্য মৌলবীগণ পূর্বাপেক্ষা তৎপর হইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুসলমান জাতিবৃন্দ বাঙলাদেশে এখনও পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক স্থাপন

করিতে, এমন কি কখনও কখনও একসঙ্গে খাইতে বসিতেও ইতস্তত করেন।

এমনই ভাবে বিহারের হিন্দু এবং মুসলমান জাতিবৃন্দ, বাঙলার হিন্দু ও মুসলমান জাতিবৃন্দ প্রত্যেকেই ভারতবর্ষের বিশিষ্ট আর্থিক সংগঠনের মধ্যে লালিতপালিত হইয়া দিন যাপন করিতেছিল। এমন কি বিহারের আদিবাসী কোল উরাঁও প্রভৃতি জাতিও এই ব্যবস্থা মানিয়া চলিত: রাঁচি জেলায় কোন গ্রামে তেলের প্রয়োজন হইলে লোকে কলুদের মত ঘানি বসায় বটে, কিন্তু জাত হারাইবার ভয়ে বলদ না জুড়িয়া স্ত্রীপুরুষে ঘানি ঠেলে। তাহারা চাষবাস করিয়া দিনযাপন করে, জাতে উঠিবার জন্ম গোমাংস ভক্ষণ বা মদ্যপান ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে। মাঝে মাঝে হিন্দু পরবে যোগদান করিয়া সাময়িক ভাবে উপবীত ধারণ করে এবং শুদ্ধাচারে থাকে। প্রতি প্রদেশে বৃত্তিগত ব্যবস্থার মধ্যে প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এখনও সে ব্যবস্থা ভাঙাচোরা অবস্থায় অনেকখানি বজায় রহিয়াছে। কেহ অপর জাতির বৃত্তি পারতপক্ষে গ্রহণ করিতে চায় না। এক সময়ে এ ব্যবস্থার দ্বারা সুফল ফলিয়াছিল, আজ অবস্থার দুর্বিপাকে কুফল ফলিতেছে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে যাহারা সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের আধিপত্য স্বীকার করিত, তাহারা হিন্দু সমাজে কোন না কোন বর্ণের মধ্যে স্থান পাইয়া যাইত। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকারগণ কর্মের মধ্যে প্রকট গুণকে বিচার করিয়া কোন্ জাতি কোন্ কোন্ বর্ণের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়া থাকিতে পারে, সে সম্বন্ধে অনুমান করিতেন। বিভিন্ন স্মৃতিকারগণের মতের মধ্যে এই জন্ম কিছু তারতম্যও লক্ষিত হয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে (৬৫ অধ্যায়) চীন, দরদ, অন্ধ্র, মদ্র, পহ্লব প্রভৃতি দস্যু জাতির পক্ষে বর্ণাশ্রমে জিজ্ঞাসন্তর গ্রহণ করিয়া

প্রবেশ করিবার কথা বর্ণিত আছে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে কোচ, ম্লেচ্ছ, সরাক প্রভৃতি জাতিকেও বর্ণসঙ্কর হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে; অথচ তাহার পূর্বে, যে বর্ণাশ্রম সমাজের গণ্ডির বহির্ভূত ছিল, এমন মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে। জৈন অথবা বৌদ্ধদের মত যাঁহারা ব্রাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠান পালন করিতেন না, তাঁহারাও হিন্দু অথবা ভারতবাসীর মধ্যেই গণ্য হইতেন, ব্রাহ্মণ্যধর্মীরা হয়ত তাঁহাদের পাষণ্ড আখ্যা দিতেন। পরবর্তীকালে ইসলামধর্মী আরব, পাঠান, তুর্কীর মত জাতি অথবা পার্শী, মালাবার প্রদেশের মোপলা (আরব) বা সিরিয়ান খ্রীস্টানগণ ভিন্ন ধর্ম ও ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভাষাভাষী হইলেও ভারতের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক সংগঠনের মধ্যে বেশ খাপ খাইয়া গিয়াছিল।

ইংরেজী আমল

এমনই ভাবে দিন চলিতেছিল। এমন সময়ে সওদাগরের বেশে ইংরেজ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া সংগঠন এবং আগ্নেয়াস্ত্রের জোরে ক্রমে শাসনের স্থান অধিকার করিলেন। রাজশক্তির সহায়তায় অতঃপর তাঁহারা ভারতে কাঁচামাল উৎপাদন বৃদ্ধির আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী পণ্যদ্রব্যের বিক্রয় বাড়াইবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে ভারতবর্ষের তাঁত শিল্প, চামড়ার কাজ, পিতলকাঁসার বাসনের ব্যবসায় দিনের পর দিন ক্ষয়ের পথে অগ্রসর হইল। রমেশচন্দ্র দত্ত ইংরেজী আমলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের আলোচনাকালে ইহার বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন।

নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে চাকরিজীবী জাতিগুলির বিশেষ কোন অসুবিধা ঘটে নাই। তবে উত্তর ভারতের মধ্যে প্রথমে বাঙলাদেশে

ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের ফলে বাঙালী চাকরি, আইন, শিক্ষা অথবা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নানা প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। দক্ষিণ ভারতেও তেমনই তামিল ভাষাভাষী জাতিবৃন্দ সরকারী চাকরিতে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। দেশী শিল্পবাণিজ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী মালের আমদানি ও বিক্রয় এবং দেশী কাঁচা মাল সংগ্রহ ও রপ্তানির দুইটি বড় কারবার দেশে গড়িয়া উঠে। বাঙালী এবং তামিলনাদের লোকে যেমন চাকরির উপলক্ষে নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে, উপরোক্ত দুইটি ব্যবসায় বৃদ্ধির সহিত তেমনই মারওয়াড়ী ভাটিয়া দিল্লীওয়ালা অথবা বোহরা শ্রেণীর মুসলমানগণও ভারতের সর্বত্র, অবশ্য প্রধানত নূতন স্থাপিত শহরগুলিকে আশ্রয় করিয়া, ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

পূর্বে হিন্দু অথবা মুসলমানী আমলে বাঙলার সেকরা বোম্বাই প্রদেশে কোঙ্কন অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের কারিগর দিল্লীতে দোকান খুলিয়াছিল, মাড়ওয়ারনিবাসী বণিক ও মহাজনের পক্ষে বাঙলায় স্থায়ীভাবে বসবাস করায় কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই, বাঙলার পণ্ডিতের পক্ষে অথবা কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণের পক্ষে ওড়িশার রাজার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বসবাস করার পক্ষে কোনও অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু তখন দেশ দেশান্তরে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। ফলে যাঁহারা বাঙলার মত দূরদেশে বহু কষ্টে আসিয়া পৌছিতেন, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশি হইত না এবং কিছুকাল পরে আচারে ব্যবহারে এবং ভাষায় তাঁহারা বাঙালীর অনেকখানি গ্রহণ করিতেন। হয়তো ব্রাহ্মণবর্ণের মধ্যে রাঢ়ী দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি পরস্পর হইতে বিশ্লিষ্ট সমাজ কালক্রমে এইভাবেই গড়িয়া উঠে। কিন্তু আজ রেলগাড়ির দৌলতে যাঁহারা ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চাকরি অথবা ব্যবসায়ের জন্য ঘুরিয়া বেড়ান তাঁহাদের পক্ষে পূর্বের

মত স্ব-সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দেশাচার হারাইবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহারা ছেলেমেয়ের বিবাহ অনায়াসে পুরনো দেশে পুরনো সমাজেই দিতে পারেন। ফলে, স্থানীয় অধিবাসিগণের সঙ্গে ভাষা এবং আচার-ব্যবহারে আগন্তুকগণের প্রভেদ স্থায়ী হইয়া যায়।

সমাজের এই যেমন এক দিক, তেমনই আরও একটি দিক লক্ষ্য করিবার আছে। শিল্পী জাতিবৃন্দের মধ্যে যাহারা বিদেশী পণ্য প্রসারের ফলে সমধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহাদের অনেকেই দারিদ্র্যের তাড়নায় শ্রমজীবী চাষীর পদে নামিয়া আসিল। বাজারে জনমজুর বা মুনিষমান্দেরের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মজুরির হারও কমিতে শুরু করিল। ভাল চাষীকে ভাগ বেশি দিতে হয়, জমির মালিক অধিক লাভের আশায় মন্দ চাষীকে জমি বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন, জলসেচের জন্য স্বীয় কর্তব্যে অবহেলা দেখাইতে লাগিলেন; ফলে দেশে চাষেরও অবনতি ঘটিতে লাগিল।

শিল্পীকুলের মধ্যে কেহ কেহ গরিব চাষীমজুরে পরিণত হইল, কেহবা কোনও উপায়ে শিক্ষার সুযোগ লাভ করিয়া অন্যান্য চাকরির রাস্তা ধরিল। পূর্বে বলিয়াছি, চাকরিজীবী ব্রাহ্মণ, বৈদ্য বা কায়স্থের অসুবিধা ঘটে নাই। তাঁহারা নবাবী আমলে যেমন নায়েব গোমস্তার কাজ করিতেন, এখনও তেমনই সরকারী অথবা বিদেশী মার্চেণ্ট আপিসে মুৎসদ্দি অথবা ছোট-বড় কেরানীর কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। মারওয়াড়ী অথবা বিলাতী বণিকের প্রতিযোগিতার ফলে কোণঠাসা হইয়া সুবর্ণবণিক গন্ধবণিক প্রভৃতি ব্যবসায়ী জাতির অনেকে ব্রাহ্মণ কায়স্থের মত চাকরি ওকালতি ডাক্তারির বাজারে প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সর্বত্র লোকে দলে দলে পৈত্রিক ব্যবসায় ছাড়িয়া যে যেদিকে একটু আশার আলো দেখিতে পাইল, সেই দিকে ছুটিয়া নূতন নূতন বৃত্তি আশ্রয় করিতে আরম্ভ করিল।

ইংরেজী শাসনের আওতায় এইরূপে দেশে যে আর্থিক বিপ্লব সংসাধিত হইল, তাহার ফলে পুরনো ভারতবর্ষের আর্থিক সংগঠনের সৌধ প্রায় ভাঙিয়া গিয়াছে। সমগ্র দেশের মধ্যে কেহ গরিব হইয়াছে, কেহ ধনী হইয়াছে। যাঁহারা আর্থিক ইতিহাসের সংবাদ রাখেন, তাঁহাদের মতে ইংরেজী শাসনের ফলে শুধু যে লোকে পৈত্রিক বৃত্তি হইতে বিচ্যুত হইয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের জনসমূহ সর্বসাকুল্যে আজ পূর্বাপেক্ষা অনেক গরিব হইয়াছে। অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টির প্রভাবে আগে যত লোক মরিত, অথবা যতটুকু অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ সীমাবদ্ধ থাকিত, আজ তাহা অপেক্ষা সবই যেন বেশি বেশি হয়, বহুদূর পর্যন্ত মৃত্যু ও দারিদ্র্যজনিত রোগের কঙ্কাল ছায়া ছড়াইয়া পড়ে। উপরন্তু, ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ধনবৈষম্যের মাত্রা আগের চেয়ে অনেক গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে; অর্থাৎ বড়লোক এবং গরিবলোকের মধ্যে আয়ের তারতম্য আগে যত ছিল, আজ তদপেক্ষা বেশি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাঁচিবার চেষ্টা

রোগীর দেহ যখন বিষে জরজর হয়, তখন ভিতরের রোগ বাহিরে নানা আকারে প্রকাশ পায়। পা ফুলিয়া উঠে, গায়ে জ্বর হয়, কোন অঙ্গে ক্ষত দেখা দেয়, কখনও বা অন্ত্রের ব্যাধি জন্মায়। বৈদ্য পৃথক্ পৃথক্ এগুলির নিরোধ করিবার চেষ্টা করেন; পায়ে পুলটিস দেন, জ্বর বন্ধ করিবার জন্য পাচনের ব্যবস্থা করেন, ঘায়ে মলমের প্রলেপ দেন। কিন্তু রোগ তাহাতে সারে না; আবার নূতন নূতন উপসর্গ দেখা দেয়। উত্তম বৈদ্য জ্বরের বা ক্ষতের যন্ত্রণা উপশমের সামান্য চেষ্টা করিয়া মূল ব্যাধির চিকিৎসায় তৎপর হন, কেননা মূল রোগ দূর হইলে উপসর্গগুলিও ক্রমে ক্রমে সমূলে দূর হয়।

আমাদের দেশের অবস্থা জীর্ণ অনাদৃত রোগীর মত। চিকিৎসকের সংখ্যার কিন্তু অন্ত নাই। ভারতমাতার সহ্যগুণেরও সীমা নাই; তিনি অধম বৈদ্যই হউক অথবা উত্তম বৈদ্যই হউক সকলের চিকিৎসা নীরবে সহ্য করিয়া থাকেন। এখন, মূল রোগের বৃদ্ধির সহিত আমাদের দারিদ্র্য রোগের চিকিৎসা কোন্ কোন্ উপায়ে চলিয়াছে এবং লোকে দুঃখের তাড়নায় কেমনভাবেই বা বাঁচিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা দেখা যাক।

ইংরেজ জাতি দেশের শাসক। তাঁহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা এবং তাহার ফলাফলের আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। কিছুদিন চেষ্টা এবং শক্তি প্রয়োগের ফলে রাজশক্তি যখন বেশ স্থায়ী হইয়া বসিল, তখন ইংরেজ লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করিবার জন্য এক নূতন দিকে মন দিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ভিন্ন কাশী, অযোধ্যা প্রভৃতি রাজ্য জয় অথবা লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ জাতির হাতে তখন অনেক টাকা জমিয়াছিল। ঐ টাকা তো বেকার ফেলিয়া রাখা যায় না। আবার, বিলাতে কলকারখানা খুলিলে মজুরির হার বেশি হওয়ার ফলে মুনাফার অঙ্কে ঘাটতি পড়িবে; অথচ ভারতের মত দরিদ্র দেশে লাভের অঙ্ক তদপেক্ষা অনেক বেশি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাই ইংরেজ রেলগাড়ি, চটকল, নীল এবং চিনির কারখানা, কয়লার খনি, ব্যাঙ্ক এবং ইনসিওরেন্স প্রভৃতি নূতন নূতন কারবারে সঞ্চিত ধন খাটাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজের কাছে জাতের বালাই নাই। গরিব ভারতীয় প্রজা দলে দলে নূতন কাজে ভিড় করিতে লাগিল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ টাকা নির্বিঘ্নে থাকিবে এই ভরসায় বিলাতী কোম্পানিতে সঞ্চয়ের কড়ি গচ্ছিত রাখিতে লাগিল। ফলে ইংরেজ ধনীর লাভের অঙ্ক দিনের পর দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই লাভের অঙ্ক দেখিয়া দেশী লোকের মধ্যে যাহারই কিছু পয়সা

আছে, সে বিদেশীর অনুকরণে কলকারখানা, ব্যাঙ্ক বা ইনসিওরেন্সের কারবার খুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ইহাতে ইংরেজ বণিকের বিপদের সম্ভাবনা থাকায় তাঁহারা বিলাতে ও ভারতবর্ষে গভর্মেণ্টের উপর নানাবিধ চাপ দিয়া বড় শিল্পবাণিজ্যে বা মহাজনী কারবারে ভারতীয়দের অগ্রগতির পথে নানাবিধ অন্তরায়ের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন। কেবল সদর রাস্তার মত খোলা রহিল মজুরির কাজ, কেরাণীর চাকরি, কাঁচা মাল খরিদ ও বিক্রয় এবং বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের খুচরা বিক্রয়ের ব্যবসায়। মজুরির কাজে শরীর খাটাইতে হয়; হাতের কাজে নৈপুণ্যের প্রয়োজন; ব্যবসাবাণিজ্যে শিক্ষা, বুদ্ধি এবং পরিশ্রমের দরকার। তাই সব দেখিয়া শুনিয়া লোকে চাকরির বাজারেই বেশি ভিড় করিতে লাগিল।

সরকারের ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্কল্প

সরকার তখন ভাবিলেন, চাকরির বাজারে বড় কোলাহল শোনা যাইতেছে, ইহার একটা বিহিত করা কর্তব্য। আমার ঘরের পাশেই একটি বস্তি আছে। বস্তিতে বহু পরিবারের বাস, কিন্তু জলের কল মাত্র একটি। অথচ জল সকলেরই লাগে, কেহবা কলতলায় বসিয়া স্নান করিতে চায়। ফলে রোজ সকালবেলা কলতলায় ঝগড়া বিবাদ লাগিয়া যায়। কেহ বলে, আমি আগে আসিয়াছি, আমার জল আগে চাই। কেহবা বলে, আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পার তো জল আগে লও। ফলে রোজই কলতলায় নানা যুক্তির মধ্যে ঝগড়া বাধিয়াই থাকে। যাহার গলার জোর বেশি বা লজ্জা ঘৃণার বালাই নাই, সেই জেতে। চাকরির বাজারেও তাই। কেহ পুরুষানুক্রমে চাকরি করিতেছে, কেহবা

সবে দুই পুরুষ হইল তাঁতের কাজ বা মুদির দোকান ছাড়িয়া এই পথে নামিয়াছে। ফলে পদপ্রার্থীদের মধ্যে কলহবিবাদ ঈর্ষাবিদ্বেষ বাড়িতেই থাকে।

বিহারে বিহারী দেখে ভাল চাকরিগুলি ইতিমধ্যে অধিকাংশ বাঙালীর দখলে গিয়াছে। তাহাদের রাগ হয়, বাঙালী আমাদের দেশে থাকে অথচ চালচলন সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে, আমাদিগকে ঘৃণা করে। অতএব সুযোগ পাইলে ইহাদিগকে তাড়াইতে হইবে। বাঙলায় মুসলমান দেখে, ইতিমধ্যে সব ভাল কাজে উচ্চবর্ণ হিন্দু জাঁকিয়া বসিয়াছে, তাহাদের তাড়ানো প্রয়োজন। তপশীলভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ঈর্ষাদ্বেষ ও অপমানের বোধ তীব্রতর হইয়া উঠে, তাহারাও সুযোগ খোঁজে। ইংরেজ সরকার দেখেন জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কলহ বিভেদ ভয়ংকর আকার ধারণ করিতেছে। তাঁহারা ভাবেন, ইহা ভারতবর্ষের চিরাচরিত অনৈক্যের আধুনিকতম বিকাশ। অবশ্য এ কথা সত্য যে, পুরনো দিনে ভারতবর্ষের সমস্ত অধিবাসী একই রাষ্ট্রীয় শাসনের দ্বারা পুষ্ট একটি অধিজাতি বা 'নেশনে' পরিণত হয় নাই এবং ইহাও সত্য যে, বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টায় যখন ইংরেজ ভারতের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিলেন, তখন পরাধীনতার পঙ্কতিলক ভারত-বর্ষের সকল অধিবাসীর কপালে সমভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এক অধিজাতিত্বের বোধও ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। কিন্তু ইংরেজ ভুলিয়া যান যে, যখন তাঁতী তাঁতের কাজ করিয়া সচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিত, কামার কুমোর ধোপা নাপিত গন্ধবণিক সুবর্ণবণিক জাতীয় ব্যবসায় হারায় নাই, যখন জনমত প্রতি জাতির বৃত্তি রক্ষা করিয়া চলিত, যখন স্বদেশে অর্থাৎ তীর্থসূত্রে আবদ্ধ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং বিদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার অক্ষত অবস্থায় ছিল, তখন পরস্পরের

মধ্যে সহযোগিতা ও সখ্যের বন্ধনে লোকে জীবন যাপন করিত। তখন হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্ম পৃথক হইলেও প্রতি ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন জাতির বৃত্তি স্থির ছিল বলিয়া ঈর্ষাদ্বেষের অবকাশ ছিল না। আজ ধনতন্ত্রের প্রভাবে ভারতের জীবনযাত্রা চাকরি মজুরি এবং ছোটখাটো কারবারের সঙ্কীর্ণ গলি পথে ধাবিত হইতেছে বলিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাইবে, ইহাতে আশ্চর্য কি?

ভারতবর্ষের আয়তন রুশ বাদে অবশিষ্ট ইউরোপ খণ্ডের সমান; এখানে জগতের সমগ্র জনসমূহের পঞ্চমাংশ বাস করে; বাংলা, গুজরাটী, তামিল, তেলুগু লইয়া বহু ভাষা প্রচলিত আছে। তৎসত্ত্বেও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত যে সৌহার্দ্য আছে, ফরাসী বা জার্মান, ইতালীয় বা গ্রীক, ইংরেজ বা রুশ প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ জাতির পরস্পর সম্পর্কের সহিত তুলনা করিলে আজও ভারতবর্ষকে তো স্বর্গরাজ্যের সমান বলিতে হয়। হিন্দু-মুসলমান, বর্ণহিন্দু বা তপশীলভুক্ত হিন্দুর সংঘর্ষ ইউরোপের বিভিন্ন অধিজাতির সংঘর্ষের তুলনায় কিছুই নয়।

তথাপি প্রজার মধ্যে চাকরি বা ব্যবসায়সূত্রে প্রতিযোগিতা ও মনোমালিন্যের উদয় হইতেছে দেখিয়া, রাজধর্মের দায়িত্ব স্মরণ করিয়া, ইংরেজ শান্তি স্থাপনায় মন দিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থা করিলেন, প্রতি প্রদেশে স্থানীয় অধিবাসিগণকে চাকরির বাজারে সমধিক আদর দেখানো হইবে। বিহারে তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যে কংগ্রেসী মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাও ১৯৩৮ সালে অবস্থার চাপে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করিবার সাহস পান নাই। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। বাঙলায় মুসলিম লীগের অধীন মন্ত্রিগণ অনুরূপ নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ইহাতে রাগ করিবার অথবা হতাশ হইবার কিছু নাই।

কলতলায় যখন লোকের অত্যধিক ভিড় হয়, তখন কলের সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়াই সকলের চেয়ে ভাল উপায়। ইংরেজের প্রসাদে যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কতটুকুই বা ক্ষমতা ছিল? দেশের দারিদ্র্যের মূল যেখানে, সেখানে হাত দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। এমন অবস্থায় শুধু বাহিরের ঘায়ে মলম লাগাইবার ক্ষমতাটুকু ভারতবাসীর হাতে তুলিয়া দেওয়ার অর্থ, তাহাদের শক্তিকে ব্যঙ্গ করা মাত্র।

উপায় কি?

রোগের আসল প্রতিকার হয়, দেশ যদি স্বাধীন হয় তবে। আমাদের সমাজদেহে বহুবিধ দোষ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার ভিতর দিয়া যদি সেই সকল দোষের প্রভাব হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি, তবে স্বাধীনতা আসিবেই আসিবে। সে স্বাধীনতার অর্থ, সর্বসাধারণ মানুষের স্বাধীনতা। তাহাদের কল্যাণেই সকলের কল্যাণ। স্বীয় কল্যাণ সাধনের শক্তি যেন সকলে আয়ত্ত করে এবং বাহুবলের পরিবর্তে সঙ্কল্পের দৃঢ়তার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা যেন সকলেই সমান হয়, ধনবৈষম্য যেন সমাজ হইতে রোগের মত দূরীভূত হয়। সমাজের মধ্যে বংশ বা অর্থগত মর্যাদার ভেদ যেন বিলুপ্ত হইয়া যায়, গুণেরই যেন যথার্থ সমাদর হয়। তবেই বলিব, স্বাধীনতা সত্য সত্যই আসিল।

কেমন করিয়া সে ক্ষমতা আসিবে আজ তাহা আমাদের বিবেচনার বিষয় নয়। কিন্তু যদি সেই ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তে আসে, তাহা হইলেই কি এতদিনের আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য, ধনতন্ত্রের প্রভাবে পরস্পরের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জন্মিয়াছে তাহার সবই

ভানুমতীর ভেল্কির মত মন্ত্রবলে উড়িয়া যাইবে, এবং তাহার জন্ত স্বতঃ চিকিৎসার কোনও আয়োজন করিতে হইবে না? আমার মনে হয়, সাম্য স্থাপনের জন্ত দীর্ঘদিন বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে; তবে স্বাধীনতা লাভের পূর্বেও যে সে বিষয়ে কিছুই করা যায় না তাহাও নহে। বাঙলাদেশ অথবা বিহারে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতার ফলে বাঙালী-বিহারী অথবা হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সমস্তা আজ যে আকার ধারণ করিয়াছে, প্রজার পক্ষ হইতে সে বিষয়ে কি করণীয় তাহা বিবেচনা না করিয়া, রাজসরকারের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে কি করা যায়, তাহার আভাস দিয়া বর্তমান প্রবন্ধ শেষ করিব। অভিপ্রায় থাকিলে এরূপ উপায়ের দ্বারা পুরাতন অন্তায়-অবহেলার অনেকখানি প্রতিবিধান করা যায় এবং বর্তমান সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে অনেকাংশে প্রশমিত করা যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।

প্রথমে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিদেশী ও তাহার ছায়ায় পুষ্ট স্বদেশী ধনতন্ত্রের প্রভাবে সমাজের সকল শ্রেণী ও জাতি সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। চাকরিজীবী আজও চাকরি করিতেছে; তবে আগে তাহারা যেমন সহজে ভূসম্পত্তির মালিক হইত, আজ তাহার পরিবর্তে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া বা কলকারখানার শেয়ার খরিদ করিয়া উত্তরপুরুষের জন্ত আর্থিক সচ্ছলতার আয়োজন করিতেছে। কিন্তু মুচি কামার কাঁসারি অথবা তাঁতীর কাজ অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। পুরনো হিন্দু আমলে যাহারা কারিগর শ্রেণীর মত সমাজের অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরে ছিল, তাহাদের অবস্থা হইয়াছে খুব সঙ্গিন। কেহ চাষীমজুর হইয়াছে, কেহ চটকলের কুলি হইয়াছে, কেহবা লেখাপড়া শিখিয়া ছোট-খাটো চাকরির চেষ্টা করিতেছে। সেখানে আবার প্রদেশবিশেষে কোথাও বাঙালীর, কোথাও তামিলের ভিড়, কোথাও বা ব্রাহ্মণ কায়স্থের অধিকার

একচেটিয়া হইয়া আছে। চাষী শ্রেণীর অন্তর্গত জাতিপুঞ্জের মধ্যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, হাড়ি ডোম বাগদি বাউরি কেওরা মালি মুচিদের দারিদ্র্যের আর সীমা নাই। অরণ্যবাসী কোল সাঁওতালদের দশাও তদনুরূপ হইতে বসিয়াছে।

অতএব আজ যদি বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট মনে করেন যে, প্রতি জাতির সংখ্যা গণনা করিয়া প্রত্যেককে সংখ্যার অনুপাতে চাকরির বাজারে আসন দিবেন, তবে বিচার সুবিচার না হইয়া হবুচন্দ্র রাজার বিচারের মতই হইবে। বিহারের গভর্মেণ্ট যদি এই উদ্দেশ্যে বাঙালীর চাকরি পাওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হন, বাঙলার গভর্মেণ্ট যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিরুদ্ধে অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, অথবা বাঙলাদেশে যত মারওয়াড়ী দিল্লীওয়ালা ব্যবসায় করিয়া থাকে, যত হিন্দুস্থানী কুলি মজুর মিস্ত্রি বা সাঁওতাল পরগণা অথবা পূর্ণিয়া জেলা হইতে আগত ধান কাটার মজুর আসে, তাহাদের সকলকে নূতন আইন প্রবর্তনের দ্বারা খেদাইয়া দেন, তাহা হইলেই যে ন্যায়ের দাবি ষোল-কলায় পূর্ণ হইয়া উঠিবে ইহা কেমন করিয়া বলিব?

যাহারা অনাদৃত ও অবহেলিত, অথবা জীবনসংগ্রামে নানা কারণে পারিয়া উঠিতেছে না, তাহাদিগকে বিশেষ আদর সহকারে জীবনযুদ্ধের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা বা অতিরিক্ত সুযোগ দেওয়ায় কোন দোষ হয় না। কিন্তু সে চিকিৎসাপদ্ধতির আনুষঙ্গিক দোষও একটি আছে: উহার ফলে প্রাদেশিকতার বৃদ্ধি, অথবা সম্প্রদায়গত, ভাষাগত, ধর্মগত, দলীয় ভাব আশু লাভের সম্ভাবনায় পুষ্টিলাভ করিতে পারে। যে বিভেদ পূর্বে অল্প ছিল তাহা চাকরি বা ব্যবসায়ে সুবিধা পাইবার আশায় উৎসাহ পাইয়া বিরাট হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ধানচাষের সময়ে মাঠে আল বাঁধিতে হয়, কিন্তু আলে সুবিধা হইতেছে বিবেচনা করিয়া কোন নির্বোধ যদি

তাহাকে পাঁচিলের মত উঁচু করিয়া বাঁধে তবে শেষ পর্যন্ত চাষই বন্ধ হইয়া যাইবে।

তবে উপায় কি? আমার মনে একটি সদুপায়ের চিন্তা আসিয়াছে। পাঠকগণের নিকট আবেদন করিতেছি, তাঁহারা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রতি প্রাদেশিক গভর্মেণ্টকে প্রথমে স্বীয় এলাকার মধ্যে কোন্ জাতির কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। কেন না ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে সকল জাতির উপর আঘাত ও পরিবর্তনের মাত্রা সমান হয় নাই। বাঙলায় মুসলমানের যে অবস্থা পঞ্জাবে তাহা নহে। দ্বিতীয়ত, দুইশত বৎসর ধনতন্ত্রের ঝড়ে কাহার ঘর কতখানি ভাঙিয়াছে, কে কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, তাহা জানা একান্ত আবশ্যক। ইহার পর প্রাদেশিক গভর্মেণ্টের উচিত, কি কি চাকরি তাঁহারা দিতে পারেন অথবা দেওয়ানোর ব্যবস্থা করিতে পারেন, তাহা অনুসন্ধান করা। গুরু দায়িত্বপূর্ণ চাকরি—তাঁহাদিগকে জাতি ধর্ম ও প্রদেশ নির্বিশেষে দিতে হইবে। বাঙলাদেশে সংস্কৃত শিখাইবার জন্য প্রয়োজন হইলে মহারাষ্ট্র বা কেরল হইতে লোক আনিতে হইবে। নদীর সুব্যবস্থার জন্য উইলকক্সের মত ইঞ্জিনিয়ার পৃথিবীর যে-কোন দেশ হইতে আনিতে হইবে। কিন্তু নীচের স্তরে, যেখানে মোটামুটি কর্মকুশলতা থাকিলেই চলিয়া যায়, সেখানে কিছুদিনের জন্য সমাজের অনাদৃত বা ধনতন্ত্রের দ্বারা নিষ্পেষিত মুমূর্ষু জাতিগুলিকে সমাদরের সহিত প্রথম আসন দিতে হইবে; কারণ তাহারা ব্যক্তিগত গুণের অভাবে এ অবস্থায় পৌঁছায় নাই, সমাজ-ব্যবস্থার দোষেই অবনত হইয়াছে। উপরন্তু ইহারা যাহাতে চাকরির যোগ্যতা লাভ করিতে পারে, তজ্জন্য গভর্মেণ্টের অধীনে যত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে, সেগুলিকে উপরোক্ত জাতিবৃন্দের জন্য বিশেষভাবে ব্যবহার করিলে ভাল

হয়। এই অবস্থা আগামী বার বৎসর চলিলেই যথেষ্ট হইবে। শিক্ষা বিভাগের গণনায় এক পুরুষ বা বার বৎসর ধরিয়া অনাদৃতদের উন্নতি বিধানের একাগ্র চেষ্টা করিলে দেশের বুদ্ধিমান জনসাধারণ ন্যায়ের দৃষ্টিতে আপত্তি হয়তো করিবেন না।

কিন্তু তাই বলিয়া কি বিহারে বাঙালী বাসিন্দা অথবা বাঙলায় ব্রাহ্মণ কায়স্থদের বিরুদ্ধে অনাদর বা প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে? তাহাদিগকে অবহেলা বা অনাদরে ভাসিয়া বেড়াইতে দিলেই কি উচিত কার্য করা হইবে? আমার মনে হয়, আপিসের চাকরি, ডাক্তারি ওকালতি বা শিক্ষকতার কাজ তাহাদের পক্ষে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইলে নূতন নূতন বৃত্তির পথে তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। ধরুন, খাদির কাজ, উন্নত গ্রামাশিল্প শিক্ষা এবং তাহা প্রচারের চেষ্টা, বুনিয়াদী শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি কংগ্রেসের আঠার দফা গঠনকর্মের মধ্যে প্রাদেশিক গভর্মেণ্ট অনেকগুলি গ্রহণ করিতে পারেন। যাহাদের পক্ষে আপিসে চাকরি করিবার পথ আপাতত সঙ্কুচিত হইবে, তাহারা স্বচ্ছন্দে এই সকল পথে অগ্রসর হইয়া সরকারী চাকুরিয়া হইয়া জীবনযাপন করিতে পারে। গভর্মেণ্টের পক্ষে ইহাতে খরচও কম; উপরন্তু গ্রামদেশের উন্নতির পথও ইহার দ্বারা সহজ হইবে। আবার যদি কেহ স্বাধীনভাবে কৃষি বা ব্যবসায়ের পথ লয় তবে গভর্মেণ্ট কো-অপারেটিভ ব্যবস্থার মারফত তাহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, জমিবিলির আয়োজন এবং ঋণ দান করিয়া যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারেন। বাঙলাদেশ ম্যালেরিয়াগ্রস্ত, ওড়িশাও সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। গভর্মেণ্ট ম্যালেরিয়া দূর এবং চাষের উন্নতিবিধানের জন্য নদীর সংস্কার, নৌকা চলাচলের বৃদ্ধি, জল নিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি নানাবিধ নূতন উপায় গ্রহণ করিতে পারেন। ইহাতেও চাকরির নূতন নূতন পথ খুলিয়া যাইবে। উপরোক্ত ব্যবস্থাও যদি বার

বৎসর ধরিয়া চালানো যায় তবে ন্যায়ের দৃষ্টিতে দোষ হইবে না। উপরন্তু এরূপ ব্যবস্থার দ্বারা খরচ অত্যধিক হইবার কথা নয়।

কিন্তু ভয় হয় পাছে আগামী বার বৎসর চাকরিতে সুযোগ লাভের আশায় উচ্চবর্ণের কোন জাতি নিজেদের তপশীলভুক্ত করাইবার চেষ্টা না করে, কারণ দারিদ্র্যের চাপে অসম্ভবও সম্ভব হয়। আবার প্রাদেশিক গভর্মেণ্টগুলি প্রজার উপকার সাধন করিতে গিয়া এমন আইনের বেড়া সৃষ্টি করিতে পারেন, যাহা হয়ত স্বাধীনতাপুষ্ট ইংলণ্ড বা ফ্রান্সেও আগন্তুক ব্যক্তি অথবা তাহাদের সন্তানদের বিরুদ্ধে লওয়া হয় না। যাহাতে ভেদবুদ্ধি পাকা না হয়, বর্তমান অধম চিকিৎসার ফলে যাহাতে বাঙালী-অবাঙালী হিন্দু-মুসলমান, উচ্চবর্ণ ও তপশীলভুক্ত জাতিবৃন্দের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব স্থায়িত্ব লাভ না করে, সমাজদেহ আরও দুর্বল হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য গভর্মেণ্টকে দৃঢ়ভাবে একটি নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। তাঁহারা বলিবেন, আমরা আগামী বার বৎসর মাত্র বর্তমান বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিব। এই সুযোগে যে যেমন ভাবে পার শিক্ষা এবং চাকরির সুব্যবস্থা করিয়া লও। যে বৈষম্যের কাঁটা সমাজের দেহে ফুটিয়াছিল, তাহাকে এতদিন দুর্বল ও পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছিল, আমরা তাহার বিপরীত নীতির কাঁটার দ্বারা সেই কাঁটাকে তুলিতেছি। বার বৎসর পরে দুই কাঁটাই ফেলিয়া দিবার সময় আসিবে। তখন হইতে আমরা সকল প্রজাকে জাতিধর্মনির্বিশেষে সমান ভাবে আমাদের সাধ্যমত উৎসাহ দিব।

এরূপ ব্যবস্থার ফলে মনে হয় পুরাতন ক্ষতও সারিবে, অথচ চিকিৎসার ফলে সমাজদেহে নূতন উপদ্রবেরও সৃষ্টি হইবে না। যদিও বা সাময়িক ভাবে কোন উপসর্গ দেখা দেয়, তাহাও স্থায়ী হইতে পারিবে না। গভর্মেণ্টের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সকলে সাবধান হইবে, জাতের

দোহাই দিয়া সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধানের চেয়ে স্বীয় গুণের জোরেই তাহা অধিকার করিবার জন্ম সচেষ্ট হইবে।

পাঠক এই ব্যবস্থার দোষগুণ সহানুভূতির সহিত ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিবেন, আশা করি। *

পরিশিষ্ট

Bengali-Bihari Question, issued by the All-India Congress Committee, being report of Babu Rajendra Prasad together with the Resolution of the Working Committee (Jan. 11-14, 1939).

"It is not as if the Congress Ministry in Bihar has introduced certain new rules from past practice. The question (of giving provincials "a fair share of the new posts") has been examined time after time and the Government has tried to achieve the object of remedying the deficiency in numbers of the people of the province in the services by devising and enforcing rules of domicile. The present Government it is said has done nothing more than enforcing the rules which have long been in existence." (p. 6-7).

"It is not possible to ignore the fact that the demand for creation of separate provinces based largely on a desire to secure larger share in public services and other facilities offered by a popular national

*প্রবন্ধটি দমদম বন্দীশালায় থাকার সময়ে পরিশিষ্টে উল্লিখিত পুস্তিকাখানি পড়ার পর লিখিয়াছিলাম।

administration is becoming more insistent, and hitherto backward communities and groups are coming up in education and demanding their fair share in them. It is neither possible nor wise to ignore these demands and it must be recognised that in regard to services and like matters the people of a province have a certain claim which cannot be overlooked" (p. 21).

——

সংস্কৃতি

রবীন্দ্রনাথের সাধনা

রবীন্দ্রনাথকে আমরা কবি বলিয়াই দেখিয়া থাকি, সাধক হিসাবে সচরাচর দেখি না, সাধক হিসাবে তিনি যে কত বড়, তাহা আমরা সচরাচর ভুলিয়া যাই। হয়তো আমাদের দেশে সাধকগণের সংখ্যা বেশি বলিয়া আমরা তাঁহার কথা শুনিতে পাই না, অথবা অন্যের সহিত তুলনায় তাঁহার কথা আমাদের মনঃপূত হয় না বলিয়া আমরা তাঁহার একটি দিক একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকি। কিন্তু তাহাতে একদিকে যেমন কবির প্রতি অবিচার করা হয়, অপর দিকে আমাদের লোকসান হয় তাহার চেয়ে বেশি। কারণ, সাধনার পথে যে কেহ একনিষ্ঠ ভাবে চলিয়া থাকেন, তিনি আমাদের ভক্তির পাত্র, তাঁহার কথা আমাদের শোনা উচিত; রবীন্দ্রনাথের মত যাঁহারা ঐ পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা তো স্বতন্ত্র। ইউরোপ রবীন্দ্রনাথকে কবিরূপে যেমন ভাবে লইয়াছে, তাহার চেয়ে অনেক বেশি আদর করিয়াছে এই জন্য যে তিনি ইউরোপের যুদ্ধক্লান্ত জর্জরিত চিত্তকে পুনরায় মানুষের প্রতি প্রেম ও বিশ্বচরাচরের সহিত মানুষের নিবিড় যোগের কথা শুনাইয়াছেন বলিয়া। এমন সাধকের ঐশ্বর্যকে যদি শুধু মতের অনৈক্যের জন্য আমরা অবহেলা করি, শুনিতে পর্যন্ত না চাই, তাহা হইলে আমাদের চেয়ে হতভাগ্য আর কে হইতে পারে? ভিন্ন মত শুনিতে আমরা যদি এত ভয় পাই, তবে আমাদের অপেক্ষা ভীরু অথবা দীন আর কে থাকিতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ ভগবানকে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার কবিতায়

মধ্যে অনেক জায়গায় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ভগবান যেন তাঁহাকে জগতের রঙ্গমঞ্চে রূপের পর রূপের মধ্য দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। রসে, বর্ণে, গন্ধে, রূপে সমস্ত বিশ্ব যেন পরিপ্লাবিত হইয়া গিয়াছে, কবি প্রিয়ের আঁচল ধরিয়া এই সকলের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন। কবি এক এক রূপকে উপভোগ করিতে গিয়া অবশেষে তাঁহার প্রিয়কেই সকলের তলে নূতন করিয়া খুঁজিয়া পাইয়াছেন। এত বিভিন্ন রূপের মধ্যে তিনি বারংবার তাঁহার প্রিয়কে দেখিয়াছেন যে, এখন কবির ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে সবই তাঁহার প্রিয়ের রূপ, সব মিলিয়াই যেন তাঁহার প্রিয়। প্রিয়কে খোঁজার বিরাম নাই, কোথাও তাহার আর শেষ নাই। সকল ক্ষেত্রেই তিনি জানেন, আড়ালটি খুলিলে আবার তাঁহাকেই পাওয়া যাইবে—অনেক বার দেখিয়া দেখিয়া এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। প্রিয়কে সকল সময়ে, সকল রূপের আড়ালে খুঁজিয়া বাহির করা, ও সকল মানুষের কাছে তাঁহার পরিচয় দেওয়া কবির কাছে জীবনের একমাত্র ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যে সকল রূপের ভিতর দিয়া নিবিড় রসের আস্বাদন লাভ করিয়াছেন, সে সবগুলি কিন্তু সুন্দর; ভীষণ অথবা রুদ্র সেগুলির মধ্যে স্থান পায় নাই। আর বস্তুত, তিনি রুদ্রের ভিতর দিয়া যাইতেও চান না। তাহাতে তাঁহার কোমল কবিপ্রকৃতি আহত হয়। কিন্তু মৃত্যু ও দুঃখের মধ্য দিয়া, জাতির অপমানের ভিতর দিয়াও ভগবান তাঁহার কাছে আসিয়াছেন. কবি সে রূপের মধ্যে নিজের প্রিয়কে দেখিতে পাইয়াছেন সত্য, কিন্তু প্রিয়কে তিনি এমনভাবে দেখিতে চান না। প্রিয় রুদ্র হইতে পারেন, ভীষণ হইতে পারেন, কিন্তু তাহা অন্যত্র। কবির অন্তরের অন্তঃপুরে সে পোষাকে আসা চলিবে না। সেখানে তিনি শুধু প্রিয়তমের রূপেই আসিবেন।

রবীন্দ্রনাথের এই ভগবৎকল্পনার মধ্যে আমরা একটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই। তিনি যেন কিছুতেই নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্বটুকু ছাড়িয়া দিতে রাজি নহেন। ভগবানের সকল রূপকে সমান আদরে লওয়ার জন্য নিজের মনকে বার বার ভাঙিয়া গড়িতে তিনি প্রস্তুত নহেন, তাহার মধ্যে বাছিয়া লইবার অধিকারটুকু তিনি একান্ত নিজের সম্পত্তির মত বাঁচাইয়া রাখিতে চান। তান্ত্রিক সাধকদের মধ্যে যে প্রেম এমন ভাবে আসিত যে তাহাতে ভক্তের স্বতন্ত্র সত্তা নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, ঠিক তেমন প্রেম আমরা যেন রবীন্দ্রনাথের লেখায় পাই না। পরমহংসদেব কালী ও কৃষ্ণ উভয়কেই যেমন নিঃশেষে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, কালীর করাল নৃত্যের নিষ্পেষণে যখন তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়া যাইতেছে, ব্যথার তাড়নায় অন্তর হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিতেছে, তখনও যেমন পরমহংসদেব সেই আঘাতের মধ্যেই প্রিয়তমের পদধ্বনি শুনিতেন, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে তেমন ভাবটি আমরা কোথাও পাই না। সকল রূপের মধ্যে একান্তভাবে খোঁজার জন্য যে বীরভাবের প্রয়োজন হয়, সেইটুকু রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আমরা যেন পাই না। তাঁহার ভয় হয়, পাছে নিঃশেষের দাবির প্লাবনে তাঁহার সত্তার বিভিন্নতাটুকু হারাইয়া যায়। তিনি সাধনপথের এই শেষ দাবিটুকু মানিয়া লইতে রাজি নহেন।

এইরূপে নিঃশেষভাবের অভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় রুদ্রের কবিতা মধুররসের কবিতার মত জমে নাই। মাধুর্যরসের মধ্যে সত্যই কবি আত্মহারা হইয়া যান, অনুভবসিদ্ধ ভাবের দ্বারা তাঁহার কাব্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠে; কিন্তু রুদ্রের কবিতার মধ্যে অনুভূতির সেই স্পর্শটুকু আমরা কিছুতেই পাই না। শব্দের অপূর্ব ইন্দ্রজালের বেড়ায়

যেন বার বার আমাদের ধাঁধা লাগিয়া যায় ;-পিছনে কতখানি অনুভূতি আছে, তাহা কিছুতেই আর বিচার করিতে পারি না।

কেন যে রবীন্দ্রনাথ একান্তভাবে নিজেকে বিসর্জন দেন নাই তাঁহার লেখার মধ্যে আমরা তাহার কারণের নির্দেশ পাই। রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে একবার লিখিয়াছিলেন যে, একান্তভাবে নিজের সত্তার গূঢ়তম লোকে প্রবেশ করা তাঁহার হইল না। বৈচিত্র্যময় বিশ্বের বিভিন্ন রূপের মধ্যে বিচরণ করাকেই তিনি সমধিক প্রীতিপ্রদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন। *

তিনি আরও বলিয়াছেন যে, শুধু নিজেকে উপলব্ধি-করাতেই তিনি তৃপ্ত নহেন, পথে লব্ধ সকল ঐশ্বর্যটুকু সকলকে বিলাইয়া দিতে না পারিলে সাধনা তাঁহার কাছে নিরর্থক হইয়া যায়। সাধনার পথে যখন তিনি দেখিলেন যে এক অবস্থায় মানুষের সঙ্গকে ত্যাগ করিতে হইবে, এমন কি পূর্বে তিনি যে গাছপালা, পৃথিবী ও আকাশের সঙ্গলাভ করিয়া নিজের অন্তরকে পূর্ণ রাখিতেন, তাহাদের সঙ্গ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া একান্ত নিঃসঙ্গ, নির্জন পথে চলিতে হইবে, তখন তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাই সকলকে বিলাইয়া দেওয়া তাঁহার কাজ, সত্তাকে উপলব্ধি করার চেষ্টায় যদি সকলের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হয় তবে বরং ও পথে না যাওয়াই ভাল। মানুষের সঙ্গ ও বিশ্বচরাচরের সঙ্গ তাঁহার কাছে সকলের চেয়ে প্রিয়, সে সুখ কিছুর জন্যও ছাড়া যাইতে পারে না।

মানুষের প্রতি মমতা ও রূপরসে পূর্ণ বিশ্বের প্রতি অনুরাগ, রবীন্দ্রনাথকে আমাদের অন্যান্য সাধকগণ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে।

---

* "সাধনার রূপ", প্রবাসী, ভাদ্র ১৩৩৮

মানবজাতির প্রতি প্রেম আমাদের দেশের সকল বড় সাধকগণের মধ্যে বর্তমান। হয়তো অনেক ক্ষেত্রে তাহা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের চেয়ে বেশি গভীর। কিন্তু রূপরসের প্রতি এমন মমতা আর কাহারও মধ্যে দেখা যায় না। ইহাতে একদিকে যেমন তাঁহাকে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে, অপরদিকে তেমনি তাঁহার সাধনার পথে বিঘ্ন উপস্থিত করিয়াছে। যদি রবীন্দ্রনাথ বীরভাবের বশবর্তী হইয়া সত্তার নিগূঢ় লোকে ডুবিয়া যাইতেন, অন্তরের নিঃসঙ্গলোকের বৈতরণী অতিক্রম করিতে পারিতেন, তবে হয়তো তাঁহার মানুষের প্রতি প্রেম আরও নিগূঢ় হইত সত্য, হয়তো মানুষকে সেবা করিবার অধিকার তিনি লাভ করিতেন সত্য; কিন্তু রূপপথে প্রিয়তমের অনুকম্পায় ও তাঁহার অনুমতি লইয়া অপরাধীর মত দাঁড়াইয়া তিনি আজ যে কাব্যের অপূর্ব ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছেন তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইয়া যাইতাম, এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রূপকথায় আছে, রাক্ষস যখন চলিয়া যাইত, তখন পাতালে রাজকন্যার মস্তক ছিন্ন করিয়া যাইত এবং তাহা হইতে অবিরাম যে রক্তের বিন্দু ঝরিত তাহাই সমুদ্রের উপরে রক্তবর্ণ মণির আকারে ভাসিয়া যাইত। রবীন্দ্রনাথের জীবনেও আমরা দেখিতে পাই রক্তমাংসের লুব্ধ রাক্ষসের শাসনে তাঁহার প্রাণ হইতে যে অমৃতবিন্দু নিঃসৃত হইতেছে, তাহাই কাব্যের বিচিত্র কমলের আকার ধারণ করিয়া তাঁহার মানসসরোবরে প্রস্ফুটিত হইতেছে।

শিল্পীর দাবিকে বলি দিয়া যদি রবীন্দ্রনাথ সাধনপথে আরও অগ্রসর হইতেন তবে মানুষ হিসাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে হয়তো আরও বড় করিয়া পাইতাম সত্য, কিন্তু কবি হিসাবে তিনি আর আমাদের কাছে থাকিতেন না। হয়তো তাহাতে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতি হইত

বোধ। তিনি যে অন্তরের মধ্যে কাব্যসৃষ্টির দাবিকে আরও বড় স্থান দিয়া নিজের সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার অধিকারকে বলি দিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহার কবিতা নূতন মহিমায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে; আমাদের কাছে তাঁহাকে আরও প্রিয় করিয়া দিয়াছে। সাধকরূপে না হয় নাই হইলেন তিনি আর সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু কবি হিসাবে তাঁহার সমকক্ষ তো এখন আর কাহাকেও দেখা যায় না।

তৃষ্ণা

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন সুন্দরের উপাসনা করিয়াছেন। সকল বস্তুর মধ্যে তিনি সুন্দরকে অনুসন্ধান করিয়াছেন, সর্বত্র তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার যত্ন করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে যে এরূপ চেষ্টা সফল হইবে, তাহার স্থিরতা কোথায়? রবীন্দ্রনাথের সুন্দরের সাধনাও যে রুদ্রের নিকট, আলস্য অবসাদের নিকট, পরাজিত হইয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সমস্ত স্থৈর্য হারাইয়া শিশুর মত ব্যবহার করিয়াছেন। শিশু যেমন যাহা চায় না, তাহাকে ভুলিতে চায়, নিজেকে দূরে সরাইয়া লইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাহাও সম্ভব হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের আলস্য, ভীরুতা সবই বারংবার রবীন্দ্রনাথের মনকে আঘাত করিয়াছে এবং যখন তিনি সেগুলিকে শান্ত করিতে পারেন নাই, ভুলিতেও পারেন নাই, তখন উপহাসের দ্বারা, তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের দ্বারা তাহাদিগকে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তিনি চিত্তের স্থৈর্য হারাইয়াছেন। স্বীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকিয়া গিয়াছেন।

নিজের জীবনে তিনি যে তামসিক বৃত্তিকেই যথাযথভাবে লইতে পারেন নাই তাহা নহে। রুদ্রকেও তিনি রুদ্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই। বজ্র তাঁহার কাছে বজ্র নয়, প্রিয়তমের বংশীধ্বনির আকার ধারণ করিয়া তবে গ্রহণযোগ্য হইয়াছে। সেই জন্য বৈশাখের গান কখনও তাঁহার কাছে বর্ষার গানের মত জমে নাই। বর্ষার কবিতায়, প্রতি অনাড়ম্বর শব্দের অন্তরালে যে গভীর অনুভূতি ও প্রেমের

সম্ভার বর্তমান, রুদ্রের, ভৈরবের অথবা বৈশাখের কল্পনায় তাহার আস্বাদ আমরা পাইনা। সেখানে ধ্বনির ছটা বিস্তার করিয়া তিনি যেন অনুভূতির দৈন্য এবং বস্তুর সহিত বিষয়ীর ঐক্যের অভাবকে ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এরূপ বিচিত্র আচরণের কারণ কি? বুদ্ধির দিক হইতে যিনি এত প্রখর, কাব্যের জগতে যাঁহার যোড়া কদাচিৎ পাওয়া যায়, তিনি কেন বিশ্বের সর্ববিধ প্রকাশকে সমানভাবে লইতে পারিলেন না? ইহার জন্য দায়ী মনে হয় তাঁহার "সুন্দর."—যে দেবতাকে তিনি এতদিন নানা উপচারে, নানা অনুষ্ঠানের দ্বারা অবিরাম পূজা করিয়া আসিতেছেন। যে সুন্দরের দেবতাকে আশ্রয় করিয়া তিনি কাব্যের সম্ভার রচনা করিয়াছিলেন, নিজের চারিদিকে বহুবিধ উপচারের জাল রচনা করিয়াছিলেন, সেই দেবতাই আজ তাঁহাকে আরও অগ্রসর হইতে না দিয়া বরং পিছনে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ একবার বলিয়াছিলেন যে রূপে, রসে, গন্ধে ভরা পৃথিবীর প্রতি মমতা ছাড়িয়া তিনি অনির্দেশের পথ গ্রহণ করিতে চান নাই। তাহার কারণ হয়তো ইহাই যে আধ্যাত্মিকতার দাবি অপেক্ষা তিনি আর্টের দাবিকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন; মানুষ তাঁহার কাছে অতি প্রিয়, প্রকৃতি আরও প্রিয়, আর্ট ততোধিক। ইহাদের ছাড়িয়া তিনি নিরালা পথে শুধু চরম অনুভূতির লোভে অগ্রসর হইতে চান নাই।

কিন্তু তিনি চান অথবা না চান, বিশ্ব তাহার সুন্দর এবং অসুন্দরের সম্ভার লইয়া বহুবার রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে আঘাত করিয়াছে। মৃত্যু, যাহা হয়তো সুন্দর এবং অসুন্দরের পারে, তাহা ধীর পদক্ষেপে দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করিয়া ক্রমে তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিতেছে। যে সুন্দরের সাধনা কবি চিরদিন করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশ্বসংসারের বহু সম্পদ তাঁহার

ভোগের জন্য দান করিয়াছে। কিন্তু বিশ্বের আরও একটি বৃহৎ অংশ, যাহাকে সুন্দর বা অসুন্দরের কোঠায় ফেলা যায় না, তাহাই ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুভূতিকে অধিকার করিতেছে। কবির মনের গভীর নিরালায় কখনও কখনও হয়তো এ সন্দেহ হয় যে সব বোঝা হয় নাই, সব জানা হয় নাই, পরিচয়ের গণ্ডীর বাহিরে অনেক থাকিয়া গিয়াছে এবং হয়তো যাহাকে আধ্যাত্মিকতার আরও চরম সাধনার দ্বারা তিনি জয় করিতে পারিতেন, কেবল আর্টের প্রতি মমতার বশে তাহা তিনি পারেন নাই। এই বোধ যতই তাঁহার নিকটে আসিতেছে, ততই তিনি তাহাকে বিস্মৃত হইবার জন্য নব নব কৌশল খুঁজিতেছেন।

এমনই একটি ইচ্ছার বশবর্তী হইয়া রবীন্দ্রনাথ লোকের প্রশংসার এত সন্ধান করিতেছেন। তাহার দ্বারাই তিনি জীবনের শেষ দৈন্যটুকু ঢাকিতে চান, নিজেকে ভুলাতেই চান যে তাঁহার আর্ট তাঁহাকে যথেষ্ট সম্পদ দান করে নাই। প্রশংসার পিপাসা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সম্ভবত কোনও ক্ষুদ্র সংস্কার হইতে আসে নাই। ইহা সাধনার শেষ অবস্থায় পূর্বমুহূর্তে আরও অগ্রসর হইবার ভয় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির জন্য এই ব্যাকুলতাকে লঘু বস্তু মনে না করিয়া বরং ইহা ট্র্যাজেডির সমকক্ষ বলিয়া বিবেচনা করা উচিত।

অথচ সকলের বড় ট্র্যাজেডি হইল এই যে, মানুষের প্রশংসার কোলাহল, যতই বহুল, যতই অবিচ্ছিন্ন হউক না কেন, তাহা কখনও রবীন্দ্রনাথের জীবনের অন্তরতম প্রদেশে পৌঁছাইতে পারে না, তাঁহাকে কোন সান্ত্বনাও দিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের ছবি

চিত্রশিল্পের জগতে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় একটি আকস্মিক ব্যাপারের মত সকলকে আঘাত করিয়াছিল। তাঁহার লেখার মধ্যে আমরা যে শিল্পদক্ষতা এবং সৌষ্ঠবের পরিচয় পাইতে অভ্যস্ত, যে বিরাট মনের ছাপ কাব্যের সমস্ত কলাকৌশলকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অভিভূত করে, ছবির মধ্যে সে সকলের কিছু না পাইয়া স্বভাবতই আমাদের মন বিস্ময়াবিষ্ট হয়। ছবিতে কবি যেন সচেতন মনের সকল সংযমকে শিথিল করিয়া দেন, তাঁহার ধীশক্তি তখন ছুটি লয়। শিশু যেমন আপন খেলায় মগ্ন হইয়া থাকে, রবীন্দ্রনাথও ছবি আঁকিবার কালে তেমনই রঙ এবং রূপকে আপন প্রয়োজনে চলিতে দেন। ফলে, যাহা গড়িবার তাহা প্রকৃতির খেয়ালের মত যথেচ্ছ রূপ লইয়া গড়িয়া উঠে। নদী যখন পাহাড় হইতে নামিয়া আসে, তখন সেই নামিয়া আসাই তাহার কাছে একমাত্র সত্য। গতির বেগে তাহার বহিরাকৃতি কেমন হইবে, ইহা যেন ভাবিবার বিষয় নয়, ছবির রূপ শেষ পর্যন্ত কেমন দাঁড়াইবে, তাহাও তেমনই রবীন্দ্রনাথের বিবেচনার বহির্ভূত হইয়া থাকে। এমন অবস্থায় যাহা রূপ পায়, তাহাকে ছবি বলা চলে কি না, এ প্রশ্ন অনেকের মনে জাগা স্বাভাবিক। সে প্রশ্নের বিচার না করিলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের ছবিকে ঠিকমত বুঝিবার বা উপভোগ করিবার বাধা জন্মিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে আমরা একটি শিল্পশাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি। সে শাসন তিনি সর্বদাই স্বেচ্ছায় মানিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার জীবনের ক্ষেত্রেও শাসন এবং সংযম সুপরিস্ফুট। এবং সেইজন্যই

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও লেখায় কোনও কোনও ভাব অবলীলাক্রমে বিকশিত হইতে পারে নাই।

যখন তাঁহার ছবি প্রথম প্রকাশিত হইতে লাগিল, তখন নূতন একটি সুরের ইঙ্গিত পাইয়া আমরা আনন্দিত হইয়া উঠিয়াছিলাম। বাঙলা দেশের প্রচলিত ছবির মধ্যে গতানুগতিকতার যে বন্ধন গুরুভারের মত চাপিয়া বসিয়াছিল রবীন্দ্রনাথ তাহাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিলেন এবং পরোক্ষভাবে রূঢ়তম আঘাত করিলেন। তখন ইহাই মনে হইয়াছিল যে কবির লেখার মধ্যে কবিচিত্তের সমগ্র পরিচয় পাওয়া যায় নাই, যতটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা ছবির মধ্যে যেন আত্মপ্রকাশ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি তাঁহার কাব্যের পরিপূরকের স্থান লাভ করিয়াছে।

কেহ যেন মনে না করেন যে, রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যে ভাঙনের সুরই বেশি ফুটিয়াছে। ভাঙন তাঁহার নিকট অপ্রধান, রঙ এবং রূপই প্রধান। শুধু অন্তরের প্রেরণায়, তিনি গভীর অবহেলাভরে প্রচলিত শিল্পরীতিকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কোনও একজন-মহাপুরুষের চারিপাশে যেমন নানাবিধ লোক আকৃষ্ট হইয়া দল রচনা করে, কেহ তাঁহার সহিত সম্পূর্ণ খাপ খায়, কেহ বা খাপ খায় না, রবীন্দ্রনাথের ছবির মধ্যেও তেমনই একটি মূল রূপ, একটি রঙ অথবা একটি রেখা প্রধান স্থান লয় এবং ধীরে ধীরে তাহার চারিদিকে নানা রেখা, নানা আকৃতি, নানা রঙ ভিড় করিয়া জমা হয়। মূলের সহিত সকলের কিছু কিছু যোগ থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে স্বাতন্ত্র্য ধর্মের আতিশয্যে দুএকটি কেন্দ্রের সহিত সম্পূর্ণ একীভূত হইতে পারে না, যোগযুক্ত হইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিল্পের ব্যবসায়ী নহেন। তাঁহার চিত্রে উল্লিখিত অসঙ্গতিদোষ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার হাতে ব্যবসায়ী শিল্পীর মত দক্ষতা জন্মে নাই, কিন্তু মন বিশ্বকর্মার মত,

এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। বিশ্বকর্মা কাহারও মুখ চাহিয়া সৃজন করেন নাই। যে রঙ, যে রূপ তাঁহার ভাল লাগে তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া, তাহার ধর্মে ধর্মী হইয়া, তিনি সেই পথের সাথী খোঁজেন। ফলে আদিম যুগের সৃষ্ট জীবের মত এক বিরাট রূপ গড়িয়া উঠে। সেখানে বলিষ্ঠতার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের ছায়াপাত হয় না। অন্ধকার—নিরন্ধ্র অন্ধকারের মত আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে। রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যে আমরা আদিম সৃজনক্রিয়ার সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। ভাষাশিল্পের ব্যাপারে কবির মন যে-সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে ছবি তাঁহাকে সেই সতর্কতা হইতে মুক্তি দিয়া রঙ এবং রূপের পরিপূর্ণ সম্ভোগের সুযোগ দান করিয়াছে। এগুলি যে ছবি তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, প্রত্যেকটির মধ্যে কোনও বিশেষ রূপ অথবা রেখা অথবা রঙ কার্পণ্যহীন সৌন্দর্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের কোন কোন ছবির মধ্যে আমরা অসঙ্গতি দোষের উল্লেখ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছা করিয়াই তাহার পরিবর্তন সাধন করেন নাই। যাহা যেমন ভাবে ঘটিয়াছে, তাহা সেইভাবেই রাখিয়া দিয়াছেন, লজ্জিত হইবার কোন কারণই তিনি খুঁজিয়া পান নাই। বাঙলাদেশের শিল্পজগতে রোম্যান্টিক বিষয়বস্তু এবং প্রতীকতার (Symbolism) মোহে যে দুর্বলতা সঞ্জাত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ পরোক্ষভাবে শিল্পীগণকে তাহা হইতে মুক্তি দিবার আয়োজন করিতেছেন। চিত্রের চিত্রধর্মকেই তিনি তাহার একান্ত পরিচয় বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। ইহাই শিল্পীগণের নিকট কবিগুরুর শ্রেষ্ঠতম বাণী।

কিন্তু কেহ যেন মনে না করেন, অবনীন্দ্রনাথের মত তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বাঙলাদেশে শিল্পের নূতন কোনও শৈলী গড়িয়া উঠিবে। বস্তুত তাঁহার ছবির মধ্যে বিশেষ কোনও শৈলী দানা বাঁধিয়া

উঠে নাই, ওঠা বোধ হয় সম্ভবও নয়। আকাশে নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে সৃষ্টির যে সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের চিত্রের মধ্যেও তাহার আভাষ পাওয়া যায়। তিনি মূলবস্তুর কথা বলিয়াছেন, শিল্পীকে মনের সকল সংস্কার, সমস্ত ধর্ম বিসর্জন দিয়া রঙ এবং রূপের শাসনকেই একান্তভাবে শরণ লইতে বলিয়াছেন। তাই তিনি বাঙলার অনাগত শিল্পের পথপ্রদর্শকের আসন লাভ করিয়াছেন। পথের প্রতিপদক্ষেপের ঠিকানা তাঁহার জানা নাই, তাঁহার নিকট কেবল সম্ভাবনার সংবাদ রহিয়াছে।

আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘ জীবনের প্রান্তদেশে আসিয়াও শক্তির এইরূপ প্রাচুর্যের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কাল তাঁহার রসগ্রাহী এবং সৃজনপ্রয়াসী মনকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে নাই। বস্তুত তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

শিল্পী যামিনী রায়ের মতবাদ

গত বৎসর শ্রীযুক্ত যামিনী রায় রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে চারুকলা বিভাগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। শিল্পজগতে তাঁহার মতামত সকলের অনুরূপ নহে। রাঁচিতে অন্যান্য সভাপতিগণ সকলেই বক্তৃতা দিয়াছিলেন, কিন্তু যামিনী বাবু বক্তৃতার পরিবর্তে শুধু সামান্য দুচারিটী কথা নিবেদন করিয়া অভিভাষণ শেষ করেন এবং সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে আর্ট সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে আহ্বান করেন। সেই প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাঁহার স্বীয় মতামত বক্তৃতা অপেক্ষা বোধ হয় আরও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল। যামিনী বাবুর কথোপকথনের সারমর্ম প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত করা হইল। সম্প্রতি সমবায় ম্যানসান ইণ্ডিয়ান সোসাইটী অফ ওরিয়েণ্টাল আর্টের ভবনে তাঁহার চিত্রের প্রদর্শনী খোলা হইয়াছে। সেই প্রদর্শনীতে যাঁহারা যাইবেন তাঁহারা হয়তো বর্তমান প্রবন্ধ পাঠ করিয়া যামিনী বাবুর চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও উত্তমরূপে রস গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। যামিনী বাবু বলেন :

আমার নিজের ধারণা যে শিল্পীর কাজ বক্তৃতা করা নয়। শিল্পীর যাহা বক্তব্য তিনি তাহা ছবির সাহায্যে বলিয়া থাকেন। যদি দর্শক ছবি দেখিয়া শিল্পীর বক্তব্য যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তবে শিল্পী বক্তৃতা দিয়া কখনও সে অভাব পূরণ করিতে পারিবেন না। আমি গত কয়েক বৎসর শিল্পসাধনা দ্বারা যে সত্য লাভ করিয়াছি ছবির সাহায্যে বারংবার তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছি। বক্তৃতা করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়, একমাত্র ছবি আঁকাই আমার কাজ। সেই জন্য যখন আপনাদের সাদর আহ্বান আমার নিকট পৌঁছাইল

তখন আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে বিশেষ ইতস্তত করিয়াছিলাম। কিন্তু অবশেষে মনে হইল যে, ছবির মর্মকথা হয়তো আপনাদের নিকট সম্পূর্ণভাবে পৌছায় নাই, সেই জন্য ছবিগুলির টিপ্পনীস্বরূপ কয়েকটী কথা নিবেদন করিব বলিয়া আজ আমি এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

আমি পূর্বে ইউরোপীয় টেকনীক অনুসারে ছবি আঁকিতাম। তখন আর্ট স্কুল হইতে সবেমাত্র পাশ করিয়া বাহির হইয়াছি এবং অন্তরে যৌবনের আকাঙ্ক্ষা ও শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার ইচ্ছা হইল, খাঁটি বিলাতি ছবি আঁকিয়া বিলাতি শিল্পজ্ঞগণের নিকট সমাদর লাভ করিব। সেজন্য বহু সাধনা করিলাম, বিখ্যাত শিল্পাচার্যগণের চিত্র অনুকরণ করিলাম, নূতন ছবিও আঁকিতে লাগিলাম। খ্যাতি যে কিছুই অর্জন করিতে পারি নাই তাহা নহে। তবে সর্বদাই আমার মনে, হইত, কোথায় যেন একটু গলদ রহিয়া যাইতেছে, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও যেন পরিপূর্ণ বিলাতি ছবি আঁকিতে পারিতেছি না।

প্রথমে ইহার জন্য নিজেকে দায়ী মনে হইত। ভাবিতাম, হয়তো আমার সাধনা যথেষ্ট হয় নাই, সেইজন্য শিক্ষা পূরণ করিবার ব্রত গ্রহণ করিলাম। চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, তথাপি মন কিছুতেই তৃপ্তি লাভ করিত না। অবশেষে একদিন হঠাৎ একটি সত্য হৃদয়ের মধ্যে উপলব্ধি করিলাম। আমার মনে হইল যে, আমি ভুল পথে চলিয়াছি। বাঙলাদেশের আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া শুধু যে আমার দ্বারাই সর্বাঙ্গসুন্দর বিলাতি ছবি আঁকা সম্ভব নহে তাহা নয়, বস্তুত কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে না। কথাটি আরও বিস্তারিতভাবে আপনাদিগকে বলি।

আপনারা সকলে জানেন, সানাই বাজাইবার সময়ে একজন বাজনাদারকে একটি মূল স্বর ধরিয়া রাখিতে হয়। অপর যন্ত্রে নানাবিধ

সুর খেলিয়া যায়, কিন্তু তাহাকেও ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার মূল সুরে ফিরিয়া আসিতে হয়। আমার ধারণা, জগতের সকল মৌলিক ও পরিপুষ্ট সভ্যতার বাহিরে যতই বৈচিত্র্য থাকুক না কেন, তাহার মূলে সানাইএর সুরের মত একটি সুরই নিয়ত বাজিতে থাকে। বার বার সেই সভ্যতার বাহিরের সকল প্রকাশকে মূল সুরটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে হয়। মূল সুরটি কালধর্মে পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালের জন্য বাহিরের বৈচিত্র্যকে ছাপাইয়া তাহার ঐক্যের তান ভিতরে ভিতরে বাজিতে থাকে।

ধরুন, বিলাতি সভ্যতা। আজ ইউরোপ শক্তিতে, ভোগে, সামর্থ্যে, জ্ঞানে, জগতের মধ্যে উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মূলে, ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ববিধ প্রকাশের পশ্চাতে, একটি বাণী বারংবার প্রকাশিত হইয়া পড়ে। তাহা এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে, জগতের আকাশ বাতাস, অগ্নি বিদ্যুৎ সকল শক্তিকে স্বীয় রথচক্রে যুতিয়া ভোগের রথ পরিচালিত করিতে পারে; সমগ্র মানবের জীবনকে বস্তুর ক্ষেত্রে আরও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক উপায়ের প্রয়োগের দ্বারা নব নব সত্য আহরণ করিতে পারে। এই যে রাজসিক সুর, ইহা ইউরোপে সর্ববিষয়ে প্রকাশিত হইয়া থাকে। আজ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে কলহ-বিবাদ করিতেছে বলিয়া যে আমি এমন কথা বলিতেছি তাহা নহে। বস্তুত, ইউরোপীয়-গণের দর্শনে, বিজ্ঞানে, আচরণে, ব্যবহারে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার মধ্যে সেই একই কথা প্রতিধ্বনিত হইয়া থাকে। স্বীয় ভোগবৃদ্ধির জন্য অপর মানবসমাজকে বঞ্চিত করার মধ্যে তাহারই তমোগুণ মিশ্রিতরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু যেখানে বুদ্ধি আরও শুদ্ধ, আচরণ আরও নির্মল অর্থাৎ

ইউরোপের জ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পে, সেখানেও মূলত পূর্বোল্লিখিত রাজসিক ধর্মের প্রাধান্য স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা করিলে আমরা অপর একটি বিশিষ্ট মৌলিক সুরের সন্ধান লাভ করিয়া থাকি। এদেশে মানুষ প্রকৃতির সম্বন্ধে রাজসিক ভঙ্গি ধারণ করে নাই, তদপেক্ষা অন্য ভঙ্গিকে সমধিক আদর করিয়াছে। প্রকৃতিকে দ্বন্দ্বে পরাভূত করিয়া, তাহাকে শাসনে রাখিয়া, মানুষের ঐহিক সুখবৃদ্ধির চেষ্টার মধ্যে যতই বীর্য নিহিত থাক না কেন, ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ ঠিক সে পথ গ্রহণ করে নাই। তাহারা ঐহিক ব্যাপারে যে সুখবিজয়ের অভিযান করে নাই, তাহা নহে। তাহারা কেবল স্বীকার করিয়া লইয়াছিল যে, এই চেষ্টার একটি নিদারুণ সীমা আছে: মানুষকে অমর করা যায় না, মৃত্যুর গতিকে প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা নিবদ্ধ করা যায় না। এই সত্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাহারা জ্ঞানের রাজ্যে, মনের ক্ষেত্রে, দুঃখকে, প্রকৃতির প্রতিষ্ঠিত সীমারেখাগুলিকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা বীর্যের পথ, কিন্তু সে বীর্যের ধরন ইউরোপের রাজসিক ধরন হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষের মানুষ অপ্রাকৃতলোক সৃষ্টি করিয়া প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়াছিল। দুইটি মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বে একজনকে জয়ী অপরজনকে বিজিত না করিয়া, ভারতবর্ষের বিশিষ্ট জ্ঞানিগণ মানুষের মধ্যে দেবতাকে জাগ্রত করিয়া প্রকৃতিসিদ্ধ মানুষকে সর্ববিষয়ে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাও সংগ্রাম বটে, তবে সে সংগ্রাম রাজসিক না হইয়া সত্ত্বগুণান্বিত। ইহা রাজসিক সংগ্রামের মত যুদ্ধের অন্তে যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেদ রাখিয়া যায় না, পরন্তু বিজয়ী এবং পরাজিত উভয়েরই চিত্তকে আরও শুদ্ধ, শান্ত ও বলীয়ান করিয়া তোলে। সহজভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রকৃতিকে দানবকল্পনায় শাসনে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সোজাসুজি প্রকৃতির

বাহিরের কতকগুলি নিয়মকে নিজের সভ্যতার মূলমন্ত্র করিয়া ভারত-বাসিগণ প্রকৃতিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

শিল্পজগতে প্রকৃতিতে আমরা যে জিনিসটিকে যেমন ভাবে দেখি ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ তাহাকে তেমনভাবে অঙ্কিত করেন নাই। ধ্যানের নিগূঢ়তম মুহূর্তে প্রকৃতির যে রূপ তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন, তাহাকেই চিত্রে এরূপ টেকনীকের সহযোগে অঙ্কিত করিতেন যে তৎক্ষণাৎ বুঝা যায় যে, তাঁহারা প্রকৃত ঘটনার কথা না বলিয়া অন্তর্লোকে প্রকৃতির যে ছায়া পড়িয়াছে তাহারই কথা বলিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, সেই অন্তর্লোককে নির্দোষ করিবার জন্য, চিত্রের শ্রেষ্ঠ আধারে পরিণত করিবার জন্য, তাঁহাদের সকল সাধনা চিত্তের শুদ্ধিকার্যে অতিবাহিত হইত, যেন তাহাতে সত্য সম্যকরূপে অমলিনভাবে প্রতিভাত হয়। বিলাতের চিত্র তিন ডাইমেনশনে অঙ্কিত হইয়া থাকে; কিন্তু শুদ্ধ ভারতীয় চিত্রে তৃতীয় ডাইমেনশনের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায় না। ভারতীয় শিল্পী প্রথম হইতেই মাত্র দুইটি ডাইমেনশনকে স্বীকার করিয়া লইয়া দর্শককে জানাইয়া দেন যে, ইহা অন্তর্লোকের বস্তু, প্রকৃতির মধ্যগত কোনও রূপকে অনুকরণ করার চেষ্টা নহে। *

অন্তর্লোকচারী চিত্রে শিল্পী যে স্বাধীনতা লাভ করেন, প্রাকৃত চিত্রে তাহা কখনও সম্ভব নয়। সেখানে মানুষের গায়ের রং এখানকার মতনয়;

---

*অবশ্য ছবির মধ্যে দুইটী শ্রেণী আছে। ইউরোপীয় এবং ভারতীয় পদ্ধতি, উভয়েরই সংস্কৃত ও গ্রাম্যসংস্করণ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে খাঁটি গ্রাম্যই হউক অথবা সংস্কৃতই হউক, কোথাও তৃতীয় ডাইমেনশনের আতিশয্য নাই। যেখানে তাহা যতটুকু পরিমাণ আছে সেখানে তাহা ভারতের নিজস্ব সৃষ্ট শিল্পের আদর্শ হইতে ততখানি বিচ্যুতিলাভ করিয়াছে।

মানুষের আকারও চোখে দেখা আকারের মত নয়। শিল্পীর প্রয়োজন অনুসারে কেহ বড়, কেহ ছোট, কাহারও দশ ভুজ, কাহারও বা দুইটি। শিল্পী লজ্জা ও শঙ্কার বাধা অতিক্রম করিয়া নিঃসঙ্কিগ্ধভাবে স্বীয় প্রয়োজন অনুসারে রূপের রচনা করিয়া থাকেন।

আপনারা হয়তো বলিবেন যে, এ কথা ইউরোপের আর্ট সম্বন্ধেও বলা চলে। অর্থাৎ প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত লোকের মধ্যে আমি যে প্রভেদের বর্ণনা করিতেছি তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। তিন ডাইমেনশনের ছবি যেমন প্রকৃতির নিয়মাধীন, দুই ডাইমেনশনের ছবিও তেমনই। এই যুক্তির সত্যতা আমি আংশিকভাবে স্বীকার করিতেছি। তবে আমি ইহা স্পষ্টভাবে বলিতে চাই যে, প্রকৃতির যে দিকের উপরে, যে স্তরের উপরে ইউরোপ জোর দিয়াছে, ভারতীয় সভ্যতা তাহা হইতে বিভিন্ন এবং উচ্চতর একটি স্তরের উপরে জোর দিয়াছিল। দুইএর মধ্যে emphasisএ এতখানি প্রভেদ আছে যে, দুইটি শিল্পপদ্ধতিকে স্বতন্ত্র বলিয়া গণ্য করা যায়। এ কথাটি আপনাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে।

আপনাদের নিকট হয়তো আমার বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট লাগিবে, আমি হয়তো তাহা যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারি নাই। কিন্তু আমার মূল বক্তব্য হইল, ইউরোপের শিল্প, রাষ্ট্র, সমাজ, তাহার সমগ্র সংস্কৃতি যে রাজসিক সুরে বাঁধা, ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠিত মূল সুর তাহা হইতে বিভিন্ন। আমাদের সুর সাত্ত্বিক এবং সেই সাত্ত্বিকতা জ্ঞানচর্যায়, শিল্পবিকাশে, সমাজনীতি, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি সকল বিষয়েই পূর্বে আত্মপ্রকাশ করিত। আপনারা বলিতে পারেন, তাহা অতীতের কথা। আজ ইউরোপ জগতে বিজয়ীর স্থান অধিকার করিয়া আছে, অতএব ভারতের আদর্শবাদের পরিবর্তে ইউরোপের বাস্তবপন্থী শিল্পকেই

আমরা স্বীকার করিব। ইহা লইয়া তর্ক করিব না, কেবল আমি যে ভারতের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসী ইহাই বলিতে চাই। এবং আমি ইহাও বলিতে চাই যে, সেই শিল্পকলা মানুষকে ও শিল্পীকে যে স্বাধীনতা দেয়, যে আনন্দ দান করে, তাহার চরিত্রকে যত সুস্থ ও মহৎ করিয়া তোলে তাহার তুলনা হয় না। একথা আমি ভারতের প্রতি প্রীতিবশে, বা ভারতের আদর্শবাদের প্রতি মমত্ববোধের জন্ত বলিতেছি না। অনুভূতির তারতম্যের উপর নির্ভর করিয়াই ইহা বলিতে সাহসী হইতেছি।

এইবার আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিষয়ে আবার ফিরিয়া আসি : আমি যে সময়ে বিলাতি ছবি আঁকায় নিজের অক্ষমতার জন্ত পীড়িত হইতেছিলাম, তখন ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারিলাম যে, বিলাতি ছবি ঠিক ঠিক আঁকা আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়, যদি না আমাদের চারিদিকের আবেষ্টন, আমাদের পাশের মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, সকলে সেই পদ্ধতির অন্তর্নিহিত সুরটিকে প্রতিফলিত করে। আমাদের ভারতবর্ষের মানুষ এক বিশিষ্ট স্বভাবের হইয়া থাকে, তাহাদের খাওয়া দাওয়া, পোষাক পরিচ্ছদ কথাবার্তা যে সুরে বাঁধা তাহার সহিত ইউরোপের সকল বিষয়ের প্রভেদ আছে। অথচ যদি আমি ভারতের মধ্যে ভারতবাসীর সমাজে বাস করিয়া ইউরোপীয় সুরের ছবি আঁকিতে যাই, তবে ভারতবর্ষ নানা রূপের ভিতর দিয়া বারংবার আমাকে প্রতিহত করিবে। চতুর্দিকের আবেষ্টনী যেখানে যে-সুরে কথা বলিতেছে, সেখানে ভিন্ন সুরের ছবি আঁকিতে গেলে শিল্পীর জীবনকে চতুর্দিকের সঙ্গ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিতে হয়। তাহার জীবন-পদ্ধতিকে, ঘরের আসবাব পত্র, খাওয়া পরা, চালচলন, সকল জিনিসকে নূতন ও অভিপ্রেত সুরটির সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বাঁধিতে

হয়। অর্থাৎ মনে প্রাণে ইউরোপীয় হইতে পারিলে তবেই একজন শিল্পী ইউরোপের ছবিও আঁকিতে পারিবেন, এই সহজ সত্যটি বহু দীর্ঘদিনের দুঃখবেদনার অবসানের পর আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

আজ ভারতবর্ষের মধ্যে দুই সভ্যতায় দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে। রাজা ইউরোপীয়, সেই জন্য ইউরোপীয় সভ্যতারই আদর বেশি। কেহ যদি ইউরোপীয় চিত্র আঁকিতে চায়, আমি তাহাতে আপত্তি করিব না। আমি কেবল ইহা বলিব যে, সে ছবি আঁকিতে গেলে সব দিক হইতে আমাদিগকে ইউরোপের মূল সানাইকে অনুসরণ করিতে হইবে। আর যদি আমরা তাহা না চাই, যদি ভারতের সাত্ত্বিক শিল্পের আদর্শ আমাদের নিকট সমধিক প্রিয় হয়, যদি জীবনযাত্রায় রাজসিকতা অপেক্ষা সাত্ত্বিকতাকে আমরা অধিক আকাঙ্ক্ষা করি, তবে ইউরোপের ছবি আমাদের জন্য নহে, ভারতের অতীন্দ্রীয় মানস-লোকের চিত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। সে ছবির অন্তরে প্রবেশ করিলে আমরা যে আনন্দ লাভ করি ইউরোপের দেওয়া আনন্দ যথার্থই তাহার নিকট গোষ্পদের তুল্য। জ্ঞানবৃদ্ধ প্রৌঢ়ের দৃঢ় শক্তির নিকট যুবার আকস্মিক শক্তি যেমন ক্ষুদ্র, ভারতের অন্তর্লোক প্রবাসী শিল্পের নিকটেও ইউরোপের শিল্প তেমনই ক্ষুদ্র। ইহাই আমি আজ দৃঢ়ভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

ইউরোপ বা চীনদেশ শিল্পজগতে বাস্তবের সহিত সংগ্রামবদ্ধ হইয়া যেখানে শেষে পৌঁছিয়াছে, ভারতের শিল্পের যাত্রা সেইখান হইতে আরম্ভ হইয়া অবশেষে যে আনন্দলোকে মানুষকে লইয়া যায় সেখানে ছবির প্রয়োজন নাই, দুই ডাইমেনশনও সেখানে অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইতে আরম্ভ হয়। সেখানে অবশেষে শিল্পী বিন্দুর মধ্যে

সিন্ধু নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। সঙ্গীতজ্ঞ যেমন অবশেষে ওঁকার-ধ্বনির মধ্যে সকল সুরের সমাবেশ উপলব্ধি করিয়া সন্তোষলাভ করেন, শিল্পীর গতিও তদনুরূপ হয়। এ বিষয়ে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

আজ আমি আপনাদের নিকট ইহাই বলিয়া বিদায় লইতে চাই যে, মানুষের জীবনযাত্রা ও সভ্যতার অন্যান্য সর্ববিধ প্রকাশের সহিত তাহার শিল্পচেষ্টার যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা যেন আমরা কখনও বিস্মৃত না হই। ভারতবর্ষ যে সুরকে আশ্রয় করিয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সৌধনিকেতন গড়িয়া তুলিয়াছিল, আজ আমরা তাহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসবাস করিতেছি। আজ তাহার প্রাণ নাই, কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। যাহারা সে কঙ্কাল বহন করিতেছে, তাহাদের দৃষ্টি রহিয়াছে ইউরোপের দিকে, ইউরোপের সাফল্য তাহাদের দৈন্যজর্জরিত মনকে প্রলুব্ধ করিতেছে। ইউরোপীয় সভ্যতার সৌধচূড়ায় আমাদের আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এরূপ অবস্থায় আমাদের ইউরোপীয় ছবির দুর্বল অনুকরণ বা প্রচ্ছন্ন পূজা করিলে চলিবে না। শিল্পের জগতে যদি আমরা ইউরোপীয় হইতে চাই, তবে যেন জীবনের সকল ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণভাবে তাহাই হইতে শিখি। ইহাতে লজ্জারও কিছু নাই, এবং ইহার দ্বারা আধুনিক দুর্বল অনুকরণের বিড়ম্বনার অবসানও নিশ্চয়ই ঘটিবে।

আর যদি সে পথ অনুসরণ না করিয়া আমরা ভারতের আদর্শ-বাদকে মূল করি, তবে আমি বলিব, ইউরোপীয় পদ্ধতি লইয়া আজিকার মত খেলা করিয়া আমাদের লাভ নাই। অথবা খানিক ইউরোপীয়, খানিক দেশী, খানিক চীনা পদ্ধতির সংমিশ্রণ করিয়া আমরা যেন আত্মপ্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত না হই। সানাইএ কোন্ সুর আমরা

গ্রহণ করিব, তাহা একবারই স্থির করিয়া লইতে হইবে, মূল সুর দুটি রাখিলে চলিবে না। যদি ভারতীয় সুরটিকে লই এবং ভারতীয় শিল্পপদ্ধতিতে প্রাণসঞ্চার করিতে চাই, তবে শুধু প্রাচীনের অনুকরণ করিলে চলিবে না। আমাদের জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহার, এমন কি রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা পর্যন্ত সেই শান্ত ও সত্ত্বগুণান্বিত সুরে বাঁধিতে হইবে এবং সেই সুরে সম্যক্‌ভাবে বাঁধা হইলে তবেই আমরা অতীন্দ্রিয় শিল্পে প্রকৃত রূপযোজনা করিতে পারিব, তাহার আগে নয়। আমাদের ভারতীয় শিল্পকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে এই দারুণ সাধনা, এইরূপ সর্বাঙ্গীণ চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন আছে। তাহার কমে কিছু হইবে না।

আমি সর্বশেষে ইহাই নিবেদন করিতে চাই যে, ইন্দ্রিয়াতীত লোকের যে আনন্দ তাহার সমকক্ষ আনন্দ আর কিছুতে নাই। শুধু অনুভবের দ্বারাই তাহার পরিমাণ করা যায়, বলিয়া বুঝানো সম্ভব নয়।

শিল্পের মূল

শিল্পী যামিনী রায়ের মতবাদ

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের গত অধিবেশনে শিল্প-শাখার সভাপতি শ্রীযামিনী রায় মহাশয় কতকগুলি কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সকলের প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমত তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনের সঙ্গে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকা চাই। উহাদের উভয়ের সম্বন্ধ গাছ ও ফুলের সম্বন্ধের মত, দু-এর মধ্যে বিচ্ছেদ সম্ভব নয়; শিল্পী যদি জীবনের ক্ষেত্রে অসত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তবে তাঁহার শিল্প কখনও সত্য বা মহৎ হইতে পারে না। সেই জন্য যামিনী বাবু বলেন, আজিকার খাপছাড়া বাঙালী জীবনে কোনও ভাল আর্ট জন্মিতে পারে না। ইহাতে না আছে ইউরোপের ভোগের বীর্য, না আছে ভারতের সাত্ত্বিক ত্যাগের মহিমা। অতএব আমাদের দেশে আর্টের ফুল ফোটাইতে হইলে প্রথমে জীবনের বর্তমান দৈন্য দূর করা আবশ্যক। আমাদিগকে পুরা ইউরোপীয় হইতে হইবে, নয়তো সে পথ সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া ভারতীয় আদর্শকে অনুসরণ করিতে হইবে।

আর্টের সঙ্গে জীবনের যোগের কথা আমরা স্বীকার করি এবং যামিনী বাবু যখন ভাল আর্ট সৃজনের জন্য জীবনকে সমৃদ্ধ করার কথা বলেন তখন তাঁহাকে আমরা সমর্থনও করি।

যামিনী বাবু তাঁহার অভিভাষণে দ্বিতীয় এক প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও আমাদের প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, শিল্পে আমরা

বাস্তববাদের পথই লই অথবা আদর্শবাদ অনুসরণ করি, ইহা প্রথম স্তরের কথা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একবার যে পথ বাছিয়া লওয়া যায়, তাহা হইতে কোনও মতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। ভারতীয় আদর্শবাদের পথে অগ্রসর হইলে শিল্পী অবশেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যখন বিন্দু তাঁহাকে সিন্ধুর পরিপূর্ণ আনন্দ দান করে। বাস্তববাদের ক্ষেত্রেও তেমনই প্রকাশভঙ্গি সরল হইতে সরলতর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। আজ ইউরোপীয় শিল্প যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, শান্ত চিত্তে সেই পথে অগ্রসর হইলে অবশেষে চীন দেশের আর্টে পৌঁছাইতে হয়। চীনদেশের শিল্প বাস্তবতার সূক্ষ্মতম ও গভীরতম প্রকাশ।

যামিনী বাবুর বক্তব্য হইতে মনে হয়, শিল্পসাধক যতই অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তিনি সর্ববিধ উপাধি এবং সংস্কার বর্জন করিয়া সর্বলোক এবং সর্বকালের গ্রহণযোগ্য কতকগুলি আনন্দময় সত্যকে সরল এবং দ্বিধাহীন ভাবে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। অবশেষে হয়তো তাঁহার এমন অবস্থা জন্মে যখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার আর চিত্রের প্রয়োজনীয়তা থাকে না, অথবা সহজ সরল আনন্দে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে যে বিন্দু অঙ্কিত হয়, তাহাতেই তিনি পরিপূর্ণতার আস্বাদ লাভ করেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে, একজন শিল্পী যতক্ষণ পর্যন্ত সর্ববিধ উপাধি পরিহার করিয়া বিন্দুতে সিন্ধু নিরীক্ষণ না করিতেছেন, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সত্যের সন্ধানে বার বার চিত্র হইতে চিত্রান্তরে বিচরণ করিতে থাকেন, ততক্ষণ তিনি সাধনার শেষ পইঠায় উপনীত হন নাই। ততক্ষণ তাঁহার অঙ্কিত চিত্র শুধু সাধনপথে তাঁহার অগ্রগতির পরিমাণ আমাদিগকে জানাইয়া দেয়। সে চিত্র অস্থায়ী অবস্থার অস্থায়ী প্রকাশ এবং সেইজন্য ক্ষণধর্মাবিলম্বী অবস্থার মত তাহাও ক্ষণিকের ধর্ম অবলম্বন করিয়া

থাকে। যামিনী বাবুর মতে কেবল বিন্দুর মধ্যেই শিল্পসাধক স্থির আসন লাভ করিতে সমর্থ হন। ওঁকারে সর্বসঙ্গীত যেমন স্থিতিলাভ করে, চিত্রে কেবল বিন্দু অথবা বিন্দুজাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যেই তেমনই পরিপূর্ণতার আস্বাদন সম্ভব হয়। উভয়ই সমাপ্তির নিদর্শন; অবশিষ্ট সকলই অসম্পূর্ণ এবং পরিবর্তনসাপেক্ষ। চলার পথে প্রতি পদক্ষেপ যেমন ক্ষণিকের মায়া, জগতের অধিকাংশ ছবি তেমনই মায়ার প্রকাশ, কেননা তাহারা সত্যের পূর্ণ প্রকাশ নহে। তাহা কেবল পদচিহ্নের মত শিল্পীর অন্তরলোকের পদচারণের কথা আমাদিগকে জানাইয়া দেয়।

যামিনী বাবুর এই দর্শন যদি আমরা মানিয়া লই, তাহা হইলে অসিদ্ধ মানবের রচনাকে স্থায়ী মূল্য দেওয়া চলে না। যিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনিই কেবল রচনায় স্থায়িত্ব যোজনা করিতে পারেন। এই মতবাদ লইয়া তর্ক করা চলে না। কেননা ইহা যামিনী বাবুর ব্যক্তিগত অনুভবসিদ্ধ ধারণা। তবে আমরা কেবল একটি কথা বলিতে চাই যে, পর্বতবেষ্টিত তীর্থপথে পথিকের নিকট যেমন দূরের পর্বতশৃঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে নূতন রূপ লইয়া দেখা দেয়, অথচ সেই সকল রূপের কোনটিই যেমন শৃঙ্গের পূর্ণ প্রকাশ নহে—এখানেও তেমনই শিল্পী যখন অন্তরের দ্বন্দ্বের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সত্যের এক একটি কণা লাভ করেন, যাহা তাঁহার রসরচনার ভিতর দিয়া ব্যক্তিগত সংস্কারের জালে আবৃত হইয়া প্রকাশিত হয়, তাহাও তীর্থপথের পথিকের দেখা পর্বতশৃঙ্গের মত আংশিক সত্য বহন করিয়া আনে। পূর্ণ সত্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা তাহার মধ্যে না থাকিলেও, সার্বভৌমত্ব বা সার্বকালীনতা গুণ তাহাতে না থাকিলেও, তাহা সত্য, কেননা তাহা সত্যেরই আংশিক প্রকাশ। অতএব সত্যনিষ্ঠ শিল্পীর যে কোন অবস্থায় আঁকা ছবি আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য শ্রদ্ধার সামগ্রী হওয়া উচিত।

আদর্শ বা পূর্ণ সত্য যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের অবস্থা অবশেষে শুকদেবের মত হয়। কিন্তু যতক্ষণ মানুষ বাঁচিয়া আছে, যতদিন সে পূর্ণতা লাভ করে নাই, ততদিন অন্তরে দ্বন্দ্ব ও অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়াই সে পূর্ণতার অভিমুখে অগ্রসর হয়; অল্প প্রেম হইতে সার্বভৌম ও সকল অবস্থার প্রতি প্রেমের অভিমুখে সে অগ্রসর হইতে থাকে। এই চলার পথে অন্তরে সত্যের দাবির বশে সে যাহা আঁকিয়া যায়, যাহা রচনা করে, তাহা সকল অসম্পূর্ণ মানবচরিত্রের মতই আমাদের প্রেম ও সহানুভূতির যোগ্য, কেননা সে শিল্পও মানুষের জীবনেরই প্রকাশ। সেই রচনার মধ্যে সত্যের বর্দ্ধমান কণিকামাত্র থাকিলেই তাহা মূল্যবান সামগ্রীতে পরিণত হয়। যদি কেবল শুদ্ধ আনন্দ ও শুদ্ধ শিল্পকেই আমরা রক্ষা করি তবে পথের অধিকাংশ সঙ্গীকে আমাদের ছাড়িয়া আসিতে হয়। জীবনের পথ জনবিরল ও প্রায় নিঃসঙ্গ হইয়া উঠে। সেই ভয়ে ভালমন্দে মেশানো মানুষকে এবং তাহার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ ভালমন্দে মেশানো অর্থাৎ অসম্পূর্ণ শিল্পকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা করে। অবশ্য সেই রচনায় যদি সত্যের প্রতি নিষ্ঠা থাকে এবং সত্যকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করিবার জন্য অন্তরে উৎসাহ থাকে, তবেই তাহাকে শ্রদ্ধা করা যায়, অহমিকার খাদ অধিক থাকিলে শ্রদ্ধা রাখা সম্ভব নয় মানি।

এই কারণে যামিনী বাবুর সহিত আমরা সাধারণ শিল্পীর প্রতি কঠিন বিচার প্রয়োগ করিতে পশ্চাৎপদ হই। সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে তাঁহাকে আমরা সহানুভূতির চোখে দেখিতে প্রস্তুত আছি।

এইবার তৃতীয় প্রস্তাব। ইউরোপীয় আর্ট এবং ভারতীয় আর্টকে চরম অবস্থায় তুলনা করিয়া যামিনী বাবু বলিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয় আর্ট ইন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠিত আর্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে আমাদের বাধে। কেন বাধে তাহা বলিতেছি।

যামিনী বাবু অভিভাষণের পর আলোচনপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে ইউরোপীয় আর্ট সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় নাই, কেননা চতুর্দিকের আবহাওয়া তাঁহাকে বারংবার বাধা দিয়াছিল। সেইজন্য আমাদের বিশ্বাস ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীগণ ইন্দ্রিয়ানুভূত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া অবশেষে যখন উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় মানসলোকে পৌঁছিয়া থাকেন, তখনকার আনন্দ যামিনী বাবু পরিপূর্ণভাবে আস্বাদন করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি অবশ্য স্বপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য বলিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের শিল্পীগণ অতীন্দ্রিয় লোকে বিচরণ করার ফলে তাঁহাদের রং, রেখা বা পদ্ধতির মধ্যে যতদূর পরিবর্তন সাধিত হয়, ইউরোপের শিল্পীগণের রচনায় অতীন্দ্রিয়ত্ব কখনও ততখানি প্রকাশিত হয় না। অতএব ইউরোপীয় শিল্পীর মানসলোকে বিচরণ বা তৎসম্পর্কিত জ্ঞান, ভারতের তুলনায়, প্রৌঢ়ের জ্ঞানগর্ভ বাণীর তুলনায় শৈশবের কাকলির মত শব্দ। ইহার উত্তর আমরা হয়তো ঠিক দিতে পারিব না। কিন্তু আমরা মনে করি যে, ইউরোপের শিল্পীগণও স্বীয় সংস্কারের বাধা অতিক্রম করিয়া যে আনন্দলোকে পৌঁছিতেন, তাহা ভারতীয় শিল্পীর ধ্যানলব্ধ রাজ্য হইতে বিশেষ নিম্নে নহে।

নিম্নে নহে, একথা বলাও বোধ হয় ভুল। কেননা দুই রাস্তা দিয়াই অবশেষে যেখানে পৌঁছানো যায়, সেখানে উঁচু-নীচু নাই, দুই আনন্দের মধ্যে তুলনা করা চলে না। রজনীগন্ধা এবং গোলাপ ফুলের ধর্ম স্বতন্ত্র। কে বড় কে ছোট বলা যায় না। দুই বৃক্ষে দুই রকম সৌন্দর্য বিকশিত হয়। ইউরোপের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রাজসিক ধারা যেখানে পরিসমাপ্তি লাভ করে তাহার সঙ্গে ভারতের শেষ আনন্দের ইতরবিশেষ করা বোধ হয় যায় না।

আর কেইবা তুলনা করিবে? যখন এক ব্যক্তি এক আনন্দে মগ্ন,

তখন পূর্বে সে ইউরোপের পথে চলিয়া শেষ পইঠায় যে-আনন্দ লাভ করিয়াছিল, তাহার স্মৃতিও তো তাহার নিকট ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। সে তুলনা করিবে কেমন করিয়া? যে আনন্দে বিভোর সে চিত্রগুপ্তের মত আনন্দের জমাখরচ লেখে না। তাহার পক্ষে বিচার সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক যখন ইন্দ্রিয়লোক হইতে অগ্রসর হইয়া অবশেষে অতীন্দ্রিয় লোকে পৌছান, তখন তাঁহার যে আনন্দের অনুভূতি হয়, সাধু পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া যে আনন্দ অনুভব করেন, তাহাদের মধ্যে তুলনা কেমন করিয়া করা যাইবে?

উভয় পথে লব্ধ তত্ত্বজ্ঞানের তুলনা করিয়া কেহ কেহ বিচারের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতেই কি আনন্দের পরিমাপ হয়?

আর সে বিচারে শেষ পর্যন্ত লাভই বা কি? নুনের পুতুল আনন্দের সমুদ্র মাপিয়া কি করিবে?

যামিনী বাবুর উত্তর *

শ্রীযুক্ত নির্মল বাবু আমার বক্তৃতার যে সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহাকে ব্যক্তিগত ভাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তিনি আমার বক্তব্যের সারাংশ যেমন ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। ইউরোপ ও ভারতীয় আর্টের সম্বন্ধে তিনি যে তুলনা করিয়াছেন তাহা অনেকাংশে আমি মানি। বস্তুত আর্টের যে-কোন পথ দিয়াই যাই, অবশেষে এমন প্রদেশে পৌছানো যায়, যেখানে আর ভেদাভেদ থাকে না, শুধু রসের অনুভূতির কথা থাকে। কিন্তু সে

* গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত

অবস্থায় পৌঁছিলে শিল্পীর লেখনীও বন্ধ হইয়া যায়, কেন না তখন আর তাঁহার কোনও বস্তু বা চিত্র অবলম্বনের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু যতক্ষণ সে অবস্থা না আসে, ততক্ষণ রসের সহিত অঙ্কনপদ্ধতি বা টেক্‌নীকের প্রাধান্যও বর্তমান থাকে। তখন বিচার করিতে হইলে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন কালের অঙ্কনপদ্ধতির তুলনা করিতে হয়। সেরূপ তুলনা করিয়া আমার স্পষ্টই মনে হইয়াছে, ইউরোপ অপেক্ষা ভারতের স্থান বহু উচ্চে। ইহার একটি মানদণ্ড আমি স্বীকার করিয়া থাকি।

যাহা প্রাণপদ, যাহা স্বাস্থ্যপূর্ণ, যাহা মানুষের জীবনকে কল্যাণে মণ্ডিত করে, তাহা শ্রেষ্ঠ। যাহা রাজসিক গুণের দ্বারা স্বীয় বৈভবের সাহায্যে আমাদিগকে সম্মোহিত করে, তাহা সাত্ত্বিক বস্তু হইতে সর্বদাই নিকৃষ্ট। তাহা আমাদিগকে তৃষ্ণার্ত করে, কিন্তু জ্ঞানের পূর্ণতা এবং শান্তি আনিয়া দেয় না। এই বিচারের সাহায্যে আমার মনে হইয়াছে, ভারতীয় আর্ট ইউরোপীয় আর্ট অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে মানুষ আর্টকে বিশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিবিশেষের অধিকারভুক্ত না করিয়া অতি সহজ সরল ও সর্বজনগ্রাহ্য করিয়াছিল। তাহার মধ্যে অবশ্য ঐশ্বর্যমণ্ডিত এবং ঐশ্বর্যহীন সংস্করণ উভয়ই বর্তমান ছিল, জ্ঞানবানের জন্য রচনা ছিল, স্বল্পজ্ঞানীর জন্যও রচনা ছিল। কিন্তু সমস্ত ভারতীয় আর্ট সত্য ধর্মাবলম্বী ছিল এবং একনিষ্ঠ ছিল বলিয়া তাহা সকলের অন্তরে সৌন্দর্যের প্রেরণা সঞ্চারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল ও সমগ্র জাতিকে প্রাণে ও স্বাস্থ্যে পূর্ণ করিয়াছিল। ইউরোপের আর্ট সে পথ গ্রহণ করে নাই। সেই জন্য একটিকে আমি অপরটি হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। এ বিষয়ে মতের প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই বলিলাম।

কিন্তু নির্মল বাবুর সহিত আমি ইহা স্বীকার করি যে, উভয় পথে অবশেষে যেখানে পৌঁছানো যায়, সেখানে ভেদাভেদ নাই। মধ্যপথেই কেবল দোষগুণের বিচার চলে। বস্তুত সেখানেই চিত্রের অঙ্কন সম্ভব হয়, পথের শেষে চিত্র আর থাকে না। সম্পূর্ণ শুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলে আর ইউরোপ এবং ভারতের পথে কোনও প্রভেদ থাকে না। বাস্তববাদের ও আদর্শবাদের মধ্যে তর্কের প্রয়োজন হয় না।

রামকিংকর বেইজ

শ্রীযুক্ত রামকিংকর বেইজ আচার্য নন্দলাল বসুর শিষ্যগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মূর্তিগঠনেও তাঁহার যথেষ্ট দক্ষতা আছে। শান্তিনিকেতনে ইতস্তত রামকিংকর বাবুর গঠিত মূর্তি চোখে পড়ে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে।

বহুদিনের নিষ্পেষণে এবং সমাজিক অনাচারে বাঙালী জাতি স্বীয় সৃজনীপ্রতিভা অনেকখানি হারাইয়া বসিয়াছিল। শক্তিমান ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের শিল্পরসকে আশ্রয় করিয়া সে পরগাছার মত বাঁচিবার চেষ্টাও করিয়াছিল। কিন্তু যে দিন হইতে জাতির রাজনৈতিক জীবনে বিদ্রোহের শঙ্খ বাজিয়া উঠিল, সেই দিন হইতে আমাদের শিল্পীকুলও প্রাণশক্তির উৎসসন্ধানে ইউরোপকে পরিহার করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে মুখ ফিরাইলেন; অথবা এখন পর্যন্ত কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জাতি জীবন্ত আছে, তাহাদের প্রাণশক্তিসম্পন্ন জীবনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া রস সংগ্রহ, ও পরে রস রচনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শিল্পী রামকিংকর কিছু দিন প্রথম পথে চলিয়া পরে দ্বিতীয় পথের প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইয়াছেন।

তদুপরি আরও একটি ঘটনা ঘটে। সকল শিল্পীকেই অল্পবিস্তর আত্মকেন্দ্রিক হইতে হয়। রামকিংকরের মধ্যেও বিস্তার অপেক্ষা গভীরতার দিকে গতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আগে তিনি যে-সকল মূর্তি রূপবান করিয়া গড়িবার চেষ্টা করিতেন, এবার সে পথে না গিয়া তিনি মূর্তির মধ্যে হয়তো একটি বিশেষ রেখাকে অথবা গড়নের একটি

বিশেষ অঙ্গকে সমধিক পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলে তাঁহার রচিত রস ক্রমশ বহুজনগ্রাহ্য না হইয়া উত্তরোত্তর অল্পসংখ্যক রসবিদের উপভোগের বস্তু হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে abstract art এর সাধনচেষ্টায় তিনি হয়তো অনেকাংশে আধুনিক ফরাসী শিল্পের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন; কিন্তু এই পরিণতিও যে তাঁহার স্বকীয় অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া পরিপুষ্ট হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু ফল হইয়াছে বিপরীত। তিনি যতই আত্মমগ্ন হইতেছেন, ততই অপর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছেন। কিন্তু গভীরতার সাধনার মধ্যেও একটি ব্যাপার আছে। আমরা যখন মাটি খুঁড়িয়া কূপ রচনার চেষ্টা করি তখন বহুক্ষণ ধরিয়া কেবল শুষ্ক মাটি কাটিয়া যাইতে হয়। অবশেষে যখন নীচে জলধারার সন্ধান মেলে তখন অকস্মাৎ আবার অন্তর্লোকে অপরাপর কূপের সহিত আমাদের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। নীচের জলধারা কূপকে স্বীয় স্বকীয়তার সংকীর্ণতা হইতে মুক্তিদান করে। জনসমূহ কূপের জল পান করিয়া তখন পরিতৃপ্ত হয়। শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনই যখন শিল্পী সাধনার গভীরতায় অবশেষে নরসমাজের অন্তর্লোকে প্রবাহিত ফল্গুকে স্পর্শ করেন, যখন মানুষের মধ্যে প্রবহমান, দেশ কাল ও পাত্রের অতীত রসবস্তু একটি বিশেষ কূপের পথে বাহির হয়, তখন তাহার জল মাটির সংস্পর্শে আস্বাদনের এক বৈশিষ্ট্য লাভ করে। সাধারণ মানুষ তখন সেই জল পান করিয়া শিল্পীকে পূজা করে, রসকেও পূজা করে; এবং নিজে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে।

রামকিংকর বেইজ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হইয়াছে যে, তাঁহার রসের কূপখনন এখনও সমাপ্ত হয় নাই; তিনি সনাতন মানবলোকের অন্তঃপ্রবাহী ফল্গুনদী পর্যন্ত এখনও পৌঁছান নাই। তাই

তাঁহার রসসৃষ্টিকে লোকে দক্ষতার জন্য প্রশংসা করে বটে, কিন্তু সর্বজন সে রস আস্বাদন করিতে পারে না। কিন্তু তিনি যে গভীর নিষ্ঠা ও ততোধিক অধ্যবসায় সহকারে কূপখননে নিরত আছেন, তাহা দেখিয়া আশা হয় যে যে-জলধারা আজ স্বল্পপরিমাণে তাঁহার কূপে প্রবাহিত হইতেছে তাহা অদূর ভবিষ্যতে আরও গভীরে পৌঁছাইবে এবং সর্বজনের রসতৃষ্ণা নিবারণের যোগ্য বস্তু পরিবেশন করিতে সমর্থ হইবে।

তাঁহার প্রেমের গভীরতর সাধনার অপেক্ষায় আমরা ধৈর্য ধরিয়া রহিলাম।

খাজরাহার মন্দির

কোণার্ক এবং খাজরাহা দুইই ভারতের স্বাধীন অবস্থায় রচিত স্থাপত্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কিন্তু দুইটির মধ্যে মর্মের দিক দিয়া অনেক প্রভেদ আছে। কোণার্কের শিল্পী জীবনের মত বিশাল একটি জগতকে রূপ দিয়াছেন। তাহার মধ্যে ভাল আছে, মন্দ আছে, সুন্দর আছে, আমাদের দৃষ্টিতে যাহা অসুন্দর তাহাও হয়তো আছে। কিন্তু সমস্ত দৃশ্যকে শিল্পী একটি বিরাট কাব্যের ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত করিয়া তাহাকে বিচারের বহির্ভূত করিয়াছেন। জীবনও যেমন তাহার বিস্তারের দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং অপছন্দের বাহিরে চলিয়া যায়, আমাদের বিচারের অপেক্ষা রাখে না, কোণার্কের মন্দিরও তেমনই তাহার সর্বব্যাপী বিশালতার মধ্যে আমাদের বিচারের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। জ্ঞানীর অন্তরে পূর্ণ জ্ঞান যেমন তর্কের বিষয় নহে, কোণার্কের সৃষ্টির পশ্চাতে শিল্পীর মানসপটে আমরা মন্দিরের অন্তররূপের যে চিত্র পাই তাহাও তেমনই ব্যাপক ও তর্কের অতীত বস্তু।

খজরাহার মন্দির কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। খাজরাহার মহাপিষ্ঠ, অর্থাৎ যাহার উপরে মন্দির প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিচিত্র ধরনের। মাটি হইতে একান্ত কারুকার্যবিহীন একটি বিস্তীর্ণ পিষ্ঠ উঠিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিধারে অনেকখানি মুক্ত স্থান রাখিয়া মধ্যদেশে অপূর্ব কারুকার্যে খচিত মন্দির এবং জগমোহন স্থাপিত হইয়াছে। উভয়ই একেবারে নিম্নস্তর হইতেই ঘনবিন্যস্ত ও গভীর তক্ষণের দ্বারা মণ্ডিত হইয়াছে। তাহার তুলনায় মহাপিষ্ঠের অলঙ্কারহীনতা বিসদৃশ বলিয়া মনে

হয়। কিন্তু ক্রমশ বোঝা যায় যে খাজরাহার শিল্পিগণ মাটি হইতে অনেকখানি উচ্চে একটি সাদা পিষ্টের উপরে মন্দির বসাইয়া, রাজসমক্ষে স্বর্ণকার যেমন একটি সাধারণ পাত্রের মধ্যে মণিমুক্তাখচিত অলঙ্কার স্থাপন করিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন, তেমনি ভাবে আশায় আশঙ্কায় দোদুল্যমান হৃদয়ে যেন দাঁড়াইয়া আছেন। যে মন্দিরটি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাকে অলঙ্কারে, মূর্তিতে বিভূষিত করিতে তিনি কোন আলস্য বা কৃপণতা করেন নাই, এখন তাহা সকলের উপভোগে লাগিলেই তিনি সন্তুষ্ট হন। শিল্পী যাহা সর্বসমক্ষে লইয়া আসিয়াছেন, এইবার সকলে বলুন তাহা ভাল কিংবা মন্দ হইয়াছে।

বাস্তবিক যে বস্তুটি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে বিচারের অধীন বিষয় যে নাই তাহা নহে। খাজরাহার মন্দিরের মধ্যে কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির অথবা বামন মন্দিরে দেখা যায় যে শিল্পী মন্দিরের গঠনে একটি লঘুবিন্যস্ত সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছেন। প্রথমে মন্দিরের পিষ্ঠ সুন্দর ও পরিপাটি করিয়া রচনা করিলেন। তাহার গঠনে এই ভাব পাওয়া গেল যেন তাহা কেবল ঊর্ধ্বদিকে বাড়িয়া উঠিতে চায়। একটি পিষ্ঠ শেষ হইতে না হইতে আবার একটি পিষ্ঠ আরম্ভ হইয়াছে। তাহার উপরে বাড়। বাড়ে জাংঘের পর জাংঘ, তাহার উপর আবার জাংঘ। গণ্ডীর মধ্যেও ঊর্ধ্বপ্রয়াসী একটি গতির ভাব বর্তমান। মস্তকের মধ্যেও আমলকের পর আমলক দিয়া মন্দির যেন বারংবার এই কথাই বলিতেছে যে সে কেবল শূন্যের বন্ধন ভাঙিয়া ঊর্ধ্ব হইতে আরও ঊর্ধ্বে উঠিয়া নিজের সীমার প্রসার স্পর্শের দ্বারা উপলব্ধি করিতে চায়।

বলার কথা অবশ্য বেশি নয়; কিন্তু তরুণের মধ্যে একটি ভাবের আবেশে একমুখী গতি এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার মধ্যেও সৌন্দর্য বর্তমান।

মন্দিরকে বাড়াইবার চেষ্টায় শিল্পীগণ এমন আচ্ছন্ন হইয়াছিলেন যে, যে সকল সুঠু ও সুঠাম নরনারীর মূর্তিতে মন্দিরকে তাঁহারা সজ্জিত করিয়াছেন, তাহাদের বিন্যাসে কোনও ভাবের প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কোনও ভাবের বন্ধন নাই, অথচ অনেকগুলি মূর্তি বসাইতে হইয়াছে বলিয়া একই মূর্তিকে বারংবার তাঁহারা গড়িয়া পুনরুক্তির দোষ করিয়াছেন। এইরূপ ত্রুটি সত্ত্বেও মন্দিরের গঠনে বাধাবিঘ্ন ঠেলিয়া রূপের নববিকাশের যে উদ্যম প্রতিভাত হইয়াছে তাহা যথার্থই উপভোগ্য।

কিন্তু কোণার্কের মন্দিরের গঠনে অথবা তাহার সজ্জায়, যেখানে রূপবিকাশের কোনও ব্যস্ততা নাই, যেখানে শিল্পী স্থির ও গভীর দৃষ্টি লইয়া সজ্জার সকল মূর্তিগুলিকে একটি বিরাট ঐক্যের বন্ধনে যথাযোগ্য স্থানে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে প্রশান্তি ও অপরিমেয় শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, খাজুরাহার চঞ্চল গতির মধ্যে তাহা আমরা পাই না।

ওড়িশার স্থাপত্যে মহাকাব্যের যে বিস্তৃতি আছে তাহার তুলনায় খাজুরাহো অখণ্ড সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র কবিতার মত প্রতীয়মান হয়। মন যখন কোনও সুন্দর বস্তুর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতে চায়, তখন হয়তো খাজুরাহার মন্দিরের কথা মনে পড়িবে; কিন্তু সুখে দুঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, সকল অবস্থাতে অন্তরকে মুক্ত করিতে ও তাহাতে বলসঞ্চার করিতে কোণার্কই পারে, কেননা তাহার গঠনে সুন্দর এবং অসুন্দর উভয়ই ঐক্যের এক মহাসূত্রে গ্রথিত হইয়া মহিমা-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

কোণার্কের মন্দির

পুরী শহরের পূর্বদিকে, প্রায় বিশ মাইল দূরে, কোণার্কের সূর্যমন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি সমুদ্রের কূল হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে। পুরী হইতে কোণার্ক যাইবার দুই তিনটি পথ আছে, তাহার মধ্যে একটি পথ প্রায় সমুদ্রের সহিত সমান্তরালভাবে কোণার্কের দিকে গিয়াছে। এ পথটির সবটুকুতে বালির উপর দিয়া যাইতে হয়। দক্ষিণ দিকে উচ্চ বালিয়াড়িতে সমুদ্র ঢাকিয়া থাকে বলিয়া দেখা যায় না। কেবল কখনও কখনও বালির পাহাড়ের ফাঁক দিয়া সমুদ্রের ঘন নীল রেখা শ্রান্ত পথিকের নয়ন জুড়াইয়া দেয়। উত্তর দিকে বহুদূরে কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে গ্রাম, সেগুলি প্রায়ই দেখা যায় না। উন্মুক্ত বালুর প্রান্তর, তাহার মধ্য দিয়া চলিতে চলিতে কখনও বা দু-একজন পথিকের সঙ্গে দেখা হয়, কখনও বা দেখা হয় না। কোথাও কোথাও দু-একটি মন্দির আছে, তাহাও অবিরাম হাওয়ার স্রোতে বালির আঘাতে প্রায় খুঁড়িয়া গিয়াছে। দূর গ্রামের পুরোহিত দিনান্তে একবার বিগ্রহকে ফুল ও জল নিবেদন করিবার জন্ম আসিয়া আবার তাড়াতাড়ি গ্রামে ফিরিয়া যান। এই সমস্ত মিলিয়া কোণার্কের পথটিকে এমন করিয়া রাখিয়াছে যে পথিকের মন স্বভাবতই অবসন্ন ও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

এই পথে পুরী হইতে ছয় সাত ক্রোশ অগ্রসর হইলে দূরে কোণার্কের সূর্যমন্দিরটি দেখা যায়। মন্দিরের চারিপাশে একটি ঘন ঝাউয়ের বন আছে এবং তাহার মধ্যে অসংখ্য পাথরের টুকরা ইতস্তত স্তূপের মত পড়িয়া আছে। আমি যেবার প্রথম কোণার্কে পৌঁছাই তখন প্রায়

সন্ধ্যা নামিয়া আসিয়াছিল। চারিদিকে বিশাল মন্দিরের ভগ্নস্তূপ, কোথাও জনপ্রাণী নাই, পথও অন্ধকারে দেখা যাইতেছে না। যাহাও আছে তাহাও বারংবার সম্মুখের সু-উচ্চ বালির পাহাড়ের দ্বারা প্রতিহত হইতেছে; আর সকলের উপরে ঝাউপাতার সেই উদাস মর্মরধ্বনি! সব মিলিয়া চিত্তকে যেন অবসন্ন করিয়া দিল। মনে হইল, এমন স্থানেও কি শিল্প বাঁচিয়া থাকিতে পারে? এ যেন অতীত ভারতের শ্মশানভূমির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি।

শুধু আমার নহে, যাঁহারাই প্রথম বার কোণার্ক দেখিতে যান, তাঁহাদেরই মনে এমন একটি ভাবের উদয় হয়। কিন্তু প্রথম দর্শনের হতাশা যখন কাটিয়া যায় এবং মন্দিরের অপূর্ব গঠন ও অসংখ্য মূর্তিরাজি যখন ধীরে ধীরে আমাদের মনকে বর্তমান হইতে সরাইয়া অতীত ভারতের জীবনধারার মধ্যে ভাসাইয়া দেয়, তখন চিত্ত নব পরিচয়ের আনন্দে ভরিয়া উঠে।

বাস্তবিক কোণার্কের মন্দিরের মধ্যে ভারতবর্ষের স্বাধীন অবস্থার যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার তুলনা ভারতে পাওয়া দুষ্কর। কোন্ শিল্পী যে ইহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না বটে, তবে বারংবার বলিতে ইচ্ছা করে যে তিনি ধন্য, কেননা যে বস্তু তিনি সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন তাহা যে শুধু বিরাট তাহা নহে, রসের প্রাচুর্যে, প্রাণের আবেগে ও পরিপূর্ণতায় তাহার সমকক্ষ আর কোথাও দেখা যায় না।

কোণার্কের মন্দির রচিত হইবার বহু পূর্বকাল হইতে ওড়িশার মন্দির গঠনের একটি বিশেষ রীতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল। যাঁহারই কিছু অর্থ হইত, তিনি সমাজে প্রতিপত্তি লাভের আশায় একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া স্থায়ী কীর্তি রাখিয়া যাইতেন। এই সকল মন্দিরের মধ্যে নানাবিধ

মূর্তি খোদিত করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। কোথাও নারীর মূর্তি, কোথাও হস্তীকে ধর্ষিত করিয়া সিংহের মূর্ত, কোথাও বা যক্ষরক্ষগণের মূর্তি দিয়া শিল্পীগণ মন্দিরকে অলঙ্কৃত করিতেন। আলপনা দিয়া যেমন গৃহের দেওয়ালকে সজ্জিত করা হয়, ইহা যেন তাহারই অনুরূপ। তাহাদের সজ্জার মধ্যে কোন গূঢ় অর্থ নাই, শুধু শোভাবৃদ্ধির জন্ত উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া শিল্পীগণ নিস্তার পাইতেন।

কিন্তু কোণার্কের শিল্পী দেখিলেন যে এমন মূক মন্দির ও মূক সজ্জায় কোনও লাভ নাই। তিনি তাহারই মধ্যে অর্থযোজনার চেষ্টা করিলেন। ওড়িশার যে-যুগে কোণার্কের মন্দির রচিত হইয়াছিল তাহা ইতিহাসে খুবই প্রসিদ্ধ। তখন গঙ্গা-বংশের কুলমণি নরসিংহদেব অমিতবিক্রমে সৈন্যসামন্ত লইয়া গৌড়ের সুলতানগণকে পর্যন্ত পরাস্ত করিয়া আসিয়াছেন। নরসিংহদেবের সাম্রাজ্য বঙ্গের উপকণ্ঠ হইতে গোদাবরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দেশে ধনসম্পদ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে এবং লোকের মনে ভোগ ও স্বাধীনতার ভাব প্রবল হইয়া রহিয়াছে। শিল্পী এই সকলের মধ্যে পালিত হইয়াছিলেন; তিনি নিজের রচনার মধ্যে ইহাকেই রূপ দিবার চেষ্টা করিলেন।

কোণার্কের দেবতা সূর্য। তিনি অমিতবিক্রমে তাঁহার রথ বিশ্ব-সংসারের উপর দিয়া চালিত করিতেছেন; বিশ্বে যাহা কিছু জীবন্ত, যাহা কিছু তেজোময় সব তাঁহারই তেজের দ্বারা প্রদীপ্ত। তিনি তাহাদের স্রষ্টা, পোষক ও সংহারক; তাই তিনি এই বীর্যমণ্ডিত যুগের উপযুক্ত দেবতা হইলেন। শিল্পী সূর্যদেবের যে মন্দির রচনা করিতে গেলেন তাহাতে এই কথাটিই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন।

ওড়িশায় রেখ ও ভদ্র মন্দির রচনা করিবার যে রীতি ছিল, শিল্পী তাহাদের দুইটিকে লইয়া একটি বিশাল পিষ্টের উপরে স্থাপনা

করিলেন ও সম্মুখে সাতটি অশ্ব যোজনা করিয়া সমস্ত মন্দিরটিকে একটি রথের আকারে পরিণত করিলেন। মন্দিরটি যখন সম্পূর্ণ অবস্থায় ছিল তখন তাহার উচ্চতা দুইশত ফুটেরও অধিক ছিল। অতএব তাহা যে পর্বতের মত বিশাল ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। রথের চাকাগুলি আজও টিঁকিয়া আছে, সেগুলি প্রত্যেকটি নয়-দশ ফুট উচ্চ; তাহাদের উচ্চতা হইতেই মন্দিরের আয়তন কল্পনা করা যাইতে পারে।

মন্দিরটি রচিত হইলে শিল্পী এইবার তাহার সজ্জায় মনোনিবেশ করিলেন। সূর্যদেব জীবনের দেবতা। অতএব তাঁহার রথের উপরে যে মূর্তি থাকিবে তাহা জীবনের সকল ক্ষেত্র হইতেই সংগৃহীত হইবে। তাই সর্বনিম্ন স্তরে শিল্পী নানা ছন্দে বন্যজন্তুর চিত্র অঙ্কিত করিলেন। বন্য হস্তী, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি জন্তু হেলিয়া দুলিয়া চলিতেছে, কোথাও বা খেলা করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের প্রতি কামভাবে আকৃষ্ট হইয়া বদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে—এমন নানা মূর্তির দ্বারা নীচের শ্রেণীটি অলঙ্কৃত হইয়াছে। তাহার উপরে নরনারীর চিত্র পাওয়া যায়। কেহ বন্য বরাহ শিকার করিতেছে, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যাইতেছে, কোথাও বা পদাতিক তাহার স্ত্রীপুত্র লইয়া পথে অগ্রসর হইতেছে, কোথাও বা নরনারী পরস্পরকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া আছে, কোথাও বা মাতা স্বীয় পুত্রকে তুলিয়া ধরিয়া নয়ন ভরিয়া দেখিতেছে—এমনি বহুবিধ মূর্তির দ্বারা এই স্তরটি সজ্জিত হইয়াছে।

এই সকল মূর্তি যেমন প্রাণবান, তেমনই সতেজ। শিল্পীদের মনে কোথাও মিথ্যা লজ্জা ছিল না। কয়েক স্থানে দেখা যায় তাঁহারা জটা-কমণ্ডলুধারী সন্ন্যাসীপ্রবরকে নারীর সহিত অঙ্কিত করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া-

ছেন। সন্ন্যাসীদের প্রতি এইরূপ বিদ্রূপের ভাব কয়েক স্থানে খুবই স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। দেশ তখন বীরের ধর্মে প্লাবিত। তখন ভোগের কাল, ত্যাগের সময় কোথায়? এই কথা শিল্পী যেমন নির্ভীকভাবে ভাবিয়াছেন, তেমনি দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

পিষ্টের উল্লিখিত অংশ হইতে আরও উপরে উঠিলে ক্রমশ নরনারীর কামভাবাপন্ন মূর্তি কমিয়া আসে এবং তাহার পরিবর্তে শুধু নর্তকী নারী, কিংবা দেবতার মূর্তি অথবা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ স্থানে, রাজার শোভাযাত্রা অথবা যুদ্ধযাত্রার চিত্র দেখা যায়। এখানে কামভাবের চিত্র আদৌ নাই। জীবনের যে প্রকাশ আদিরসের মধ্যে হইয়া থাকে তাহাকে নীচে সম্মানিত স্থান দিয়া শিল্পী যেন আরও উপরে, আরও সূক্ষ্ম রসের সন্ধানে আসিয়াছেন। সেখানে নৃত্যের তালে তালে, ভৈরবের সংহারের রূপের মধ্যে সেই একই সূর্যদেবতার জীবনস্রোতের পরিণতি প্রকাশিত হইতেছে।

আরও উপরে উঠিলে আমরা দেখি শিল্পী দেবতাকেও ছাড়িয়া দিয়াছেন, শুধু নারীর মূর্তি দিয়াই শিখরের উচ্চতম প্রদেশের পার্শ্বদেশকে সজ্জিত করিয়াছেন। আরও উচ্চে উঠিলে আমরা এইবার একটি পরমাশ্চর্য রচনার সন্ধান পাই। মন্দিরের চূড়ার কিয়দংশ একেবারে কারুকার্যবিহীন। শিল্পী তাহাকে সাদা রাখিয়াছেন, কিন্তু ঠিক তাহারই উপরে চূড়ায় একটি কুম্ভ স্থাপনা করিয়া তাহার উপর একটি পূর্ণবিকশিত কমল রক্ষিত করিয়া মন্দিরের সজ্জা শেষ করিয়াছেন। ষোড়শদল পদ্মটিকে রূপ দিবার জন্যই কি শিল্পী তাহার নীচে কিয়দংশ সাদা রাখিলেন, অথবা এইরূপ সাদা রাখার পিছনে তাঁহার অন্য কোনও অভিপ্রায় ছিল? সময়ে সময়ে মনে হয়, শিল্পী যেমন জীবজন্তুর নিত্য-লীলার মধ্যে, মানুষের কাম ক্রোধ ও বাসনার মধ্যে, নৃত্যে গীতে সেই

একই সূর্যদেবের লীলাভূমি দেখিয়াছেন, তেমনি ইহাও বলিতে চাহিয়াছেন যে শূন্যতার অন্তরেও সেই দেবতার ঐশ্বর্য বিরাজ করিতেছে এবং এই সকলগুলি মিলিয়া সূর্যদেবের লীলাকমলের ষোড়শ দল রচিত হইয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে ইহাকে শিল্পীর পক্ষে পরমাশ্চয রচনা বলিতে হইবে। যে সাহসিকতার বশে তিনি কামনার বহুবিধ চিত্রকে মন্দিরের দেহে স্থান দিয়াছেন, এখানে তাহারই পূর্ণতম বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বস্তুত এরূপ শক্তি ভারতের আর কোনও স্থাপত্যরচনাব মধ্যে পাওয়া যায় না। যে শক্তির বশে মানুষ জীবনের সকল প্রকাশকেই এক সূত্রে গ্রথিত করিতে পারে, তাহাদিগকে মহিমায় পূর্ণ করিতে পারে, তাহা অপেক্ষা একটি স্বাধীন দেশের বড় সম্পদ কি হইতে পারে তাহা ভাবা যায় না।

মধ্যভারতের খ'জরাহার মন্দিরেও অবশ্য আমরা কোণার্কের মত নানাবিধ মূর্তি দেখিতে পাই। এমন কি সেখানকার তক্ষণকার্য সময়ে সময়ে কোণার্ক অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। নারীদের কমনীয়তা, তাঁহাদের সলজ্জ পদক্ষেপ যেমন ভাবে সেখানে ফুটিয়াছে ওড়িশায় হয়তো তাহার তুলনা হয় না। কিন্তু খাজরাহার পিছনে কোনও শিল্পীর বিরাট মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁহাদের দক্ষতা হয়ত বেশি, কিন্তু মন কোণার্কের মত বিশাল নহে। মন্দিরের রচনাকৌশলে পদে পদে তাঁহাদের ভীকতা ধরা পড়ে। মন্দির যেন উচ্চে উঠিবার আকাঙ্ক্ষায় ভারাক্রান্ত। পদে পদে তাহার বাধিয়া যাইতেছে, কিছুতেই সে নিজের বিস্তারের অন্ত যেন খুঁজিয়া পাইতেছে না। আত্মপ্রকাশের চেষ্টা মন্দিরের গঠনে এতই প্রকাশিত হইয়াছে যে তাহাতেই গঠনের

অন্তর্নিহিত দৃঢ়তাকে অনেকখানি ক্ষুণ্ণ করিয়া দিয়াছে। খজুরাহোর মন্দিরে তরুণের ঊর্ধ্বে উঠিবার ব্যাকুল চেষ্টা ফুটিয়া উঠিয়াছে বটে, কিন্তু কোণার্কের সেই বিপুল শক্তি, প্রশান্ত মেঘগম্ভীর আত্মস্থ ভাব এখানে কোথায়? কোণার্কের শিল্পী সেই শক্তির বশে ভাল মন্দ সকল জিনিসকে একটি বিরাট ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন। তাহারই মহিমায় সমস্ত মন্দির উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

আজও অসংখ্য ভগ্ন প্রস্তররাজির অন্তরালে থাকিয়া, কত দিনের কত আঘাত সহিয়া কোণার্কের মন্দির সে যুগের যে জলন্ত চিত্রটি আমাদের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছে তাহার মহিমা কীর্তন করিয়া শেষ করা যায় না। রাত্রির অন্ধকারে, ঝাউবনের মর্মরতানের সহিত কোণার্কের মন্দির যেন আমাদের সমস্ত হৃদয়কে ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া লয়।

বহুদিন পূর্বে ওড়িশার একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে একজন শিল্পীর সহিত আমার পরিচয় হইয়াছিল। দরিদ্র লোক, দিনের অন্ন তাঁহার অতি কষ্টে সংস্থান হয়, তবু তিনি তালপাতায় লেখা একখানি শিল্পশাস্ত্র অতি যত্নে কাঠের সিংহাসনের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি তাহা নিত্য পূজা করেন, ধূপধুনা দেন, ফুলচন্দন দিয়া অর্চনা করেন, কখনও তাহাকে অনাবশ্যকবোধে পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বন্ধু, সে যুগ তো আর নাই, তোমার আদর তো কেহ করিবে না, তবে কেন শুধুই পুরাতনের এই স্মৃতিটুকু ধারণ করিয়া রাখিয়াছ" শিল্পী উত্তর করিলেন, "আমাদের যুগে হয়তো কিছু হইবে না, কিন্তু আমাদের যাহারা সন্তান, তাহাদের আবার আদর হইবে। তাহারা মানুষ হইবে, দেশ তাহাদের পুনরায় মূল্য দিবে। নিজের জন্য নয়, তাহাদেরই জন্য এগুলিকে আজও

সযত্নে রাখিয়া দিয়াছি।” কথাটিতে অন্তরে বড় বল পাইয়াছিলাম। বস্তুত আজ হয়তো আমরা হীন ও অধঃপতিত হইয়া আছি সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখেই বা আবদ্ধ থাকিব কেন? যে প্রচণ্ড শক্তির বশে একদিন আমাদের দেশে কোণার্কের মত মন্দির রচিত হইয়াছিল, আবার হয়তো এমন দিন আসিবে যখন আমরা তাহার যথাযথ মর্যাদা দিতে পারিব।

আজ ভারতের বহু দুঃখ বেদনার অন্তরালে কি আমরা সেই শুভ ভবিষ্যতের অরুণ আলোক দেখিতে পাই না?

সমালোচকের আদর্শ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

কাল আপনাকে আমি প্রশ্নটি ভালভাবে করিতে পারি নাই, তাহার কারণ সাহিত্য বিষয়ে বস্তুত আমার অধিকার নাই, দ্বিতীয়ত আমার প্রকাশভঙ্গির মধ্যেও দোষ আছে। সেই জন্য প্রশ্নটি আজ আপনার নিকট লিখিয়া পাঠাইতেছি। হয়তো আরও একটু স্পষ্ট করিতে পারিব।

আপনি সাহিত্য বিষয়ে বলিয়াছেন সাহিত্য রূপসৃষ্টি করে এবং সেই রূপসৃষ্টির সময়ে স্রষ্টা জগতের দ্রষ্টাও হইয়া থাকেন, দৃষ্টি এবং সৃষ্টি এক হইয়া যায়—এই কথাটি বড় ভাল লাগিয়াছে। যে সাহিত্যসৃজনে আমরা দৃষ্টি ও সৃষ্টির অভিন্নতা লক্ষ্য করি, যে ক্ষেত্রে লেখক আত্মরত না হইয়া জগৎরত হন, সেই লেখক এবং তাঁহার লেখাকে আমরা সাহিত্যবাসরে আসন দিই। বস্তুত তখন লেখা এবং লেখক, তারাশঙ্করের ভাষায়, রাধা এবং কৃষ্ণের মত অভিন্ন যুগল রূপ ধারণ করে আপনার প্রবন্ধের মধ্যে ইহাও খুব ভাল লাগিয়াছে। সত্যই যাঁহারা বড় লেখক, তাঁহারা প্রেমে সমগ্র মানবকে এক করিয়া লইয়াছেন এবং এই সর্বজয়ী প্রেম যে তাঁহাদের সৃষ্টি ও দৃষ্টির মূল প্রেরণা, এ কথাটি চমৎকার। আপনি সাহিত্যিককে যোগীর পর্যায়ে আসন দিয়াছেন এবং সেই সাহিত্যিক এবং সাহিত্যকেই বড় বলিয়াছেন যেখানে নির্দোষ রূপের মধ্যে নির্দোষ প্রেম প্রকাশিত হইয়াছে।

এইবার আমরা প্রশ্নের পূর্বে একটি কথা বলিয়া লই। যে-সমালোচক বিভিন্ন লেখকের লেখাকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিতেছেন, তাঁহার সম্পর্কেই আমার প্রশ্ন। তিনি উপরোক্ত কষ্টিপাথরে যাচাই

করিয়া হয়তো দেখিবেন যে একটি রচনা সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে, অপরটি পড়ে না। তাহার বিচারকালে যদি তিনি প্রত্যেক সৃষ্টির আদি-অন্ত জিজ্ঞাসা করেন, তবে হয়তো তিনি দেখিবেন ছোট বড় সকল সাহিত্যিকই উর্ধ্বপ্রয়াসী, কেহ প্রেম, দৃষ্টি এবং রূপসৃষ্টি বিষয়ে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন, কেহ হন নাই। কেহ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, আত্মকেন্দ্রীভূত না হইয়া জগৎকেন্দ্রী হইয়াছেন, কেহবা সংস্কারের বশে, সাধনা ও পুরুষকারের ন্যূনতার জন্ত ততদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারকের মত তিনি কতকগুলিকে সাহিত্যের কুম্ভমেলায় আসনের অধিকার দিলেন, অপরকে দিলেন না। সে অধিকার কুম্ভমেলার ধারপালের সম্পূর্ণ আছে, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমার মনে হইয়াছে, সমালোচক বা সাহিত্য পরীক্ষকের অন্তরে বিচারকালে শেষে যদি প্রেম এমনই বৃদ্ধি পায় যে তিনি প্রত্যেক সাহিত্যসৃষ্টিকে (ক) একজন সাহিত্যিক, (খ) তাঁহার সংস্কার, (গ) দেশ এবং (ঘ) কালের ঘাত প্রতিঘাতে উৎপন্ন প্রকৃতির একটি বিশেষ লীলার মত মনে করেন, তখন তাঁহার নিকট প্রয়াগের কুম্ভমেলার পরিবর্তে সমস্ত জগৎই এক বৃহৎ কুম্ভমেলায় পরিণত হইবে। তখন প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া তিনি সমগ্র সাহিত্যিককেই কোল দিবেন। হয়তো তখন তাঁহার পক্ষে বিচার করিয়া ভাল বা মন্দ বলা চলিবে না, কেবল প্রত্যেক সৃষ্টি কোন্ কোন্ বিষয়ের ঘাত প্রতিঘাতের বশে উৎপন্ন হইয়া একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে, শুধু তাহারই বর্ণনা করিবেন। তাহার সমালোচনার মধ্যে আর ক্ষুদ্রকে সংহার করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। সেই সমালোচনা পড়িয়া ক্ষুদ্র লেখক অন্তরে পীড়া অনুভব না করিয়া আরও অগ্রসর হইবার উৎসাহ এবং বিনয় লাভ করিবেন।

এইরূপ মনে হওয়ার জন্য আপনাকে প্রশ্ন করিতেছি, সমালোচকের অন্তর যদি কাব্যস্রষ্টা বা দার্শনিকের অন্তরের মত প্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, ইহা কি তাঁহার পক্ষে দোষের বলিয়া আপনি বিবেচনা করিবেন? শিল্পী যামিনী রায়ের নিকটে একদিন শুনিয়াছিলাম যখন শিল্পী শেষে একটি বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর অনুভূতি লাভ করেন, যখন গায়ক অবশেষে শুধু ওঁকার ধ্বনির মধ্যে সর্বসুরের পূর্ণ সমন্বয় লাভ করেন, তখন তাঁহাদের অঙ্কন বা সঙ্গীত বন্ধ হইয়া যায় বটে, কিন্তু তখনই তাঁহাদের সাধনা অনিবার্য এবং চরম পরিণতি লাভ করে। আপনি বাঙলার মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক। সেইজন্য আপনাকে আমি প্রশ্ন করিতেছি, সমালোচনা ধর্মেরও ঐরূপ কোনও অনিবার্য পরিণতি আছে কিনা। যদি সর্বগ্রাসী এমন কোনও প্রেম তাঁহার মধ্যে আসিয়া পড়ে, যখন প্রয়াগের কুম্ভের পরিবর্তে সমগ্র সাহিত্য-জগৎ তাঁহার নিকট কুম্ভমেলায় পরিণত হয়, তবে কি আপনি বলিবেন সমালোচকের ধর্মচ্যুতি ঘটিয়াছে? তিনি যদি পরমহংস দেবের মত অবস্থায় পৌছান, উপদেষ্টার মত প্রত্যেককে আরও অগ্রসর হইবার পথের ইঙ্গিত দেন, কাহাকেও ছোট, কাহাকেও বড় ভাবিবার বুদ্ধি হারাইয়া ফেলেন, তবে কি সমালোচকের ধর্ম হইতে তিনি ভ্রষ্ট হইবেন?

এই প্রশ্নটি আমি কাল আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। যদি কোনও দিন অবসর মত ইহার প্রকৃত উত্তর লিখিয়া পাঠান তবে কৃতার্থ হইব। নমস্কার নিবেদন। ইতি—

বশম্বদ

১লা ফাল্গুন ১৩৪৩ শ্রীনির্মলকুমার বসু

রোম্যাঁ রোলাঁ

মনীষী রোলাঁর দেহান্তে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য আমরা আজ সমবেত হয়েছি, সকলেরই হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত। কেননা বিশ্বজন আজ যে উন্মত্ত সংগ্রামে পরস্পরের কণ্ঠ আঁকড়ে ধরেছে, সেই মোহের অন্ধতম মুহূর্তে যাঁরা মানুষের একত্বের কথা ভোলেন না, দেশ এবং কালের অতীত মানবজাতির সমগ্রতার রূপ যাঁদের দৃষ্টিতে অম্লান থাকে, রোলাঁ ছিলেন সেই স্বল্পতম কবিশ্রেণীর মধ্যে একজন, তাঁর বাণী আজ নীরব হল, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এই ঘটনাকে আমরা নিদারুণ দুর্ভাগ্য বলে গণনা করব।

অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ মহাশয় রোলাঁর সম্বন্ধে আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদের একটি সুন্দর কথা শিখিয়েছেন। রোলাঁ ছিলেন ঊর্ধ্ব সূর্যলোকের অধিবাসী, যাঁরা ধরণীতে অধ্যাত্মজগতের রসসিঞ্চন করে স্বর্গের পারিজাত ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন, তাঁদেরই একজন। বেদে এঁদের ঋষি বা কবি বলা হয়েছে। মানুষের সমাজকে এঁরাই যুগে যুগে সাধনার দ্বারা নূতন রূপ দিয়ে থাকেন।

কবিবন্ধু বাজপেয়ী মহাশয় স্বীয় অভিভাষণে আমাদের আর একটি পরম সুন্দর কথা শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেন, রোলাঁর প্রতিভা

গগনস্পর্শী হলেও তিনি প্রতিভাপুষ্টির যাবতীয় উপাদান এই মাটির ধরণী থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। রোলাঁ ছিলেন যেন হিমালয়ের বক্ষ-আশ্রিত দেবদারুর মত। মাথা তার ঋজুভাবে উর্ধ্বলোকে প্রসারিত, সূর্যের অবিচ্ছিন্ন আত্মীয়তার স্পর্শে তার অন্তঃশক্তি যেন প্রস্ফুরিত হয়ে উঠেছে, কিন্তু মাটির ধরণী থেকেই তার অন্তরের সকল রসভাণ্ডার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—রোলাঁর প্রকৃতি ছিল তেমনই। এঁদের মত কবি পৃথিবীর সঙ্গে মানসস্বর্গের যোগসূত্র সংস্থাপন করেন এবং সেই সেতু অবলম্বন করে যুগে যুগে মানুষ নিজের অন্তরতীর্থ পরিভ্রমণ করে অমৃতের আস্বাদন লাভ করে।

আরও একটি কথা কবি আমাদের বলেছেন, সেটিও বিশেষভাবে আমাদের প্রণিধানের যোগ্য, রোলাঁর লেখার মধ্যে সাম্যবাদ এবং লেনিনের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার নিদর্শন যথেষ্ট আছে। কেউ কেউ এর থেকে অনুমান করেছেন, রোলাঁ রাজনৈতিক মতবাদে সাম্যবাদী দলের সমর্থক ছিলেন। সাম্যবাদের অন্তর্নিহিত সত্যকে, অর্থাৎ যেখানে নিপীড়িতের সঙ্গে সমত্ববোধে সাম্যবাদী দুঃখনিবৃত্তির সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেন, তার সবটুকু রোলাঁ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিলেন সত্য, কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে, তিনিই আবার গান্ধী ও শ্রীরামকৃষ্ণকে পরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়েছেন। এই তিনজনকে সমসূত্রে গ্রথিত করা আনুষ্ঠানিক সাম্যবাদীর পক্ষে হয়তো কঠিন। বস্তুত রোলাঁর লেখা থেকে কোন বিশেষ মতবাদের পোষকতা করার চেষ্টাকে আতস-কাচের ভিতর দিয়ে সূর্যকিরণকে বিকৃত করে আগুন ধরানোর সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাতে সূর্যকিরণের সমগ্রতাকে ক্ষুণ্ণই করা হয়। রোলাঁ ছিলেন দলগত গণ্ডির উর্ধ্বে, যাঁরা স্বয়ং মহৎ এবং যাঁদের সকল মোহ অপগত হয়েছে।

বস্তুত রোলাঁর মহিমাকীর্তনে আমরা স্বয়ং মহিমান্বিত হয়ে উঠি, নিজেদের ধন্য মনে করি। ইনি তেমনই একজন মানুষ ছিলেন, রামায়ণে যাঁদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, তাঁরা যেখানে যান সেই স্থানই তীর্থে পরিণত হয়।

রোলাঁর একটি পরিচয় হয়তো আপনাদের মধ্যে অজ্ঞাত নয়, তিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের একজন পারদর্শী অধ্যাপক ছিলেন। লেখক হিসাবে তাঁর যেমন খ্যাতি ছিল, সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবেও তার থেকে কম ছিল না; তিনি বীঠোফেন প্রমুখ সঙ্গীতকর্তাদের জীবনী লিখে গেছেন। বীঠোফেন ইউরোপের শ্রেষ্ঠতম সঙ্গীত রচয়িতা হলেও প্রকৃতি তাঁর প্রতি নিতান্ত নির্দয় হয়েছিলেন, তাঁর শ্রবণশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়। সেই অবস্থায় পাখীর গান, শিশুর হাস্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কর্মস্রোতের কোলাহল যখন তাঁর কাছে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে, তখন একদিন তিনি দারুণ ঝড়ের মধ্যে বজ্রনির্ঘোষ শ্রবণ করেন। উচ্ছ্বাসভরে সেই দুরন্ত দুর্যোগের মুহূর্তে তিনি বলে ওঠেন, আমি শুনেছি, শুনেছি। প্রকৃতির মহান বিপ্লবের যে বার্তা সকল অন্তরায় অতিক্রম করে তাঁর শ্রুতিগোচর হল, এক অপূর্ব সঙ্গীতে তিনি তাকে রূপ দিলেন।

রোলাঁ এমনই একজন লোককে স্বীয় বন্দনা জ্ঞাপন করলেন, যাঁর আত্মার দুর্জয় শক্তির কাছে প্রকৃতির সকল বাধাবন্ধন পরাস্ত হয়েছিল।

রোলাঁ তীর্থযাত্রীর মত মানবলোকের যুগ-যুগান্তে পরিভ্রমণ করেছিলেন। যেখানেই তিনি মানুষের অন্তরে অপরাজেয় শক্তির আবির্ভাব দেখেছিলেন, সেখানেই তিনি স্বীয় কবিপ্রতিভার দ্বারা তাকে বন্দনা জানিয়েছিলেন। যুগে যুগে মানুষের মধ্যে যে অক্ষয় শক্তি ঘনীভূত হয়ে ওঠে, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধীজী এবং শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে সেই শক্তির বিকাশ দেখতে পেয়ে দেশ এবং ভাষার সকল বাধা অতিক্রম করে

তাঁদের প্রতি রোলাঁ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছিলেন। রোলাঁর লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জীবনীতে ইতিহাসের গণ্ডির অতীত ভারতীয় সাধনার যে মূর্তি আমরা চিত্রিত দেখি, তার তুলনা কদাচিৎ পাওয়া যায়। এমনই ভাবে যেখানে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু বিভূতিযুক্ত তাকে যেমন তিনি বন্দনা জানিয়েছেন, তেমনই সকল অসুন্দরকে আঘাত করতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নি।

ফ্রান্স যখন ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানের সঙ্গে যুদ্ধে মেতে উঠল, তখন হিংসায় উন্মত্ত সেই জনতাকে রোলাঁ এই বলে সাবধান করেছিলেন," ভুলো না জার্মানরাও তোমার ভাই। গ্যেটের জার্মানি, বীঠোফেনের জার্মানিকে অবহেলায় কলুষিত করো না।" এর ফলে রোলাঁ স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু স্বজনপ্রদত্ত এই বিরহকে তিনি রক্ততিলকের মত আপন ললাটে ধারণ করেছিলেন। বর্তমান যুদ্ধের পূর্বেও ফাসিজ্‌মের উত্থানের ঘাতপ্রতিঘাতে যখন ইউরোপের আকাশ বিদ্বেষের দাবানলে ধূমায়িত হয়ে উঠছে, তখন তিনি মানুষের মনকে বন্ধুত্বের এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মন্ত্রে সচেতন করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর চেষ্টা ক্ষণিকের জন্য হয়তো পরাস্ত হয়েছে সত্য, কিন্তু রণক্লান্ত ধরণী আবার এমনই মানুষের অমৃতবাণীর জন্য তৃষ্ণাকাতর হয়ে উঠবে, কেন না প্রেম ভিন্ন অমৃতত্বের আর কোন পথ নাই। রোলাঁর শিষ্যস্থানীয় যাঁরা, তাঁদের ক্ষয় নাই। তাঁদের জীবনের ভিতর দিয়েই হয়তো তাঁর অমোঘ বাণী সফলতা লাভ করবে।

এমনই একজনের কথা আপনাদের কাছে জ্ঞাপন করি। রোলাঁর প্রতিভার রশ্মিতে আকৃষ্ট হয়ে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন প্রতিভাশালিনী মহিলা ছিলেন। তিনি অভিজাত সমাজে গুণপনার জন্য যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর চিত্ত চারিদিকের

দুঃখদুর্দশার ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। রোলাঁকে তিনি অনুরোধ করেন, এমন একজন লোকের সঙ্গ আমার চাই যাঁর সাহচর্যে আমার সমগ্র জীবন সার্থকতায় মণ্ডিত হয়ে উঠবে এবং আমি নবজীবন লাভ করব। রোলাঁ গান্ধীজীর কথা বলেন এবং মহিলাটি তখন ভারততীর্থের অভিমুখে যাত্রা করেন। আপনারা অনেকে তাঁর নাম ও ইতিহাস হয়তো জানেন। তাঁর নাম ছিল মডলীন স্লেড, মীরাবেন। আজ মীরাবেন ভারতের দরিদ্রতম অধিবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে নূতন জীবন লাভ করেছেন; ভারততীর্থের প্রতি রোলাঁর নিবেদিত নির্মাল্যের মত তিনি বিরাজ করছেন।

রোলাঁ এমনই ভাবে মানুষের জাতি, দেশ এবং কালের গণ্ডি অতিক্রম করে চিরদিন সুন্দরের উপাসনায় রত ছিলেন। সূর্যলোকের রশ্মি তাঁর ভিতর দিয়ে ধরার মানুষের শীর্ষে আশীর্বাদের মত অবতীর্ণ হত।

ভারত ইতিহাসের এক অধ্যায়

মধ্যযুগে ওড়িশা যখন স্বাধীন দেশ ছিল তখনকার শিল্প ও সাহিত্যের মধ্যে আমরা একটি বিষয় লক্ষ্য করি। নারী ও পুরুষের শারীরিক সম্বন্ধকে তখনকার শিল্পীগণ বর্তমান কালের লোকের মত আলোচনার অযোগ্য অথবা নিন্দার্হ বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। সেই জন্য দেবতার মন্দিরে মানবজীবনের নানাবিধ চিত্রের মধ্যে মিথুনের চিত্র বিরল ছিল না। শুধু ওড়িশা নয়, নেপালে অথবা মধ্যভারতে খাজুরাহোর মন্দিরেও এই জাতীয় চিত্র প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়। বর্তমান কালে খ্রীষ্টীয় ধর্মের অন্তর্নিহিত শুচিপ্রিয়তা ব্রাহ্মধর্মের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে প্রসারিত হওয়ার ফলে আমরা অশ্লীল মূর্তি অথবা চিত্র দেখিয়া কুণ্ঠিত হই বটে, কিন্তু একথা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সেরূপ ভাব আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল না। বস্তুত মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে, এমন কি বাঙলাদেশে প্রচলিত গীতিকাব্যে অথবা গানে, গল্পে, উপহাসের মধ্যে আদিরসের অপ্রাচুর্য ছিল না। কেবল ইহাই দুঃখের বিষয় যে, মধ্যযুগে রাজসিক শক্তির পরিপূর্ণতায় যে ভোগলিপ্সার আরম্ভ হইয়াছিল, মুসলমান রাজত্বকালে বলহীন এবং পরাধীন জাতি দুর্দিনের অবসাদ ভুলিবার জন্য সেই লিপ্সার তামসিকতার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বসিয়া রহিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রঘুনন্দন শিরোমণি একবার সমাজের এই দুর্গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দুর মনে স্বীয় আচারের প্রতি আস্থা বাড়াইয়া, সমাজের শাসনকে অধিকতর

কঠোর করিয়া, আচারপালনকে উচ্চ আদর্শে পরিণত করিয়া তিনি সমাজের মধ্যে শুচিতার সংস্কার গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার সাধনায় অর্থাৎ আত্মগরিমার উদ্বোধনে ও কঠোরতার অভ্যাসের আদর্শের মধ্যে আমরা প্রধানত একটি বীরভাবের প্রবাহ দেখিতে পাই।

প্রায় সেই সময়েই চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি কিন্তু দেশের জন্য ভিন্নরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বোধ হয় সে যুগে মুসলমান ও হিন্দু সভ্যতার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে আচারের প্রতি আস্থা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। চৈতন্যদেব আচারের প্রতি প্রধানত দৃষ্টি না রাখিয়া যে প্রাণহীনতার বশে দেশের দুর্গতি ঘটিতেছিল তাহারই মূলে আঘাত করিলেন। চৈতন্যদেবের ভাবের বন্যা যখন স্তিমিত হইয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে পর্যবসিত হইল তখন যে নূতন সমাজ গড়িয়া উঠিল তাহার মধ্যে মুসলমান সভ্যতার ডেমক্রেসির ভাব যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পাইয়াছিল। কবীর, নানক প্রভৃতি সাধকগণের চেষ্টায় সেই যুগে ভারতের নানা স্থানে ঐরূপ আরও অনেকগুলি সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পরবর্তী কালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে, ভারতে যে সকল সংস্কারের প্রচেষ্টা হইয়াছিল সেগুলির মধ্যেও আমরা উল্লিখিত দুইটি ধারার সন্ধান পাই। এক শ্রেণীর সংস্কারকগণ পুরাতন হিন্দু সভ্যতার প্রকৃত মহত্বের কথা স্মরণ করিয়া, তাহার প্রতি অনুরাগবশত হিন্দু আচারগুলিকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতেন। আর এক শ্রেণী আচারের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মানুষকেই সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। মানুষের সাক্ষাৎ সুখদুঃখের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তাঁহারা সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থা করিতেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার ইতিহাসেও আমরা উভয় প্রগতির সন্ধান পাই। একদিকে রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ সংস্কারকগণ

যুক্তিবাদের (Reason) সাহায্যে সকল সমাজব্যবস্থা করিতেন এবং আচারের প্রতি শ্রদ্ধায় আবদ্ধ হইয়া থাকিতেন না। অপর পক্ষে রাজা রাধাকান্তদেব প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তিগণ জাতীয় আত্মগরিমার আধার ছিলেন, তাঁহারা পুরাতন হিন্দু সভ্যতার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি অনুরাগবশত তাহার আচারের প্রতিও অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন এবং সেই আচারকে বাঁচাইবার চেষ্টায় যুক্তিবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এইভাবে বাঙলার নবজাগরণ যেমন একদিকে যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া চলিতে লাগিল, অপরদিকে তেমনই আত্মগরিমার উন্মেষের দ্বারা তাহা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দুই সাধনার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে ক্রমে দেশের তমের মূল ক্ষীণ হইয়া গেল। ইহা ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলের নিদান হইয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের যুগে আসিয়া আমরা একটি নূতন বাণী শুনিতে পাই। তাঁহার মধ্যে জাতীয় গরিমার বোধ কাহারও অপেক্ষা কম ছিল না, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের মধ্যে তিনি ভারতীয় দর্শনের সত্যমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া আচার তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে নাই। তাই তিনি প্রথম ঘোষণা করিলেন যে, পুরাতন ভাবকে পুনরায় ভারতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে, কিন্তু কোন বিশিষ্ট রূপ বা আচারের মধ্যে তাহা আবদ্ধ থাকিলে চলিবে না। পুরাতন ভারতের বীরত্ব ও মুক্তির বাণী সনাতন, "বহু মত ও বহু পথের" কথাও সনাতন, কিন্তু এই সকল নীতি আধার, কাল এবং ক্ষেত্র অনুসারে নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে।

বর্তমান সময়ে জাতীয় আত্মবোধের ভাব আমাদের দেশে পূর্বাপেক্ষা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে ভারতের অন্তর্নিহিত সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাবান। ইহাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের মত শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন যে, জাতির অন্তর্নিহিত

প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পাইলে তবে আমাদের দেশের তমোভাব দূর হইবে। তিনি বারম্বার ইহাও বলিতেছেন যে রূপ হইতে ভাব মহৎ এবং ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত ভাব বর্তমান যুগে নূতন নূতন রূপের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইবে। তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা দেশ যথাযথভাবে গ্রহণ করিলে একটি মহৎ ভয় হইতে আমরা রক্ষা পাইব। পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়া স্বাধীনতা যে ভাবে আসিতেছে তাহার বশে ইউরোপের আচার বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানমালা আমাদের দেশে প্রবেশ করিবার সূচনা দেখা যাইতেছে। সে সকল প্রতিষ্ঠান কিন্তু ভারতের উপযোগী করিয়া ঢালিয়া না সাজিলে স্থায়ী হইবে না, বরং বহু বিরোধ ও অমঙ্গলের কারণ হইবে। ইউরোপীয় ভাবগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ইউরোপীয় রূপগুলিকে প্রচলিত করিবার যে সার্থকতা নাই তাহা বিদ্রোহের মোহে কেহ কেহ বিস্মৃত হইতেছেন। কিন্তু যদি শ্রীঅরবিন্দের শিক্ষানুসারে আমরা প্রকৃত তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া থাকি তবে ইউরোপীয় ভাব ইউরোপীয় রূপে আমাদের দেশে না আসিলেও আমরা ক্ষুণ্ণ হইব না।

একদিকে শ্রীঅরবিন্দ যেমন জ্ঞানের প্রদীপ্ত আলোক লইয়া দেশকে পথের ও সত্যের সন্ধান দিতেছেন, প্রত্যেককে স্বপথে অগ্রসর হইবার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেছেন, অপরদিকে তেমনই মহাত্মা গান্ধী দেশ হইতে তামসিকতা দূর করিবার জন্য একটি সাধনোপায় সর্বসমক্ষে উপস্থিত করিয়া, এবং স্বয়ং তাহার মূর্তিস্বরূপ হইয়া, সকলকে ঐ পথে আহ্বান করিতেছেন। তাঁহার কঠোর জীবনের মধ্যে মানবের দুইটি শ্রেষ্ঠ বাণী—সত্য এবং অহিংসা—নিপীড়িতের প্রতি করুণা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শান্ত বিদ্রোহের আকারে অপূর্ব মূর্তি ধারণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ভারতে মানুষের স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতেছেন। যে কর্ম অন্তরের দ্বারা অনুমোদিত হয় নাই তাহাকে

অস্বীকার করিবার অধিকার মানুষের আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করেন। অর্থাৎ মানবাত্মার মুক্তির বাণী তাঁহার মধ্যে কর্মবিশেষের দাবিকে খণ্ডন করিবার অধিকারের রূপে প্রকাশ পাইয়াছে। শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু কর্মমাত্রকেই -তাহা অন্তরের দ্বারা অনুমোদিত হউক অথবা না হউক —বন্ধনের নিমিত্তস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করেন। কর্মের ফলত্যাগে, অর্থাৎ বাসনার অবসানে, তিনি মানবের প্রকৃত মুক্তির উপায় দেখিতে পান।

রবীন্দ্রনাথ কর্মের খণ্ডনে বিশ্বাস করেন বলিয়া বহু লোককে একই কর্মে আবদ্ধ দেখিলে তাহারা যে অন্তরের শব্দ না শুনিয়া সেই কর্মে লিপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের স্বাধীনতা হারাইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের স্বাধীনতা জীবনের সকল ক্ষেত্রে নানা রূপে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। অতএব আমাদের জাতীয় জাগরণও নানা কর্মধারায় বিকশিত হইবে, ইহাই তিনি আশা করেন। আজ দেশের সকলে গান্ধীজীর পথ অবলম্বন করিয়া, হয় শুধু চরকায় অথবা রাষ্ট্র-পরিবর্তনের কর্মে নিসক্ত রহিয়াছে, সেইজন্য তাঁহার সন্দেহ হয় যে ইহা প্রকৃত জাগরণ নহে, সুপ্তিরই লীলা।

কিন্তু ক্ষুধার রূপে, রোগের রূপে, মৃত্যুর রূপে নিবিড় তম দেশকে দিনের পর দিন যেভাবে নিবিড়তর আবরণে আচ্ছাদিত করিতেছে সেখানে মানুষের প্রথম জীবনচেষ্টা যে ইহাদেরই বিরুদ্ধে অভিযানে প্রকাশিত হইবে তাহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কি আছে? যাহারা আজ মহাত্মাজীর পথ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই কাছে হয়তো ভগবান মৃত্যুর রূপে, ক্ষুধার রূপে আসিয়া তাহাদের যুদ্ধে আহ্বান করিতেছেন। এই যুদ্ধের ফলে অন্তরে বল সঞ্চারিত হইলে তখন দেশ নানা কর্মে নিজের স্বাধীনতাকে বিকশিত করিবে। কিন্তু আজ দেশ

রোগীর মত। রুগ্ন অবস্থায় নানা কার্যে লিপ্ত হইবার ক্ষমতা তাহার নাই, অন্তরও তাহার সে পন্থায় সায় দিবে না।

আজিকার জাতীয় আচার হয়তো বা ধূম উদ্‌গীরণ করিতেছে, কিন্তু সেই ধূম অপেক্ষা অন্তরে যে শিখা প্রজ্জ্বলিত হইতেছে তাহাই তো সত্য পদার্থ। স্বভাবের দোষে যে ধূম উঠিতেছে তাহার জন্য সত্য নিন্দনীয় নহে, অথবা যিনি নীচের স্তরে জ্বলন্ত অঙ্গারস্বরূপ বিরাজ করিতেছেন তিনিও দায়ী নহেন। সকলের তলে থাকিয়া যে বৈশ্বানর জীবকে আজ প্রজ্জ্বলিত করিতেছেন ইহা তাঁহারই লীলা এবং আমরা শুধু সেই লীলা দেখার অথবা তাহাতে দগ্ধ হইবারই অধিকারী। তাহাকে বিচার করিবার ভার আমাদের নহে।

অতএব ভারতের ইতিহাসে আত্মগরিমার উদ্বোধনের মধ্যে ও আচারের বন্ধন সৃষ্টির মধ্যে ঐশ্বর্যকাতর অবস্থা হইতে ভারতের পুনরভ্যুদয়ের যে সূচনা দেখিতে পাইয়াছিলাম তাহাই আজ প্রথম যৌবনের আলোছায়ায় সন্দেহ ও সঙ্কল্পের দোলায় কখনও বন্ধনের সৃষ্টিতে, কখনও বন্ধনের খণ্ডনে, কখনও অবান্তর কোলাহলের আড়ম্বরের মধ্যে শুষ্ক শাখার পর শাখাকে অবলম্বন করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সুদূর বা নিকট ভবিষ্যতে যখন জাতির সমগ্র জীবন জ্বলিতে থাকিবে তখন কী জ্যোতি যে বিকীর্ণ হইবে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তখন বর্ত্তমান বা বিগত যুগ স্বীয় অসম্পূর্ণতার স্মৃতি দিয়াও যে স্বাধীন মানবকে আবদ্ধ রাখিতে পারিবে না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।